ভগবান্ তিব্বতীবাবা

তিব্বতী বাবা

সিলেটের কোনও গ্রামে কোনও বিত্তশালী নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান নবীন চক্রবর্ত্তী, শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হন। বাল্যকাল হইতেই তাহার ভাবান্তর ও উন্মনাভাব দেখিয়া জননী তাঁহাকে অল্প বয়সেই উপনীত করেন। জননীকে কোন সাধু বলিয়াছিলেন তাঁহার ষষ্ঠ গর্ভজাত পুত্র রূপে, কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন। শিবচতুর্দ্দশীর দিন মাতা উপবাস করিয়া নব উপনীত বালককে শিবপূজার উপকরণ রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া স্নানার্থ অন্যত্র গমন করিলে, উপবাসী ক্লান্ত পুত্রের নিদ্রার আবেশ হয়। তখন ইন্দুরে সেই পূজার নৈবেদ্যাদি উচ্ছিষ্ট করে। মাতা পূজায় উপবিষ্ট হইবার সময় ইহা লক্ষ্য করিয়া বালককে মৃদুভর্ৎসনা করেন। জননীর ভর্ৎসনায় বালক ক্ষুব্ধ হইয়া সেই মৃন্ময় ঠাকুরের মূর্ত্তির উদ্দেশে বলিল, "এই তুমি ঠাকুর, এই তুমি দেবতা! তোমার নিজের আহার্য্য পদার্থ নিজে রক্ষা করিতে পার না, এই তোমার ক্ষমতা, তাহ'লে লোকে মিথ্যাই তোমাকে পূজা করে!" কি শুভ মুহূর্ত্তে বালকের মনে এই সন্দেহ ও বিচার শক্তি আসিল! ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সোপান হইল।

ত্রয়োদশবর্ষীয় কিশোর নবীন একদিন জননীকে তাঁহার সাধনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগের কথা বলিলেন। তখন জননী বলিলেন, "বাবা! আমি তোমার মুখে কবে এই কথা শুনিব সেই আশঙ্কায় এতদিন ছিলাম, আজ বুঝিলাম সেই সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।" তখন তিনি সেই ঘটনার কথা তাঁহাকে বলিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "বৎস! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি আপন মনোভীষ্ট সাধনে

কৃতকার্য্য হও। কিন্তু কখনও মিথ্যা কথা বলিও না, সদা সৎপথে থাকিয়া পরদ্বারে প্রার্থী না হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। এবং পৌরুষবলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে।" ইহা আমরা গুরুদেবের নিজ মুখেই শুনিয়াছি।

বালউদাসীন চিরতরে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত যাইবার উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইয়া তথায় কিছুকাল বাস কালে, বঞ্চক কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, সামান্য ফেরিওয়ালা বৃত্তি অবলম্বন করতঃ কোনরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ ও বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া, বহুকষ্টে নেপালে উপনীত হইতে সক্ষম হইলেন। নেপাল-দরবার এই বালব্রহ্মচারীর অদম্য উৎসাহ ও অকুতোভয় সাহস দেখিয়া তাঁহার তিব্বত যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি তিব্বতযাত্রী একদল ব্যবসায়ীর সহিত তিব্বতদেশে পৌছিলেন। অনেক চেষ্টায় একটী মঠে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। মঠাধীশের উপদেশক্রমে তিনি একটী গুহাতে প্রবেশ করিয়া যোগাচরণে ব্রতী হইলেন। দিবসে নিয়মিত সময়ে দুইবার সেই গুহাভ্যন্তরেই প্রাপ্ত ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন। শৌচাদি ক্রিয়া সেই গুহাতেই রক্ষিত ভাণ্ডে সম্পন্ন হইত এবং নিয়মিত পরিষ্কৃত হইত। এইরূপে একাদিক্রমে ৭ বৎসর সেই গুহাভ্যন্তরে যোগসাধন করিয়া ছয়বৎসরে সিদ্ধ "সিদ্ধার্থে"র ন্যায় তিনিও সিদ্ধার্থ হইলেন। কৃতকাম হইয়া যোগীবর তিব্বতের বহুস্থান ভ্রমন করিয়া চিন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া হইয়া শেষে ব্রহ্মদেশে উপনীত হইলেন। তথাতে বহুকাল বাস করিবার পর অনেকগুলি তাৎকালিক প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হইলে, তাঁহাদেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন, এবং নানা প্রদেশ ভ্রমণের পর অযোধ্যা প্রদেশে কিয়ৎকালবাস করেন।

অমিতবিক্রমশালী দেশবিখ্যাত বীর, বঙ্গের গৌরব পরলোকগত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি স্বীয় বাহুবলে বৃহৎ, দুর্দ্দান্ত সদ্যধৃত বন্য ব্যাঘ্রকে বশ করিয়া পোষ মানাইয়াছিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বেই যোগসাধনে মনের একাগ্রতা লাভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি স্ত্রী, কন্যা ও স্বোপার্জ্জিত প্রভূত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিঃসম্বলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। বৎসরাধিককাল তিনি নৈমিষ্যারণ্যে অযাচিত দুগ্ধ অথবা বন্য ফলমূলাদি ভোজনে বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ থাকিয়া স্থিরচিত্ত হইয়া, তাঁহার অভিমত একটী মহাপুরুষ সমস্ত ভারত খুঁজিয়াও না পাইয়া যখন অযোধ্যা প্রদেশে আসিলেন, তখন এই মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদ্বারাই সোঽহং স্বামী নামে অভিহিত হইলেন। ইনিই সেই তিব্বতী বাবা —সেই 'তিব্বত দেশীয় লামার শিষ্য বৃদ্ধ যোগী' যাঁহার নিকট শঙ্কর মঠের মঠাধীশ পরলোকগত স্বামী পরমানন্দপুরী যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি বহু বৎসর মাদ্রাজ প্রদেশে বাস করেন। একবার হাইদ্রাবাদের ভূতপূর্ব্ব নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে নিজ দরবারে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জ্ঞান বৃদ্ধদের নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের প্রয়াস দেখিয়া যখন তাঁহার কি বক্তব্য আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "সোঽহং। আমার উপরেও কেহ নাই নীচেও কেহ নাই। আমি একাকী। আমার ভয় করিবার মত দ্বিতীয় কিছু নাই।" সমস্ত সভাসদসহ রাজ্যেশ্বর স্তম্ভিত। শেষে ধীমান্ রাজা বোধ হয় তাঁহার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াই তাঁহাকে বহুমূল্য খেলাত দান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি মধুর বচনে তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়া

সহাস্যবদনে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন বিশ্ববিশ্রুতা মহীয়সী বিদুষী স্বনামধন্যা মহিলা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর পিতা পরলোকগত ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস, সি, হাইদ্রাবাদ কলেজের তৎকালিক অধ্যক্ষ মহাশয়, কলিকাতায় তিব্বতী বাবার নিকট প্রায় মাসাবধি প্রত্যহই আনাগোনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটই আমি ইহা শুনিয়াছিলাম। আর সেই সময় বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে হাইদ্রাবাদে আহ্বান করিয়া বিশেষ অনুরোধ সহকারে যে তারের সংবাদ দেন তাহাও আমি দেখিয়াছিলাম। ৺পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী কৈলাস ভ্রমণের পথ হইতে বসুমতীতে লিখিয়াছিলেন—গিরিশৃঙ্গের কোন মঠাধীশ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আশ্চর্য্য! তুমি ভারতের এমন একজন মহাপুরুষ তিব্বতী বাবাকে জান না।" পরলোকগত আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী, আমার গৃহে উভয়ের সম্মিলনের পর, আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই মহাপুরুষ এতই উচ্চে উত্থিত যে সেখানে অনেকেরই অন্তর্দৃষ্টি পৌছায় না।" ইহাই তিব্বতী বাবার প্রকৃত পরিচয়। বিত্তশালী ভক্তকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বর্দ্ধমান পালিতপুর বৃহৎ আশ্রমে তাঁহার নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর হাওড়া **তিব্বতী বাবা বেদান্ত আশ্রমের** ভিত্তির প্রথম প্রস্তর স্থাপন তিনিই করিয়াছেন। এখানে তাঁহার দন্ত সমাধি আছে—

এ পূত আশ্রমে ঝঙ্কৃত সদা তাঁহারই আপ্তবাণী।
কোনও সুদিনে মরমে পশিবে শ্রবণে সদা শুনি'॥
উঠিবে সেদিন এই তীর্থ হ'তে গুপ্ত প্রজ্ঞামণি।
উজলিবে হৃদিকন্দর তম বিবেক রশ্মি দানি॥

—**গ্রন্থকার**

উৎসর্গ

৺কাশীধামে বেদ এবং বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে কৃতবিদ্য হওয়াবশতঃ, যে দণ্ডী পূর্ব্বপুরুষ-প্রবর মিশ্র উপাধিতে ভূষিত হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ বঙ্গদেশে আসিয়া, প্রবলপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর চক্রান্তে গৃহী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারই উপযুক্ত বংশধর যিনি সেই শাস্ত্রচর্চ্চার ধারা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা, অব্যাহত রাখিয়াছিলেন এবং সাধনা মার্গে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারই অমূল্য উপদেশে বাল্যে ও কৈশোরে আমার হৃদয়ে সনাতন ধর্ম্মের প্রথম বীজ উপ্ত হয়। আমার সেই পরলোকগত

পিতৃদেব

৺রামলাল মিশ্রের

উদ্দেশে আমার হৃদয়ের ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

অকৃতি সন্তান—**গ্রন্থকার**

উপক্রম

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূরতীর্থ দরশনে।"—মাইকেল

রত্নপ্রসূ, পুণ্যভূমি ভারতমাতার গর্ভ হইতে যে অমূল্য রত্নরূপ আদি মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি উদ্ভূত হইয়া, তাঁহার উজ্জ্বল মধুর কিরণরূপ সঙ্গীতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দিগদিগন্ত বিভাসিত করিয়া মানব হৃদয় একটী করুণ রসে আপ্লুত করিয়াছিলেন, তাঁহারই রচিত আদি মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে পরবর্ত্তী যুগের কালিদাস, ভবভূতি, কীর্ত্তিবাস, তুলসীদাস, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণ আরও শ্রুতিমধুর কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিয়া ভারতবাসীর নিকট অমর হইয়া আছেন। সেই মূল মহাকাব্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই রামায়ণরূপ অফুরন্ত রত্নভাণ্ডারে যে রহস্যনিধি মহর্ষি কর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছে, তাহারই আপাতদৃশ্যে অভেদ্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, সেই রত্নরাজি আমরা লোক লোচনের গোচর করিবার প্রয়াস পাইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। উপরোক্ত মহাকবিগণ রামায়ণের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাদের তত্তৎ কাব্যে আরও স্ফুটতর করিয়াছেন। কিন্তু এই বাহ্য আবরণরূপ দেহের অভ্যন্তরে যে একটী আত্মার ন্যায়, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নিহিত আছে, তাহা সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া, কেহই দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। আমরাও "প্রাংশুলভ্যফলে লোভাদু-

দ্বাহুরিব বামনঃ” অর্থাৎ বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় সেই দুরপসরণীয় আবরণ উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিয়া উপহাসাস্পদ হইতে পারি এরূপ আশঙ্কা সত্ত্বেও এই কার্য্য সাধন করিতে সাহসী হইয়াছি। মনীষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, আমার গুরুদেব তিব্বতী বাবার গত নির্ব্বাণোৎসব উপলক্ষে আহূত সভায়, সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন “বুদ্ধদেব, তিব্বতী বাবার ন্যায় মহাপুরুষগণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও, চির নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায় সম্যক প্রকারে নির্ব্বাণ গ্রহণ না করিয়া, লোকহিতার্থে কখন কখন মুমুক্ষু ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মারূপে অবির্ভূত হইয়া, তাহাদের আত্মজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন—যদি তাহাকে তাঁহাদের কৃপার পাত্র বলিয়া জানিতে পারেন। আমি দীর্ঘ উনবিংশ বৎসর তাঁহার পদচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম এবং তাঁহার অমৃত তুল্য উপদেশাবলীরূপ রসদ্বারা আমার হৃদয় মরুভূমি কথঞ্চিৎ সিঞ্চিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপাবারির সিঞ্চনের ফলে, এবং তাঁহারই প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া, আমার যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই সাহায্যে আমি এই দুরূহ রামায়ণরহস্যভেদ-রূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমার অবগতি নাই অন্য কোন মহাজন এই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা। গুরুদেব তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আমাকে এই রামায়ণ সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নাই, বা এইরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহীও করেন নাই।

এই রামায়ণ মহাকাব্যে, বাল্মীকি, অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই আনুপূর্ব্বিক সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের নাম তিনি রামায়ণ দিলেন কেন?

যদি শুধু রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐতিহাসিক রামের জীবনি লিখিয়া গ্রন্থের নাম রামেতিহাস, রামচরিত, রামলীলা বা রামোপাখ্যান ইত্যাদি একটা নাম দিলেও তো পারিতেন এবং তাহাই সঙ্গত হইত। সুতরাং ইহাই অনুমিত হয় যে এই রামায়ণ নাম প্রদানে তাঁহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং তাহাই তিনি রামের ইতিবৃত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই রামায়ণ নামের অর্থও সম্পূর্ণরূপে তাহারই প্রমাণ দেয়। রাম+অয়ন, অর্থাৎ রামের অয়ন বা রামে অয়ন। অয়ন শব্দের অর্থ গমন বা পন্থা। অয় বা ই ধাতু গমন হইতে অয়ন পদ সাধিত হয়। যেমন সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণদিকে গমন পন্থাকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বলে। যেমন নারে বা জলে গমন জন্য নারায়ণ, নার বা নরসমূহের গমন= নারায়ণ। নর সমূহের নারায়ণ হইতেই তাঁহার অবতার রূপে (বামনাবতার) আগমন, পুনরায় তাঁহাতেই পুনর্গমন। তাহা হইলে রামায়ণের অর্থ হয় রামের গমন পন্থা বা রামে গমন পন্থা। এখন রাম শব্দের অর্থ কি তাহাও দেখা প্রয়োজন। 'রাম' বা 'আরাম' শব্দ রম ধাতু হইতে সাধিত হইয়াছে। যে অবস্থায় প্রকৃত পূর্ণ শান্তি বা আরাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই আরাম বলে, যেমন গাঢ় সুষুপ্তিতে, শোকার্ত্ত ও দুঃখপীড়িত লোক সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, আরাম প্রাপ্ত হয় এবং নিদ্রাভঙ্গের পর বলে 'কি আরামেই এতক্ষণ ছিলাম।' এই সুষুপ্তির অবস্থার আরাম, প্রাকৃতিক ক্রিয়া বশতঃ, স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার রোধ হয় না এবং অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাতেও সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহার আর একটী দিক্ আছে। যে অবস্থায় জ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে এই আরামের

অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় সেই অবস্থার নামই রাম। ইহা দীর্ঘ সাধনার ফল। তাই জ্ঞানী ঋষি বলিয়াছেন

"যস্মিন রমন্তে মুনয়ঃ বিদ্যয়া জ্ঞানবিপ্লবে।
তং গুরু প্রাহ রাম রমণাদ্রাম ইত্যপি॥"

অর্থাৎ যে অবস্থায়, মুনিরা বা সাধকেরা পরাবিদ্যা দ্বারা বা জ্ঞানেরও বিপ্লব বা প্রলয় বা লয় হইলে, উপনীত হইয়া, রমন্তে কিনা পূর্ণশান্তি বা আরাম প্রাপ্ত হন সেই অবস্থাকেই জ্ঞানী গুরু 'রাম' বলিয়াছেন। রাম শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে রামায়ণের অর্থ হয়—যে পন্থা অবলম্বন করিয়া দশরথাত্মজ রামচন্দ্র রামত্বরূপ পদ বা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা যে পন্থা অবলম্বনে জ্ঞানীরা রামপদ প্রাপ্ত হন, সেই পন্থাই ও তাহার পর পর প্রণালী ও সোপান আরোহণের ক্রম অবস্থা, ঋষি এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সবিস্তারে রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি ঋষি নিজ সাধনায় এই রামবাচ্য পদ বা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সেই পদে যাইতে হইলে কিরূপ পন্থায় যাইতে হয়, বা কিরূপ সাধনায় ক্রমে তাহার সোপান আরোহণ করিতে হয় এবং সেই সময় কিরূপ অনুভূতি হয় ও তাহাতে কি বাধাবিপত্তি জন্মিতে পারে, তাহাই রামকে উপলক্ষ করিয়া—যেন রাম দ্বারাই তাহা সাধন করিয়া, বর্ণনা দ্বারা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়ও যে তাহাই ছিল তাহা তাঁহার কৃত রামায়ণের ভূমিকাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আমরা সেই ভূমিকা অবলম্বনেই আমাদের গ্রন্থের সূচনা করিব। যাঁহারা বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অনুসরণ করা সহজসাধ্য হইবে। আমরা অধিকাংশ স্থলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মূল রামায়ণের অনুবাদই উদ্ধৃত করিয়াছি।

গ্রন্থকার

ওঁ তৎসৎ।

প্রকাশকের নিবেদন

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জেশ্বর মিশ্র এল, এম, এস মহাশয় পরমহংস তিব্বতীবাবার কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, এবং সাধনায় যে অমৃত ফল লাভ করিয়াছেন, তাহাই তিনি অকাতরে অকৃপণভাবে সাধারণের হিতার্থে "রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ" গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাধনার উপলব্ধ জ্ঞান সাধ্যমত সরলতায় প্রকাশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি যেভাবে রামায়ণের এই অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত কেহই এইরূপ নবদৃষ্টিতে রামায়ণ দেখেন নাই। রামায়ণে যে এরূপ যৌগিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে, ইহা ইতিপূর্ব্বে কেহ যে কল্পনা করিয়াছেন তাহাও কর্ণগোচর হয় নাই। ডাক্তার মিশ্র মহাশয় তাঁর এই অপূর্ব্ব চিন্তা সময় সময় আমায় শুনাইতেন। তাঁহাকে উহা লিপিবদ্ধ করিতে আমি অনেকবার বলিয়াছি। তিনি পূর্ব্বে কখন পুস্তক লিখেন নাই, তাঁর সঙ্কোচ হইত লিখিতে, তিনি বলিতেন, তিনি যেরূপ বুঝিতেছেন তাহা কোনরূপে মুখে প্রকাশ করিতেছেন, লিখিবার ক্ষমতা তাঁর নাই। যাহাহউক গুরুকৃপায় শেষে তিনি কলম ধরিলেন এবং এই রামায়ণ লিখিলেন। তিনি লিখিতেন আর কষ্টস্বীকার করিয়া আমাকে শুনাইতে আসিতেন। আমাদের আলোচনা হইত এবং যেখানে স্পষ্ট বোধ হইত না তাও বলিতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রথম লিখিত পুস্তকখানি ট্রেনে খোয়া যায়। তখন তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া

পড়েন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার লিখিতে উৎসাহিত করি। তিব্বতী-বাবার কৃপায় হউক আর বঙ্গবাণীর দয়ায় হউক, তিনি পুনর্ব্বার লিখিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বঙ্গভাষা এই এক অপূর্ব্ব অবদান লাভ করিল। ইহা যে সত্যই এক নবীনভাবে রামায়ণ ভাবিত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকের হয়তো মতের সহিত মিলিবে না, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট এবং মুমুক্ষুর নিকট ইহার যে দাম আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই গ্রন্থে রামচরিতের তিনটী মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। একটী মূর্ত্তি বিষ্ণুর অবতার রাম, অন্য মূর্ত্তি ঐতিহাসিক সম্রাট রাম বা মনুষ্য রাম এবং অপর মূর্ত্তি বাল্মীকির সাধনার সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ রাম। গ্রন্থপাঠে দেখা যাইবে যে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধিলাভের সহায়ক বা উপায় এই রাম। আর মনুষ্য রাম কিরূপে ধীরে ধীরে সাধনার স্তরে স্তরে উঠিতেছেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও শেষে আবার ভোগমুখী হইয়া সাধনাচ্যুত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে তিব্বতী-বাবার সাধনার ক্রমই বাল্মীকির সাধনার ক্রম। এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব এই গ্রন্থে অপূর্ব্ব সরলতার সহিত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা স্বয়ং চিকিৎসক বলিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের সহায়তায় অনেক বিষয়ের অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। আর তিনি যে সাধনাপথে ক্রমোন্নত সোপানাবলী আরোহণ করিতেছেন, তাহাও তাঁহার ব্যাখ্যা মুখে ধরা পড়িয়া যাইতেছে। রামায়ণের প্রত্যেক নামই যে অর্থব্যঞ্জক তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক রামায়ণের সাধন প্রসঙ্গ যে রূপকাকারে আছে তাহা দেখিয়া গ্রন্থকারের প্রভূত জ্ঞান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সত্যই

ভূমিকা

[পণ্ডিত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিত]

ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র প্রণীত 'রামায়ণ বোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ' গ্রন্থখানি বিদ্বৎসমাজে রামায়ণের সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব এবং আধ্যাত্মিকত্ব ইহাতে প্রদর্শন করিয়াছেন। রামায়ণের যে সকল কথা ইতিহাস প্রমাণ করিতে পারে না বলিয়া বর্ত্তমান সুধী সমাজ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন, ইহা আমার অনুরোধ। ইহাতে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন বানরগণ বানরই, তাহারা মানুষ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ বানরদিগকে মানব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। বাস্তবিক বানরদিগের লাঙ্গুলাদির বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়। তাহারা মানুষ হইলে সেই যুগে মানুষেরও লাঙ্গুল ছিল ইহা ধরিতে হয়। কিন্তু অন্য কোন শাস্ত্র বা ইতিহাসে তাহা প্রমাণ করে না। এই জন্য বানরদের লাঙ্গুল ছিল না, রামায়ণে লাঙ্গুলাদির রূপক করিয়া বাল্মীকি লিখিয়াছেন ইহা বলিলে—হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, লম্ফ প্রদানে সমুদ্রপার হইয়াছিল, লঙ্কাদগ্ধকালে তাহার লাঙ্গুলের বহ্নি সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া রাক্ষসদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছিল—এই সকল রামায়ণে বর্ণিত কথা অমূলক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে সম্ভবতঃ, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বানরদিগকে বানরই রাখিয়া তাহাদের কথোপকথনের অক্ষমতা সত্ত্বেও তাহারা কিরূপে রামকে সাহায্য করিয়াছিল তাহা দেখাইয়াছেন। বহু প্রাচীনকালে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্য

রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে এইরূপ শ্লোকাকারে গ্রন্থ লিখিবার প্রথা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অতএব বাল্মীকি আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার লেখনীপ্রসূত শ্লোকাবলী অত্যন্ত সহজবোধ্য। কেহ কেহ এই রামায়ণ মহাকাব্যকে আধুনিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ মহাভারতে রামায়ণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্যাসদেব কোন কোন স্থলে দেখাইয়াছেন। মহাভারত অনুসন্ধান করিলে ইহা সকলেই দেখিতে পাইবেন। অতএব রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রাচীনতম গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে রূপক সন্নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। আবার এতকালের আবর্ত্তনে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। কাব্যে অনেক রূপক বর্ণনা দেখা যায়। রামায়ণও মহাকাব্য। তাহার আলোচনীয় বিষয় ঐতিহাসিক সত্য হইলেই অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত নিদুষ্ট হইতে পারে। বর্ণনীয় সকল বিষয় সত্য না হইলেও তাহার মহাকাব্যত্বের কোন হানি হয় না। রামায়ণকে ইতিহাস বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ইহা হইতে ইতিহাসের সূত্রগ্রহণ করিয়া সেই যুগের ইতিহাস রচিত হইতে পারে, এই গ্রন্থকার তাঁহার ঐতিহাসিক অংশে তাহাই দেখাইয়াছেন।

ইহার পর ইহার আধ্যাত্মিক অংশে গ্রন্থকার বিশেষ গবেষণার সহিত যোগ কৌশল ও প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সুগ্রীব শব্দে যোগীর সুষ্ঠু গ্রীবাদেশ, ঋষ্যমূক শব্দে গ্রীবার পশ্চাদ্দিকস্থ ঈষদুচ্চ অস্থিনিচয়, পম্পা অর্থে মুখগহ্বর, বালি মস্তক, কর্ণদ্বয় কুম্ভকর্ণ, এবং আভ্যন্তরীণ রাব বা শব্দকে রাবণ আখ্যা দিয়াছেন। এই আভ্যন্তরীণ রব যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ যোগীর জ্যোতিদর্শন হয় না। যখন "সমং কায়শিরোগ্রীবং" অর্থাৎ শরীর, শির ও গ্রীবা সমভাবে স্থাপন

করিয়া সমাধিস্থ হইতে পারেন তখন রাব থাকে না। ঐ রাব বা রাবণ থাকিলে সমাধিস্থ হওয়া যায় না। তাই পরমযোগী রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া হৃদয়স্থ জ্যোতিরূপিনী সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি যে কয়টী প্রধান ঘটনা অঙ্কিত করিয়াছেন গ্রন্থকার সেই সকল কয়টারই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং একটী বিশেষ কথা এই যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সহিত যোগের সামঞ্জস্য দেখাইয়া বাস্তবিকই একটী সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। অধিক কি বলিব গ্রন্থকার যে ভাবে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে এবং যোগপ্রক্রিয়ায় রামায়ণে বাল্মীকির যোগকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আমার মনে হয় এই গ্রন্থপাঠে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানামোদী সকলেই বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।

গ্রন্থকার হনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব, বিভীষণ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রামায়ণের প্রধান প্রধান নায়কদিগের যে ভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা অতিশয় চিন্তাশীলতার পরিচয় সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের ভূমিকা যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হইল না; কারণ ইহার ভূমিকা লিখিবার যথার্থ অধিকারী আমি নই এবং সমগ্র গ্রন্থ পড়িবার সময়ও আমার হয় নাই। কাজেই যৎকিঞ্চিৎ গ্রন্থের আভাস দিয়াই আমার ভূমিকা শেষ করিলাম। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া পাঠকবর্গের বিরাগভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। ইতি—

কলিকাতা দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ ও বেঙ্গল ন্যাসন্যাল
কাউন্সিল অব এডুকেশনের শাস্ত্রাধ্যাপক
শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

সূচীপত্র

রামায়ণবোধ

বা

বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ

গ্রন্থারম্ভ

বাল্মীকিকৃত রামায়ণের ভূমিকা

তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।
নারদং পরিপ্রপচ্ছ বাল্মীকির্ম্মুনিপুঙ্গবম্॥
কো স্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
চরিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ॥ ইত্যাদি

বাল্মীকি ঋষি বাগ্‌বিদ্‌শ্রেষ্ঠ নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্প্রতি ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে বিদ্যমান্ আছেন?" তখন নারদ বলিলেন "অনেক চিন্তার পর আমি তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষোচিতগুণসম্পন্ন একটী মাত্র পুরুষের সম্বন্ধে অবগত আছি।

তিনি অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, যাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত জগতের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। রাজা দশরথের এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সমস্ত আয়োজন করিলে, তাঁহার মহিষী কৈকেয়ী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া, নিজ পুত্র ভরতকে তৎপদে অভিষিক্ত এবং রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের আদেশ প্রদান করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিলেন। দশরথ পূর্ব্বে কোন সময় যুদ্ধে আহত হইলে, কৈকেয়ী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া নিরাময় করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পিতৃসত্যপালনার্থ রাম তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাজ্য ও অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে প্রস্থান করিলে, রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। ভরত রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া রামকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাম নিষাদরাজ গুহকের সহিত সৌহার্দ্দ্য করিয়া প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরে তথা হইতে চিত্রকুট পর্ব্বতে পর্ণকুটির রচনা করিয়া যখন বাস করিতেছিলেন, তখন ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া, তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। রাম তাঁহাকেনানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে নিরস্ত করায়, ভরত নিরাশ হৃদয়ে, তাঁহার পাদুকা বহন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাম তখন তথা হইতে প্রস্থান করতঃ অনেক মুনিদের আশ্রমে বাস করিয়া, শেষে অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অগস্ত্য ঋষির নিকট বৈষ্ণব ধনু ইত্যাদি লাভ করতঃ মুনিদের অনুরোধক্রমে রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা বিরাট রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহাকে বধ করিলেন। তথায় রাক্ষসী

রাবণভগিনী শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিবার পর তাহার অন্যান্য ভ্রাতা খর দূষণ পরিচালিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিলেন। শূর্পণখা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া, রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্যে, রাম ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতি সঙ্ঘটন করাইয়া, সীতাকে হরণ করিলেন। পরে রাম জটায়ু গৃধ্রের নিকট রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণের বিষয় অবগত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, কবন্ধ রাক্ষসের কবলে পতিত হইলেন। পরে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করিলে, তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে পম্পা সরোবর উত্তীর্ণ হইয়া, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে হনুমানের দর্শন পাইলেন। হনুমান কর্তৃক সুগ্রীব ও বালীর বিবাদের বিষয় অবগত হইয়া, বালীকে অদৃশ্য থাকিয়া বধ করিয়া সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। সুগ্রীব কর্তৃক হনুমান সীতা অন্বেষণে প্রেরিত হইলে, সে সম্পাতি নামক গৃধ্রের নিকট রাবণ ও লঙ্কার বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করতঃ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, সীতার সন্ধান পাইল এবং প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া আসিল। রাম, সুগ্রীব ও তাহার বানরকটকের সহিত, হনুমান কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে রামশরে শোষণ ভয়ে ভীত সমুদ্র রাম সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নলের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধনের উপদেশ দিলে, রাম তদনুসারে সেতুবন্ধন করতঃ, লঙ্কায় পৌঁছিয়া, সবংশে রাবণকে বধ করিয়া, সীতার উদ্ধার সাধন করিলেন। পরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলে, সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলেন। সীতা অগ্নি হইতে অক্ষত দেহে উত্থিত হইলে, তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করতঃ অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ভরতের নিকট হইতে রাজ্যগ্রহণ করিলেন। অধুনা সেই অযোধ্যাপতি রাম সীতাসহ প্রজা পালন করিতেছেন।”

এতাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া দেবর্ষি নারদ, বাল্মীকির পূজাগ্রহণ করিয়া আকাশপথে দেবলোকে প্রস্থান করিলে, বাল্মীকি ঋষি গঙ্গার অদূরবর্ত্তিনী তমসানদীর তীরে যাইয়া, শিষ্য ভরদ্বাজকে বলিলেন "আমি তমসাতে স্নান করিব, তুমি আমার বল্কলাদি প্রদান কর।" তিনি ইত্যবসরে অবলোকন করিতে করিতে আধি-ব্যাধিশূন্য মনোহর ক্রৌঞ্চমিথুনকে দেখিতে পাইলেন। অকস্মাৎ এক নিষ্ঠুর ব্যাধ সেই ক্রৌঞ্চদ্বয়ের মধ্যে পুংক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে নিহত করিল। তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্তভাবে সুরতাসক্ত বিস্তৃতপক্ষ, নিত্যসহচর, তাম্রশীর্ষ, দ্বিজবর পতির বিয়োগে কাতরা হইয়া এবং তাহাকে নিহত শোণিতাক্ত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। সেই পতিবিয়োগবিধুরা ক্রৌঞ্চীর করুণ রোদনে মহর্ষির মনে করুণার আবির্ভাব হওয়াতে তিনি ব্যাধকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

রে নিষাদ! যে হেতু তুই, এই ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিবি না। অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইলে তিনি ভাবিলেন "আমি এই পক্ষীর শোকে কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম।" তখন তিনি চিন্তা করিয়া শিষ্যকে কহিলেন "এই চতুষ্পাদবদ্ধ, প্রতিপদে সমানাক্ষর ও বীণালয়সমন্বিত বাক্য, শোকসময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক।" তৎপরে বাল্মীকি স্নানাবগাহন সমাপনান্তে শিষ্য ভরদ্বাজসহ আশ্রমে উপনীত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন "ধ্যানমাস্থিতঃ।" এই সময়ে লোক-

স্রষ্টা প্রভু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই মুনিপুঙ্গবকে দেখিতে আগমন করিলেন। তখন বাল্মীকি ব্রহ্মাকে দেখিয়া, পুনরায় সেই শ্লোকটী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, ব্রহ্মার সমীপেই পুনর্ব্বার গান করিলেন।

"তদ্‌গতেনৈব মনসা বাল্মীকি ধ্যানমাস্থিতঃ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিম্ জগৌ॥
পুনরন্তর্গতৈমনো ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্॥"

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্রহ্মণ! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক। আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে। এইরূপ বাক্যেই তুমি ধর্ম্মাত্মা ধীশক্তিসম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ বর্ণনা কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত সকল শুনিয়াছ, সেইরূপে সে সমুদয় বর্ণনা কর। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং রাক্ষসদিগের যে সকল প্রকাশ্য কিম্বা রহস্য বিবরণ তোমার অজ্ঞাত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে। এই কাব্যে তোমার একটী বাক্যও মিথ্যা হইবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই রামায়ণে সন্নিবিষ্ট ভূমিকা কি বাল্মীকিরই রচিত বা অন্য কাহারও রচিত? ইহার সমাধান করিতে হইলে ইহার সহিত বাল্মীকির মূল গ্রন্থের রচনার সহিত তুলনা করিতে হইবে। এই তুলনা করিলে এই দুইটীর রচনার মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত না হইয়া বোধ হয় যেন একজনেরই রচনা। সুতরাং যেমন গ্রন্থ রচয়িতা গ্রন্থের প্রারম্ভে একটা ভূমিকা লিখিয়া সংক্ষেপে তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন, এই রামায়ণগ্রন্থের ভূমিকাও তেমনই বাল্মীকিরই

নিজকৃত ভূমিকা। পক্ষান্তরে রাম সম্বন্ধীয় এই উপাখ্যান জানিতে, তাঁহার নারদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা তিনি রামকে, বহু পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্রকুট আশ্রমে বাসকালীন, দেখিয়াছিলেন—যখন রাম বনবাস গমনের প্রথম অবস্থায়, ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে যাইয়া, সেই চিত্রকুটে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বাল্মীকি ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আত্মপরিচয়সহ বনগমনের কারণও বলিয়াছিলেন। তারপরেও রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের পর, যখন সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে অগস্ত্য ঋষি এবং বহুদূর হইতে ঋষিমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে অযোধ্যাতে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী তমসাতীরস্থ আশ্রম হইতে বাল্মীকি ঋষিও যে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত রামকে দেখিতে যান্ নাই, ইহা সম্ভব হয় না। এই রামায়ণ রচনার ইচ্ছা, তাঁহার মনে, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাজ্যশাসন সময়েই উদিত হইয়াছিল!

"পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥"

তারপর রাম, কিছুকাল রাজত্বভোগের পর যখন লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে (সীতাকে) তমসাতীরস্থিত বাল্মীকি আশ্রমের সমীপেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। বাল্মীকি ঋষি তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় দিয়া দ্বাদশবর্ষ রক্ষণ ও পালন করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষে সমস্ত রামায়ণ রচনা করিয়া সেই সঙ্গীত দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কুশ ও লব দ্বারা, রামকে অশ্বমেধ যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাই অনুমান হয়, তিনি রামের এই ইতিহাস কতক রামের মুখে অযোধ্যায়

শুনিয়াছিলেন, এবং কতক সীতার নিকট শুনিয়াছিলেন। সীতার সেই করুণ কাহিনী শ্রবণে তাঁহার হৃদয় করুণ রসে আর্দ্র হইয়াছিল এবং তাঁহার তখন হইতেই ইচ্ছা হইতেছিল যে ইহা তিনি লিপিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তখন তাঁহার সেই রুদ্ধপ্রস্রবণের উৎস খুলিয়া দিল—সেই সীতার ন্যায়ই পতিবিরহবিধুরা ক্রৌঞ্চীর মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ। আর তাহাই সুললিত ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হইল তাঁহার মুখ হইতে যেন স্বয়ং সরস্বতীই তাঁহার বাণী ফুটাইলেন। তাই ব্রহ্মা বলিলেন,—

"মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মণ্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী"

আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ দিয়া এই বাণী নির্গত হইয়াছে।

তবে এই দেবর্ষি নারদের কথা তিনি উল্লেখ করিলেন কেন? ইনিই কি পুরাণের নারদ? বেদে বা উপনিষদে কোন দেবর্ষি নারদের কথা উল্লেখ নাই। এক নারদের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, তাহাতে সনৎকুমার নারদের আখ্যায়িকা ছলে আত্মজ্ঞানের উপদেশ কথিত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও এক পুরাণ-আখ্যায়িকা-বক্তা নারদের, সনৎকুমারের নিকট আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্তির কথার উল্লেখ আছে এবং তাহাতে আরও এক রামের সভাসদ ব্রাহ্মণ নারদের কথা উল্লেখ আছে—যিনি রামকে শূদ্রতপস্বী বধ করিবার প্ররোচনা দিয়াছিলেন। সুতরাং দেবর্ষি নারদ ও ব্রাহ্মণ নারদ এক নহেন। ভাগবতনারদের কথা মহাভারতে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং নারদ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি তাঁহারই রচিত। ইনিই অদ্বৈত বেদান্তবাদ স্রষ্টা মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভগবদ্‌পদপ্রদর্শনেরও গুরু। পরবর্ত্তী অর্ব্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এক নারদের জন্ম বৃত্তান্ত আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকে পাই।

"কান্যকুব্জে চ দেশে চ দ্রুমিলা গোপরক্ষক।
কলাবতী তস্য পত্নী বন্ধ্যাচাপি পতিব্রতা॥
স্বামীদোষেণ সা বন্ধ্যা কালে চ ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
উপস্থিতঃ বনে ঘোরে নারদং কাশ্যপং মুনিম্॥" ইত্যাদি

কান্যকুব্জ দেশের গোপ-রক্ষক অর্থাৎ গোয়ালার পতিব্রতা পত্নী কলাবতী, স্বামীর দোষে বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি স্বামীর আজ্ঞায় সন্তানোৎপাদন কামনায়, নারদ কাশ্যপ মুনির নিকট ঘোর বনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা সন্তানোৎপাদনের প্রার্থনা করেন। মুনি প্রথমে ক্রোধান্বিত হইলেও তাহার কামনা পূর্ণ করেন। সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তানের নাম নারদ হইল। গোপকুলেই প্রতিপালিত হইয়া, পরাশরের ঔরসে দাস-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ও তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যেমন ব্যাস ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেইরূপ হইতে না পারিয়া, অম্বষ্ঠ গোপই হইলেন। অম্বষ্ঠ=অম্বা (মাতা) স্থা+ড। যে সন্তান মাতার পতিভিন্ন অন্য পুরুষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, মাতৃকুলের নামেই পরিচিত হয়। কিন্তু এই নারদকেও পুরাণে প্রমাণ করান হইয়াছে দেবর্ষি নারদ বলিয়া। যথা—"সতু ভোগাশী ব্রহ্মশাপাৎ উপবর্হন -নামা গন্ধর্ব্ব ভূত্বা পুনর্ব্রহ্মবীর্য্যাৎ শূদ্রপত্ন্যাং জাতঃ।" যেমন ধীবর কন্যাকালী, কোন ক্ষত্রিয় রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্যেন পক্ষীর মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত তাঁহার বীর্য্য হইতে মৎস্য গর্ভে উৎপন্না, মৎস্যগন্ধানাম্নী ক্ষত্রিয়-কন্যা সত্যবতী। আবার কাশ্যপ মুনিকেও নারদ শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে নারদ শব্দের একটী সাধারণ অর্থও আছে। নারদ=নারং পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি, নার+দা+ক যদ্বা নারং নরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি কলহেন ইতি নার+দো+কা নারং জলং দদাতি পিতৃভ্যঃ ইতি বা। তাহা হইলে নারদ অর্থে যে পরমাত্মা

বিষয়ের জ্ঞান দান করে। সেইজন্য জ্ঞানী কাশ্যপ মুনি নারদ নামে অভিহিত হইয়াছেন। আবার নরসমূহের মধ্যে কলহ সঙ্ঘটন করিয়া যে ভেদ জন্মায়, তাহাকেও নারদ কহে। মহাভারতে এই কলহ সংঘটনকারী নারদের প্রচুর উল্লেখ আছে। নারদ একাধারে দেবর্ষি, ব্রাহ্মণ, শূদ্রাণী গর্ভজাত অম্বষ্ঠ, ভগবৎ সম্বন্ধে জ্ঞান দাতা ও পরে সনৎকুমার কর্ত্তৃক আত্মজ্ঞান লাভে কৃতার্থ, বাদরায়নের ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের পথপ্রদর্শক এবং শূদ্র হইয়াও শূদ্রক ঋষি বধে রামের প্ররোচক। এতগুলি গুণ এক নারদে সম্ভব হয় কি? বিশেষতঃ শেষোক্ত নারদকে ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়াই বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাঁহার ভূমিকায় রামের কয়েকটী অলৌকিক কার্য্যেরও বর্ণনা করিয়াছেন যেমন রাম সমুদ্র শোষণ করিতে উদ্যত হইলে মূর্ত্তিমান সমুদ্র সভয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার বন্ধন কিরূপে বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল বানর দ্বারা সম্ভব হইবে তাহা রামকে বলিয়াছিল। অলৌকিক কার্য্য দেবতা দ্বারাই সম্ভব হয়। মনুষ্যের পক্ষে তাহা সম্ভব না। তাই দেবতাসম্ভূত দেবর্ষি নারদের মুখ দিয়াই যেন তিনি তাহা বলাইলেন, যেমন মহাভারতে ইহা অপেক্ষাও কত অত্যদ্ভুত ঘটনা বাদরায়ণ নারদ মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। এই সকল ঘটনা দেবসম্ভূত দেবর্ষির মুখে বলাইলেই সংস্কারী লোক ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রোমাঞ্চিত হয়।

বস্তুতঃপক্ষে বাল্মীকি, রামায়ণে কি কি বিষয় বর্ণনা করিবেন, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা বা উপক্রমণিকা, তাঁহার এই ভূমিকাতে নিজেই বলিয়াছেন—সংস্কৃত নাটকে যেমন নট নটী কি বিষয় অভিনয় করিবে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তাবনায় দিয়া থাকে। সেই নটরূপে নারদই যেন এই বাল্মীকি রামায়ণে কি

বলিবেন পূর্ব্বেই তাহা বলিয়া গেলেন। তাই বাল্মীকি ইহা নারদ উবাচ বলিয়া আরম্ভ করিলেন। পরেও তিনি তাঁহার বক্তব্য অনেকের দ্বারা বলাইয়াছেন। যেমন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহারই বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ প্রতিপাদ্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গীতাকারে ভগবান উবাচ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই উদ্গীরিত করিয়াছেন। আবার তন্ত্রে শিব উবাচ বলিয়া অনেক সারগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ যদি ভগবদ্‌মুখ নিঃসৃত বলিয়া প্রচার করা যায়, তাহা হইলে লোকের তাহাতে বিশেষ আস্থা হয়। গ্রন্থকারের অন্য কোন সর্ব্ববিদিত ব্যক্তির মুখে বলাইবার তাৎপর্য্যই এই।

ইঁহার পরই আবার ব্রহ্মার অবতারণা করিয়াছেন। তাহারও রহস্য আছে। তিনি আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। যখন তিনি ইচ্ছা করিলেন যে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ রামের জীবনী লিখিবেন, তখন তাঁহার মনে এই রাম শব্দের প্রকৃত অর্থের বিষয়ও উদয় হওয়াতে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল। তাই ব্রহ্মাই যেন তাঁহাকে ব্রহ্মণ্ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহার এই ব্রহ্মাবেশ হওয়াতে, তাঁহার মনে হইল যদি এই রামচরিত্রে তিনি প্রকৃত রামত্ব প্রাপ্তির পন্থা তাঁহার কার্য্যাবলীতে ফলিত করিয়া, তাহার সমন্বয় করিতে পারেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থে বর্ণিত রূপকাকারে আত্মজ্ঞান লাভের প্রণালী ও তাহার সোপানারোহণ সময়ে যেরূপ অনুভূতি হয়, তাহা বহু মুমুক্ষু লোকের পক্ষে উপকারী হইতে পারিবে। তিনি তাই নিজের সাধনার দৃষ্টান্তে রামপদপ্রাপ্তির ক্রমিকপন্থা প্রদর্শন এবং তদনুযায়ী অনুভূতিরই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই রহস্যের বীজ নিহিত হইয়াছে—জনকের মুখে সীতার জন্মবিবরণে। তত্ত্বদর্শীর পক্ষে এখান হইতেই রামায়ণের রহস্য রস আস্বাদনের প্রারম্ভ। তার পর সেইভাবে ভাবিত হইলে

যে চিন্তাস্রোতের উদ্ভব হইবে, তাহারই সাহায্যে ক্রমে রামায়ণের রহস্য তাঁহার বোধগম্য হইবে। এই রহস্য নিহিত করার জন্যই ব্রহ্মার অবতারণা করার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার মুখ হইতে অকস্মাৎ সেই শ্লোকটি নির্গত হওয়াতে তিনি নিজেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। আর এই অবস্থাতেই তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানে—আত্মজ্ঞানে রামপদ প্রাপ্তি হওয়াতে, নিজে যেন রামময় হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ই—মূর্ত্ত ব্রহ্মার আবির্ভাব। তাই ব্রহ্মাই যেন বলিলেন "তুমি ধ্যানস্থ হইয়া যে জ্ঞান বা রামনামের যে রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ বা আরও যাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহাই রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বর্ণনায় স্ফুটন করিবে, বা তাহা রহস্যাকারে লেখনী সাহায্যে অঙ্কণ করিবে। বস্তুতঃ লক্ষ্মণ, বানর ও রাক্ষসগণই রাম রহস্যের আনুসঙ্গিক উপাদান, যাহা ভিন্ন এই আধ্যাত্মিক রামতত্ত্ব স্ফুটিত হইতে পারে না। বাল্মীকি এই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, আর সেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের পন্থাই যে তিনি তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনায় রূপকাকারে প্রচ্ছন্নভাবে দেখাইয়াছেন, আমরা সেই আচ্ছাদন উদ্ঘাটণ করিবার চেষ্টা করিয়া পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থ যথাযথ বিবৃত করিব। জানিনা তদ্দারা এই গ্রন্থের নিহিত গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্ তাঁহাদের বোধগম্য হইবে কি না।

পক্ষান্তরে আমরা রামের ঐতিহাসিক সত্যও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব—তাঁহার সেই সমস্ত অলৌকিক কার্য্যাবলী কিরূপে মনুষ্যসুলভ ক্ষমতাতেও সাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করাইয়া। কেননা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অলৌকিক ঘটনা জড়িত হইলে ইতিহাসের মর্য্যাদা অব্যাহত থাকে না। সুতরাং সেই সেই

ঐতিহাসিক নায়কের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও লোকে সন্দিহান হয়। মনুষ্যের পক্ষে মনুষ্যোচিত কার্য্যই সম্ভবপর এবং তাহা দেখাইতে পারিলেই তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। রাম যদি ঐতিহাসিক পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার এই সমস্ত অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক, অলৌকিক কার্য্যাবলীতে তাঁহার অস্তিত্বের উপরও সন্দেহের অবকাশ আসে। কিন্তু যখন অযোধ্যানগরী এখনও আছে, তখন রামও যে ছিলেন ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই রামচরিত্রে, ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন ছাড়াও, বাল্মীকির যে আরও দুইটি উদ্দেশ্য আছে এরূপ অনুমান হয়। তিনি রামকে বিষ্ণু অবতাররূপে প্রতিপন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এবং কি উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমরা গ্রন্থশেষে দেখাইব। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য রামকে সাধকরূপে কল্পনা করিয়া, কিরূপ সাধনার প্রণালীতে তিনি ক্রম-সোপান আরোহণে, তাঁহার কাম্য লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং রামত্ব বা আরাম লাভ করিয়াছিলেন তাহাই দেখান।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামের জন্মবিবরণ

বহুশত মহিষী পরিবৃত রাজা দশরথ, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, বশিষ্ঠাদি ঋষি ও অন্যান্য সভাসদ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রলাভেচ্ছায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্র কহিলেন "এই যজ্ঞ বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা সম্পাদন করিলে সুফল হইবে এবং রাজা পুত্রবান হইবেন। পূর্ব্বে এই বালব্রহ্মচারী উগ্রতাপস ঋষ্যশৃঙ্গ কখনও স্ত্রীজাতির দর্শন পান নাই। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদের রাজ্যে বহুকাল অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, রাজা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, এই ঋষ্যশৃঙ্গকে, বেশ্যাদিগের সাহায্যে, তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে ভুলাইয়া আনিলে, তাঁহার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ তাঁহার বন্ধু রোমপাদের রাজ্যে যাইয়া মহাসমারোহে ঋষ্যশৃঙ্গকে সস্ত্রীক অযোধ্যা রাজ্যে আনয়ন করিয়া, তাঁহাকেই প্রধান ঋত্বিক পদে বৃত করতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে যজ্ঞের অশ্ব নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে যজ্ঞ সমাপন হইল। যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত আহুতির ফলে হবিগ্রহণার্থ ব্রহ্মা সহকারে

সমস্ত দেবগণ যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "প্রভো! আপনার বরে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসপতি রাবণ, মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত লোকের অবধ্য হওয়াতে, সে সমস্ত দেবতা সহিত ত্রিভুবনের লোককে উৎপীড়িত করিতেছে; সুতরাং আপনিই ত্রিভুবনের শান্তির জন্য তাহার বধের উপায় স্থির করুন।" ব্রহ্মা বলিলেন :—"সেই রাক্ষস মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া 'মনুষ্য হইতে অবধ্য হই' এই বর প্রার্থনা করে নাই, সুতরাং সে মনুষ্যেরই বধ্য হইবে।" এই সময় বিষ্ণু গরুড়ারোহণে তথায় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মাসহ দেবগণ তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন "হে বিষ্ণো! আমরা লোকের হিতকামনার জন্য আপনার নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। প্রভো! আপনি আত্মাকে চতুর্ধা করিয়া, এই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথের হ্রী, শ্রী, ও কীর্ত্তি সদৃশী তিন ভার্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করুন। আপনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই লোককণ্টক দুরাধর্ষ রাবণকে বধ করুন।" তখন বিষ্ণু কহিলেন "হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের ঋষিদিগের ও ত্রিলোকের হিত নিমিত্ত, রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া, পৃথিবীপালন করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর নরলোকে বাস করিব।" অতঃপর বিষ্ণু চিন্তা করিয়া রাজা দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকার করিতে মনস্থ করিলেন। সেই সময় ঋষ্যশৃঙ্গও রাজা দশরথের পুত্রেষ্টিযাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে তখন সেই যজ্ঞীয় কুণ্ড হইতে রক্তাম্বর পরিহিত উজ্জ্বল দেহসম্পন্ন প্রদীপ্ত অনল শিখার ন্যায় মহান্ এক প্রাণী দুই হস্তে দিব্য পায়সপূর্ণ এক পাত্র হস্তে আবির্ভূত হইলেন। সেই পাত্রটী দেখিলেই যেন তাহা ইন্দ্রজাল নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে সেই প্রাণী রাজাকে কহিলেন "আমি প্রজাপতির নিয়োগে আসিয়াছি। এই পায়স প্রজাকর ও আরোগ্যবর্দ্ধক। তুমি ভার্য্যাদিগকে "ভক্ষণ কর". এই বলিয়া

এই পায়স দান কর। তোমার সেই সকল পত্নীরা ইহা ভক্ষণ করিলে, তাহাদের গর্ভে তুমি অনেক পুত্র লাভ করিবে।" এই বলিয়া সেই প্রাণীও অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও, তাহা লইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ তাহার অর্দ্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন। বাকি অর্দ্ধাংশ চারিভাগ করিয়া তাহার একভাগ সুমিত্রাকে দিয়া, দুইভাগ কৈকেয়ীকে দিয়া পুনরায় অবশিষ্ট চতুর্থ অংশও সুমিত্রাকে দিলেন। সেই মহিষীরাও সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া গর্ভধারণ করিলেন। দশরথও সেই পত্নীদিগকে গর্ভিনী দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন।

বিষ্ণু দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণকে বলিলেন "তোমরাও নররূপী বিষ্ণুর সহায়সকল সৃজন কর। তোমরা বানররূপী হইয়া ভল্লুকী ও বানরীতে পরাক্রমসম্পন্ন বানরনিচয় পুত্ররূপে উৎপন্ন কর।" তখন দেবতারাও বানররূপী পুত্র সকল উৎপন্ন করিলেন। মহেন্দ্র বালীকে, তপন সুগ্রীবকে, বিশ্বকর্ম্মা নলকে, পবন হনুমানকে জন্ম দিলেন। আরও অন্যান্য দেবতারা বানর পুত্র উৎপন্ন করিলেন। এই হনুমান সমস্ত মুখ্য বানরের মধ্যে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান ও অতিশয় পরাক্রমশালী। বালী ও সুগ্রীব দুই ভ্রাতা এই সমস্ত বানরের রাজা বা যূথপতি হইল।

অতঃপর রাজা দশরথের যজ্ঞসমাপনের পর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে, কৌশল্যা দেবী দিব্যলক্ষণ সম্পন্ন রামাভিধেয় তনয় প্রসব করিলেন। তাঁহার জন্মকালে রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। কৈকেয়ী ভরতকে ও সুমিত্রা লক্ষ্মণও শত্রুঘ্ন নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি উক্তরূপে পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন।

দশরথের সকল পুত্রই বয়োবৃদ্ধি সহকারে বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, বিজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়োচিতগুণগ্রামে বিভূষিত হইলেন। পরন্তু রাম সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ব-বিষয়ে সমধিক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। লক্ষ্মণ বাল্যকালাবধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের বিশেষ অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। তিনি যেন রামের বাহ্যসঞ্চারী অপর প্রাণ ছিলেন।

এইরূপ রামের জন্মবৃত্তান্ত পাঠে স্বতঃই মনে হয়, ইহা শুধু রামের বিষ্ণুঅবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই রচিত হইয়াছে। ইহার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং রামায়ণের গল্পাংশ, যাহাতে শুধু অলৌকিক ঘটনারই অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক ঘটনা। মানবের জন্ম, পুরুষ বীর্য্য সহকারে মানবীর গর্ভেই হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। ইহার ব্যভিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মৎস্যগর্ভে মনুষ্যের জন্ম, যজ্ঞাগ্নি হইতে যাজ্ঞসেনী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, শরবনে ও কুম্ভে ভরদ্বাজ ঋষির বীর্য্যে কৃপ ও দ্রোণের জন্ম, ব্যাসের বীর্য্যে অরণি কাষ্ঠে শুকের জন্ম, এই সকলের প্রাচুর্য্য যাহা মহাভারতে বর্ণিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে এই পায়সান্ন আহারেই যে শুধু রাম লক্ষ্মণাদির জন্ম হইয়াছিল তাহাত বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু বাল্মীকি ঋষি একেবারে অতটা অসঙ্গত কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন মহিষীরা গর্ভধারণ করিয়া ছয় ঋতু অতীত হইলে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মনুষ্যজনোচিত প্রায় দশমাস গর্ভধারণ ও পোষণ করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবও যদি সত্য কথা ব্যক্ত করিয়া, বাল্মীকির অনুসরণে, ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভেই কৃপ, দ্রোণ এবং তৎ কর্তৃক শুকের গর্ভাধান সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে এই সমস্ত জন্ম বৃত্তান্ত লোকচক্ষে কাল্পনিক আজগবী গল্প বলিয়া অবহেলা করা হইত না। এখন বৃদ্ধবয়সে দশরথ কর্তৃক এই মহিষীদের গর্ভ

সঞ্চার হওয়া সম্ভব কিনা তাহাই বিচার্য্য। রামের জন্ম সময়, তিনি কি এতই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রজনন শক্তি একবারেই লোপ পাইয়াছিল? আমরা দশরথের বয়সের হিসাব করিয়া দেখাইব তাহা নহে।

পরের অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন "আমি ষষ্ঠি সহস্র বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এতকালে আমার পুত্র জন্মিয়াছে। সুতরাং পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক রামকে আপনি রাক্ষস বধার্থ লইয়া যাইতে চাহিতেছেন।" বাল্মীকির রচনার ভঙ্গীই এইরূপ যে তিনি এককে এক সহস্ররূপে বহু স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই হিসাবে রামের যখন পঞ্চদশবর্ষ, তখন দশরথের বয়স ষষ্ঠি অর্থাৎ ৬০ বৎসর। সুতরাং দশরথের ৪৫ বৎসর বয়সে রামের জন্ম হইয়াছিল। ইহা প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের সন্ধি স্থান। বর্ত্তমান কালেও অনেক ৬০।৬৫ বৎসর বয়সের পুরুষেরা সন্তান জন্ম দিয়াছেন দেখা যায়। সেইরূপ নারীজাতিরও রজোনিবৃত্তি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের উপরেই হয়। পঞ্চাশ বা তন্নিম্নবয়স্কা অনেক নারী গর্ভধারণ করিয়াছেন ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। পূর্ব্বকালে অনেক রাজাই অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত হইতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বা ঋষিদের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশধারা রক্ষা করিতেন। স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নই তাঁহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিরূপে তিনি বিধবা ভ্রাতৃ-বধূর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম দিয়া কুরুবংশে ক্ষত্রিয়শোণিতের ধারা অব্যাহত রাখিয়া ছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই তাঁহার মহা-ভারতে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি বরাবরই রামকে পবিত্র ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় রূপে রাখিয়াই, কাকুৎস্থ, রাঘব

ইত্যাদি ইক্ষাকুবংশসম্ভূত স্বনামধন্য ক্ষত্রিয় রাজবংশাবতংস পুরুষ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন এবং রাজা দশরথের ক্ষেত্রজ পুত্র-রূপে তাঁহাদিগকে পরিচিত করেন নাই। যজ্ঞাগ্নি হইতে পায়স উত্থিত হইল। তাহাই ভক্ষণে রাণীরা গর্ভধারণ করিলেন। ইহাতে ইহাই বুঝায় যে রাণীরা সেই পায়স ভক্ষণে শক্তিমতী হইয়াই গর্ভধারণক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রধান তিন রাণীকেই সেই পায়স ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। এস্থানে তিনি তাঁহাদেরই সাহচর্য্য করিয়াছিলেন ইহাই বুঝায়। তাঁহার অন্তঃপুরে ক্ষত্রিয়ানী বৈশ্যানী, শূদ্রানী প্রভৃতি তাঁহার বহুশত মহিষী ছিল। এত সংখ্যক স্ত্রী সম্ভোগে তাঁহার পুরুষত্ব থাকার সম্ভব কি? কাজেই তাঁহার কোন পত্নীরই গর্ভাধান হয় নাই। রাজা দশরথ যে অতীব কামাসক্ত ছিলেন, তাহা রাম ব্যতীত তাহার অন্যান্য পুত্র-দিগের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাই অসংযমী রাজার সংযমের জন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে বৎসরাধিক কাল রাজাও রাণীদিগকে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, সংযমী হইয়া ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক বৎসর কঠোর সংযমের পর যখন অশ্বমেধের সমাপনান্তে পুত্রেষ্টি যাগ হইল, তখন রাজা ও মহিষীরা নব বলে বলীয়ান্ হইলেন। তদুপরি যজ্ঞাগ্নিতে পক্ক ঘৃত তণ্ডুলাদি মিশ্রিত চরু ভক্ষণ করিয়া, তাঁহাদের হৃত প্রজনন শক্তি পুনরুদ্দীপিত হইল। এই চরুভক্ষক বশিষ্ঠেরই শত পুত্রের উল্লেখ আছে। তারপর, তাঁহাদের পুত্রেষ্টি যাগ করিলে নিশ্চয় সন্তান উৎপন্ন হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন জন্য বাল্মীকি, সুমন্ত্রের মুখে অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষ্য-শৃঙ্গের অবতারণাও পূর্ব্বেই করাইয়াছিলেন। একে পুত্র প্রাপ্তির ঐকান্তিক কামনা, তারপর অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্রেষ্টি যাগের

অগ্নিপক্ব চরুভক্ষণ, এই সমস্ত কারণে রাজা ও রাণীদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি বৰ্দ্ধিত ও নবজাগরিত হওয়াতে, স্বাভাবিক-ভাবেই দশরথ কর্তৃক তাঁহাদের গর্ভাধান হইয়াছিল। রামাদির জন্ম যে স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছিল তাহা এই বর্ণনা হইতেই স্ফুটিত হয়। আর এই রূপ হইলেই মনুষ্য রামের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। বিষ্ণু অবতার রামের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। এখানে তিনি বিষ্ণুরই আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার শীতকৃষ্ণ কেশের আশ্রয় লন নাই, যাহার অর্থ করিতে মহা পণ্ডিতদের মাথা ঘামাইতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাড়কা রাক্ষসী বধ

পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা দশরথ তাঁহাদের বিবাহ বিষয়ে চিন্তা করিয়া অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমত সময় মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তথায় আগমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদানে অভিনন্দন করতঃ বলিলেন "আপনি আদেশ করুন আমি আপনার কি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিব। আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই পালন করিব।" বিশ্বামিত্র কহিলেন "আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন, আমার যাহা অভিলাষ তাহা পালন করিবেন। আমি যাগ করণাভিলাষে দীক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু মারীচ ও সুবাহু নামে কাম বা ইচ্ছারূপী দুই রাক্ষস সেই যাগের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অনেকবার নিয়ম সমাপ্ত হইলে, যজ্ঞসমাপনকালে সেই বিঘ্নকর রাক্ষসদ্বয় আমার যজ্ঞীয় বেদী রুধিরে প্লাবিত করে, যজ্ঞসংকল্পভগ্ন ও যজ্ঞনষ্ট হওয়ায়, আমি পণ্ডশ্রম ও নিরুদ্যম হইয়া, অগত্যা সেস্থান হইতে প্রস্থান করি। যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে কাহাকেও অভিশাপ দিতে নাই, এই জন্য তাহাদিগকে শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। অতএব আপনি বীর্য্যসম্পন্ন, সত্য-পরাক্রম ভবদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে আমাকে প্রদান করুন। ইনি মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, স্বীয় অমানুষিক তেজে, যে যে রাক্ষসেরা

যজ্ঞবিঘ্ন জন্মাইতে উদ্যত হইবে, তৎসমুদয়কেই নিহত করিতে সমর্থ হইবেন। আমি তাঁহার নানাবিধ কল্যাণ বিধান করিব। তাহাতে ইনি ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি লাভ করিবেন। সেই রাক্ষসদ্বয় রামের সহিত যুদ্ধে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। রাম ব্যতীত এমত আর কেহ নাই, যে সেই রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিতে উৎসাহান্বিত হয়। অতএব আপনি দশদিনের জন্য পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া রামকে আমার সহিত প্রদান করুন। সত্যপরাক্রম রাম যে কে, ইহা আমি জানি এবং মহাতেজস্বী ঋষি বশিষ্ঠ এবং এই সকল তপোনিরত ঋষিরাও জানেন।

'অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।'

বশিষ্ঠ প্রভৃতির অনুমোদনে আপনার তনয় আসক্তিশূন্য রামকে আমাকে প্রদান করুন।"

সেই অশনিপাতনির্ঘোষতুল্য নিদারুণ বাক্যশ্রবণে রাজা বিচলিত এবং মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন "আমার রাজীবলোচন রামের বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর। সে বয়সে বালক, এখনও কৃতবিদ্য হয় নাই।

'উনষোড়শবর্ষোমে রামো রাজীবলোচনঃ।'

সুতরাং রাক্ষসদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার শক্তি দেখিতেছি না। যদি আপনি নিতান্তই রামকে লইয়া যাইতে অভিলাষ করেন, তবে চতুরঙ্গবলের সহিত আমাকেও তৎসমভিব্যবহারে লইয়া চলুন। ষষ্ঠি সহস্র বৎসর হইল আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতিকষ্টে এতকালে আমার পুত্র জন্মিয়াছে।

'ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণিজাতস্য মম কৌশিক।'

জ্যেষ্ঠ তনয় রামের প্রতি আমার অতিশয় স্নেহ, অতএব আপনার

কেবল রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয়না। আপনি সেই রাক্ষসদের জন্ম ও ক্ষমতার বিবরণ বলুন।" তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "পৌলস্ত্যবংশসম্ভূত মহাবাহু মহাবীর্য্যবান রাবণ নামক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, বহুরাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন লোককেই উৎপীড়িত করিতেছে। শুনিতে পাই সেই রাক্ষসপতি রাবণ, বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

'শ্রুয়তেচ মহারাজ রাবণো রাক্ষসধিপঃ।

সাক্ষাদ্বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ!'

যখন সেই মহাবল রাক্ষস তুচ্ছজ্ঞানে স্বয়ং যজ্ঞবিঘ্ন করিতে ক্ষান্ত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু নামক সেই দুই মহাবল রাক্ষসকে যজ্ঞবিঘ্নকরণার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে।" তখন দশরথ কহিলেন, "আমিই যখন সেই ভীষণ রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে স্থির হইতে পারিব না, তখন আপনি এই হতভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন হউন্। আমি কোনক্রমেই সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক পুত্রকে আপনাকে প্রদান করিতে পারিব না। সেই মারীচ ও সুবাহু আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন করুক, তথাপি আমি পুত্র প্রদান করিব না।"

তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্! পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করতঃ এখন আপনি প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া, রঘুকুলের নিতান্ত গর্হিত আচরণ করিতেছেন। ইহাই যদি আপনি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে আমি নিজস্থানে প্রতিগমন করি, আপনিও বৃথাপ্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুগণের সহিত সুখে অবস্থান করুন।" তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, "ত্রিলোকমধ্যে আপনি ধর্ম্মাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব রামকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আপনার ধর্ম্ম অক্ষত রাখুন। রাম

অস্ত্রকুশল হউন বা না হউন রাক্ষস রামের বীর্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। রাম বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইবেন, কেননা ইনি যে সকল অস্ত্র বিজ্ঞাত আছেন ত্রিলোকের অন্য কোনও ব্যক্তিই তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। এই কৌশিক বিশ্বামিত্র একাকীই সে রাক্ষসদিগের সংহারে সমর্থ; তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।" তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে অনুমতি দিলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহারা পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সরযূতীরে উপনীত হইলেন।

তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, "বৎস! অনর্থক সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আচমনপূর্ব্বক শীঘ্র 'বলা' ও 'অতিবলা' নাম্নী দুইটী বিদ্যা ও অন্যান্য সকল মন্ত্র গ্রহণ কর। 'বলা' ও 'অতিবলা' নাম্নী এই দুইটী বিদ্যা অধিগত করিতে পারিলে, তোমার কোনরূপ পরিশ্রম, জ্বর বা রূপবিকার হইবে না। তুমি প্রমত্তই থাক বা প্রসুপ্তই থাক, তোমাকে রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারিবে না; এবং পৃথিবী মধ্যে বাহুবলে তোমার তুল্য কেহ হইবে না। বলা ও অতিবলা নাম্নী এই দুই বিদ্যা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের প্রসূতি। ইহা দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা থাকিবেনা। যদিও তোমার এই সকল ও বহুবিধ গুণ আছে তথাপি আমি তোমাকে এই দুই তেজস্বিনী প্রজাপতি ব্রহ্মার নন্দিনী বিদ্যা দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, কারণ তুমিই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি ইহা গ্রহণ করিলে ইহা সমধিক ফলপ্রদ হইবে।" তখন রাম আচমনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের নিকট সেই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি,

'যেরূপ গুরুর প্রতি আচরণ করিতে হয়' সেইরূপ সমস্ত কার্য্য করিলেন। তাঁহারা সেই রাত্রি সরযূর দক্ষিণ তীরে, অনভ্যস্ত তৃণশয্যায়, বনজাত ফলমূল আহারে, বিশ্বামিত্রের বাক্যে অবহিত হইয়া পরমসুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

তৎপর দিন তাঁহারা সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে রাত্রি যাপন করিয়া তৃতীয় দিন গঙ্গাপার হইয়া, তাহার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক ভীষণ দর্শন মনুষ্যসমাগমশূন্য বন দেখিতে পাইয়া, রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে এরূপ দারুণ বন জন্মিয়াছে।" তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "রাম! পূর্ব্বে এই স্থানে দেবনির্ম্মিত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত মলদ ও করুষ নামে দুইটী জনপদ ছিল। পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে কলুষিত মলিন ও ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ মলসমন্বিত মহেন্দ্রকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া, তাঁহার মল ধৌত করিয়াছিলেন। এইস্থানে দেবতারা ইন্দ্রের শরীরস্থ মল ও করুষ (ক্ষুধা) নিক্ষেপপূর্ব্বক হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্রও নির্ম্মল ও করুষহীন হইয়া, এই দেশের প্রতি প্রীত হইয়া, এই দেশকে বরদান করিলেন যে 'যেহেতু এই প্রদেশ আমার দেহের মল ও করুষ ধারণ করিল, অতএব এই প্রদেশে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দুইটী জনপদ হইয়া, মলদ ও করুষ নামে বিখ্যাত হইবে।' এই প্রদেশে বহুকাল মলদ ও করুষ নামে ধনধান্য পরিপূর্ণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রমুদিত দুইটী জনপদ ছিল। কিছুকাল পরে ধীমান্ সুন্দের সহস্রমাতঙ্গবলধারিণী কামরূপিণী তাড়কা নাম্নী এক যক্ষিণী ভার্য্যা হইল। তাহার গর্ভে বৃত্তবাহুশালী, সুবৃহৎকায়-বিশিষ্ট, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী, মহামস্তকসমন্বিত, বিপুলবদন মহান্

মারীচ নামক রাক্ষস পুত্র জন্মে। সেই ভীষণকায় রাক্ষস নিয়ত লোকগণকে বিত্রস্ত করিয়া থাকে। সেই দুষ্টচারিণী তাড়কা মলদ ও করূষ নামক দুইটী জনপদে নিয়ত উৎপীড়ন করিতেছে। সে এস্থান হইতে অর্দ্ধযোজনান্তরে, পথ আবরণ করিয়া আছে। যে বনে তাড়কা বাস করে, অতঃপর আমাদিগকে সেই বনে যাইতে হইবে। রাম! তুমি আমার নিয়োগক্রমে স্বীয় বাহুবলে সেই দুষ্টচারিণী যক্ষিণীকে বিনাশ করিয়া এই প্রদেশকে নিষ্কণ্টক কর। দুর্ব্বিষহ পরাক্রমশালী ঘোররূপিণী সেই যক্ষিণী এই স্থান উৎসন্ন করিয়াছ, তথাপি সে আজও নিবৃত্ত হয় নাই। এই প্রদেশে কাহারও আগমন করিতে শক্তি নাই। অগস্ত্যশাপে সুন্দ নিহত হইলে, তাড়কা পুত্রের সহিত তাঁহাকে ধর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়, তখন অগস্ত্য তাহাকে শাপ দেন যে, তুই ভীষণরূপা বিকৃতবদনা রাক্ষসী-রূপে ও তোর পুত্রও রাক্ষসরূপে পরিণত হ'। সেই তাড়কা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া, অগস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত এই শুভ প্রদেশ উৎসন্ন করিয়াছে। রাম! সেই ভীষণা রাক্ষসীকে গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত বধ কর। তোমা ব্যতীত এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কেহ নাই, যে এই রাক্ষসীকে নিহত করিতে সক্ষম হয়। রাজ্যের শুভার্থে, সেই পাপচারিণী নারী হইলেও, তাহাকে হত্যা করায় তোমার অধর্ম্ম হইবেনা। কেননা সেই যক্ষিণীর ধর্ম্ম নাই।"

তখন রাম ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর জ্যা-শব্দ করিলেন। তাড়কা সেই শব্দ শুনিয়া রামের প্রতি ধাবিতা হইল। সেই কামরূপিনী রাক্ষসী, আত্মমায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "সন্ধ্যা হইলে এ অত্যধিক বল লাভ করিবে, অতএব তুমি ঘৃণা

ত্যাগ করিয়া ইহাকে শীঘ্র বধ কর।” তখন রাম শরাঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন, “রাম! আমি তোমার কার্য্যে অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমি পরম প্রীতির সহিত তোমাকে আমার জ্ঞাত সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিতেছি। এই সমস্ত অস্ত্রে তুমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে।” তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সেই সমস্ত অস্ত্র শিক্ষা দিলে রাম তখন সেই সমস্ত অস্ত্রকে বলিলেন “তোমরা আমার মানসবর্ত্তী হইয়া থাক।”

বিশ্বামিত্র ঋষি কি উদ্দেশ্যে রাজা দশরথকে ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তাঁহার নিকট হইতে রামকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা রামায়ণ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমতঃ ইহা তাঁহার নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য। সেই অভীষ্ট কি? বিশ্বামিত্র ঋষি তপোবলে সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ক্রোধ ও কামনা দূর করিতে পারেন নাই—তাহা মেনকা অপ্সরার সহিত তাঁহার দশ বৎসর সম্ভোগ ও শকুন্তলার জন্মেই প্রমাণিত হয়। তাঁহার ক্রোধের সীমাও যে বিপর্য্যস্ত হইত, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও তিনি আত্মজ্ঞানলাভে বা আরামপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত ছিলেন। আত্মজ্ঞান বা রামপদ প্রাপ্ত হইতে হইলে লোভ, ক্রোধাদি সমস্ত কাম জয় করিয়া শমদমান্বিত হইতে হয়। তিনি রাজর্ষি ছিলেন এবং একরূপ ভয় প্রদর্শনেই, তাৎকালিক ঋষি সমাজের নিকট হইতে, ব্রহ্মর্ষি আখ্যা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। তাই বলিয়াছিলেন যে যখনই তিনি যাগ করিতে উদ্যত হন, তখনই কামনা বা বাসনারূপী মারীচও সুবাহু নামে রাক্ষসদ্বয় তাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, তাঁহার আত্মজ্ঞানলাভের সাধনায়

বাধা জন্মায়। সেই কামরূপী রাক্ষসদ্বয়কে বধ করিবার জন্যই বা সেই প্রধান রিপুদ্বয়কে জয় করিবার জন্যই, তাঁহার রামের সাহায্যের প্রয়োজন। এই রাম যে কে, বা কি, তাহা তিনি এবং বশিষ্ঠাদি সমস্ত তপোনিরত ঋষিরা অবগত ছিলেন। রাম ভিন্ন অন্য কেহ এই রাক্ষসদ্বয়কে বধ করিতে সমর্থ নহে। তিনি নিজেও তাহাদিগকে শাপ দিয়া অভিভূত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে আত্মজ্ঞানলাভের সাধনার জন্য যে দম ও ক্ষমার প্রয়োজন তাহা বিনষ্ট হওয়াতে, তাঁহার সেই পথে আরোহণের পরিবর্ত্তে পতনই হইবে। প্রকৃত শান্তি বা আরাম প্রাপ্ত হইতে হইলে সংযম, শম, দম, ক্ষমা প্রভৃতি শীল অভ্যস্ত না হইলে, তাহা সিদ্ধ হয় না। রামই সেই আরামের প্রতীক। বিশ্বামিত্র বহুকাল তপস্যার ফলে একাগ্রতা লাভে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তপস্যাতেও একটী না একটী কামনা থাকে, যাহা লাভ করিবার জন্যই তপকৃচ্ছ্রের প্রয়োজন। প্রত্যেক তপস্যার ফলই কিছু না কিছু বর প্রাপ্তি। অধিকাংশ স্থলে ব্রহ্মাই এই বরদাতা। কেননা ব্রহ্মাই প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, কাজেই তিনি সকল সৃষ্ট প্রাণীর পিতা ও পিতামহ। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পিতাকেই জানে এবং ভয়ে, আপদ-বিপদে এবং প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, পিতারই আশ্রয় লয়; কেননা সে তো আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে না। তাই রাক্ষসাদি এবং মনুষ্যাদি ব্রহ্মারই তপস্যা করিয়া তাহাদের পিতা বা পিতামহ ব্রহ্মার নিকটই বর প্রাপ্ত হয়। বিশ্বামিত্রও তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকটই বর প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সমস্ত লোকাতীত কার্য্য দেখাইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র এতকাল তপস্যা করিয়া কেবল যোগবিভূতিই লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে তাঁহার মনে হইল তিনি এতকাল ভস্মে ঘৃতদানের ন্যায় বৃথাই তপস্যা

করিয়াছেন; ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ অগস্ত্য বা বশিষ্ঠের সিদ্ধির ন্যায়, তিনি পিতামহ ব্রহ্মারও যে পিতা আছেন যাঁহাকে বা যাহা পাইলে চির শান্তি বা চির আরাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পদলাভে সিদ্ধ হন নাই। তাই তিনি রামকে অবলম্বন করিয়া বা তাহার সাহায্যে তাহা সম্পন্ন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। কেননা রাম যে কি বস্তু তাহা তিনি জানেন। এখানে রামের অর্থ—

"যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ঃ বিদ্যয়া জ্ঞান বিপ্লবে"।

দশরথাত্মজ রামকে তিনি সেইরূপভাবেই চিন্তা করিয়া, তাহাকেই, তাঁহার অভীপ্সিত রাম বা আরামের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে তাঁহার মানসপটে, একাগ্র চিত্তে ধ্যান দ্বারা স্থির ও স্থিত করিয়া সাধনা দ্বারা তিনি সেই রামই হইবেন বা রামের পদ প্রাপ্ত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই তাঁহাকে (রামকে) দশ দিনের জন্য দশরথের নিকট হইতে লইয়া আসিলেন। যে দশরথ রাজার দশদিকে ধাবিত মনোরূপরথ প্রত্যাকর্ষিত হইয়া এক রামরূপ আত্মা বা আত্মজে নিবদ্ধ হইয়াছিল, যাঁহার নয়নের দৃষ্টি দশ দিকের বাহ্য পদার্থ বা বৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নয়নমনি রামে গাঢ় আসক্ত হইয়াছিল, সেই নয়নমণি হরণই, বিশ্বামিত্রের অভিপ্রায়। বিশ্বামিত্রের সেই অভীষ্ট কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইব।

বাল্মীকি ঋষি বিশ্বামিত্রের ইতিহাস লিখিবার জন্য রামায়ণ রচনা করেন নাই। ইহা একটী পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয় ঘটনা। সুতরাং রামের পক্ষে তাঁহার কি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে এই বিশ্বামিত্রের অবতারণা হইল, ইহাই দেখিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার (বাল্মীকির) এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই রামচন্দ্র দ্বারা রামত্বপ্রাপ্তির সাধন প্রণালীর পথ প্রদর্শন।

সুতরাং এই মনুষ্য রামকে প্রকৃত রাম বা আরামের প্রতীকরূপে পরিণত করিতে হইলে, তাহাকে কিরূপভাবে গঠন করিতে হইবে, কিরূপ ছাঁচে ঢালিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শন জন্য তিনি বিশ্বামিত্রের সাহায্য লইলেন। যোগাভ্যাসই যে এই সাধনার মূল তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। এই যোগাভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়। রামের এই প্রথম অভ্যাস বাল্মীকি বিশ্বামিত্রের সাহায্যেই সংঘটন করাইলেন। দশরথ তাঁহার নয়নপুত্তলি রামকে একদণ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন না এরূপ বলিয়াছিলেন। রামও শিশুকাল হইতেই অতি যত্নে রাজসম্পদ ও সম্ভোগে বৰ্দ্ধিত। সুতরাং তাঁহাকে এই অভ্যস্ত রাজসম্ভোগ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করাইতে হইলে রাজপ্রাসাদ ও অযোধ্যানগরীর বাহিরে লইবার নিতান্ত প্রয়োজন। দশরথের নয়নান্তরালরূপ দুরূহ কার্য্য সাধন এক বিশ্বামিত্র দ্বারাই সম্ভব। তৎকালীন ক্ষত্রিয় রাজারা যদি কাহাকেও ভয় করিতেন, তবে তাহা এই ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকেই,—তাঁহাদের শাপভয়ে ভীত হইয়াই করিতেন। বিশ্বামিত্রের কোপনস্বভাব তখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বিশ্রুত। রাজা প্রথমে অস্বীকার করিলেও যখন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দর্শনে, রাজাকে সতর্ক করিলেন তখন তিনি অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন বিশ্বামিত্র অনেক অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং এই বিদ্যা তিনি রামকে দান করিবেন। রাম এ পর্য্যন্ত যে অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট নহে, বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি অনেক দুর্লভ বিদ্যা শিখিতে পারিবেন—যাহাতে ভবিষ্যতে রামের অনেক উপকার হইবে। ঐতিহাসিক রামের অসাধারণ বীর্য্যবত্তা ও অদ্ভুত অস্ত্রকুশলতার দৃষ্টান্ত

দেখাইতে হইলে, তাহা অদ্ভুতকৰ্ম্মা বিশ্বামিত্রের নিকট শিক্ষার ফলেই হইতে পারে, ইহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে বাল্মীকি বিশ্বামিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক মনুষ্য রামের দিক দিয়া আমরা দেখাইলাম।

কিন্তু উল্লিখিত রামায়ণোদ্ধৃত বর্ণনার মধ্যে যে ব্রহ্মার উপদিষ্ট, বাল্মীকির গূঢ় রহস্যের সূচনা, গূঢ়ভাবেই নিহিত আছে তাহাও আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাহা কিরূপে বুঝা যায়? তাহা ঐ 'বলা' ও 'অতিবলা' নাম্নী দুইটী মহাবিদ্যার কথাতেই স্ফুটিত হইয়াছে। রামকে প্রথমেই ঐ দুইটী বিদ্যা গ্রহণ করিতে বিশ্বামিত্র আগ্রহ করিলেন। ঐ দুইটী বিদ্যা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার তেজস্বিনী নন্দিনীস্বরূপ তাঁহারই জ্ঞান। ইহা সমস্ত জ্ঞানের প্রসূতিস্বরূপ। উহা আয়ত্ত করিলে "জ্ঞানে তোমার তুল্য কেহ থাকিবে না।" ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ ব্যক্ত করিয়াছেন। অনন্তজ্ঞান হইতে, সমস্ত আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞানই চতুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী, সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞানে, জ্ঞানী

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজং"

"প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্মঃ।"

ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জ্ঞান নিসৃত হয়। তাঁহারই প্রতীক ব্রহ্মা। সুতরাং এই বলা ও অতিবলা বিদ্যারূপ নন্দিনী দ্বারাই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যেন সাধনা পথের পথিককে, ব্রহ্মেরই দুই কন্যা হাত ধরিয়া তাহাদের পিতার সকাশে, পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যায়। এই বিদ্যাদ্বয় অধিগত হইলে, জরা বা সুখ দুঃখ রূপ কোনও বিকারের উপদ্রব থাকে না। এই "বলা"ই হইল মনের বল সংগ্রহ করিয়া মনকে আয়ত্বে আনা, আর অতিবলা তদপেক্ষাও

শক্তিশালী যাহার সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত করিব। ইহাই গুরুস্থানীয় বিশ্বামিত্রের নিকট রামের প্রথম শিক্ষা, তাহাই ঋষি বর্ণন করিলেন। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য এখানেই ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্বামিত্রকেই, তাহার শিক্ষাগুরুর স্থানে স্থিত করিয়া, রামের সাধনার আরম্ভ করাইলেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠও তো ইহা করিতে পারিতেন? কিন্তু রাজপ্রাসাদের রাজভোগের ও বিলাসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া এই কঠোর সাধনা সম্ভব হয় না। বশিষ্ঠও দশরথের ঋত্বিক ও মন্ত্রী। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও রাজাদেশের অন্যথা করিতে পারিতেন না। তাই তিনি এই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া রাজাকে বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

রাম, বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যালাভে পারদর্শী হইয়া, ভীমকায় দুর্দ্ধর্ষ তাড়কা রাক্ষসীকে শরাঘাতে নিহত করিলেন। পঞ্চদশবর্ষীয় রাজপুত্রের এই বীর্য্যের দৃষ্টান্ত আমরা রাজপুতনার ইতিহাসে বাঁদল ও পুত্তের উপাখ্যানে দেখিতে পাই। ইহা ঐতিহাসিক রামের পক্ষে কিছুই অলৌকিক নহে। একটী দুর্দ্ধর্ষ মহাকায় মাংসভোজী আদিম মনুষ্যজাতীয়া নারীকে, দূর হইতে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করাতে কোনই অলৌকিকত্ব নাই। ইহাতে রামের শৌর্য্য ও পরাক্রমই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই তাড়কা নামের কি কোনও গূঢ় অর্থ আছে? বাল্মীকিই বা ইহার নাম তাড়কা রাখিলেন কেন? তাড়কা কামরূপিণী রাক্ষসী। তাড়কা শব্দের অর্থ যে তাড়ন করে বা পীড়ন করে। কোন বিষয় প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা বা উদ্যোগ করিলে—যাহা তাহা হইতে তাড়াইয়া দেয়। সাধক, সাধনার লক্ষ্য বা সাধ্যের ধ্যানে বসিলেই কামনা ও

বাসনারূপী বৃত্তিগুলি আসিয়া তাহার মনকে আকর্ষণ করে; যেন তাহার সেই লক্ষ্য পথে ধাবিত মনকে তাড়াইয়া তাহাকে পথভ্রষ্ট করে। ইহাই তাড়কা; যেহেতু কামনা বাসনা শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ। মনের বল সংগ্রহ করিবার জন্য যে বলা বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বিশ্বামিত্র, রামের মনে বল সঞ্চার দ্বারা, মন সংযমের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যকরী হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য, এই তাড়কারূপী কামনা ও ইচ্ছার দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রিতে রাম সরযূ তীরে, মুক্ত আকাশের নীচে, জনমানবহীন স্থানে, বনজাত ফল মূলাহারে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া পর্ণশয্যায় শয়ন করতঃ রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। রাম যে রাজপ্রাসাদের দুগ্ধফেননিভশয্যার পরিবর্ত্তে, কঠিন ভূমিতে তৃণশয্যাতে শয়ন করিয়াও, সুনিদ্রা উপভোগান্তে, প্রভাতে উঠিয়া কোন বিরক্তি বা ক্লেশসূচক চিহ্ন দেখান নাই, এবং প্রফুল্ল-বদনেই তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন, ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহার ক্লেশসহিষ্ণুতার পরিচয় পাইলেন। আর অদ্যও তাঁকে প্রথমে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, ঘোর বনে তাড়কা রাক্ষসীর ভয় দেখাইয়া, তাঁহার মন সংযমের কোন বিঘ্ন হয় কিনা—তাঁহার ভীতিতেও রাজভোগ কামনায়—তাহাই পরীক্ষা করিলেন এই তাড়কার অবতারণায়। রাম যে সেই কামরূপী রিপু বধ বা দমন করিয়া মনের স্থৈর্য্য দেখাইতে সক্ষম হইলেন, ইহা বিশ্বামিত্র উপলব্ধি করিলেন।

পুনশ্চ বিশ্বামিত্র রামকে বলিয়াছিলেন তাঁহাদের গন্তব্যস্থান বনের অপর পার্শ্বে যাইতে হইলে, এই বিপদসঙ্কুল বনের মধ্যস্থিত পথ অবলম্বনে যাইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌঁছিতে পারেন। পক্ষান্তরে আর একটী নিরাপদ পথও আছে, যাহা এই বনকে বেষ্টন করিয়া তাহার অপর পার্শ্বে পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু তাহা অতিক্রম

করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে। এরূপ বলা সত্ত্বেও রাম সেই ভয়সঙ্কুল পথে যাইতেই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প জানাইলেন। ইহাতেও বিশ্বামিত্র বুঝিলেন রাম এই তাড়কারূপী ভীতি, কামনা ও বাসনাও দমন করিলেন।

ইন্দ্রের মল ও করুষ ধৌত হইয়া যে স্থানে পড়িয়া, তাহার ভূমি কলুষিত হইল, সেই স্থানেই মলদ ও করুষ নামে জনপদ হইল। এস্থানে ইন্দ্র অর্থে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রের বা আত্মার অনুমাপক প্রকাশক লিঙ্গই ইন্দ্রিয়। সুতরাং ঐ মল করুষ ইন্দ্রিয়েরই। সেই মল ও করুষ-দুষ্ট স্থানের ভূমি হইতে যাহারা উদ্ভূত হইল, তাহারাও ঐ মল ও করুষ-দ্বারা দূষিত হইল—যেমন ময়লা গোময় বা বিষ্ঠা হইতে ঘৃণ্য কীটের জন্ম হয়। আবার তাড়কাও সেই মল ও করুষ-দুষ্ট জনপদের প্রাণীর ভক্ষণে পুষ্ট হইয়া, সেই কলুষ দুষ্ট হইল। ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রের মল তাহার মনের মলিনতা, আর করুষ ক্ষুধার পীড়ন। সুতরাং কামরূপী তাড়কা এই মনের মলিনতা ও ক্ষুধার মূর্ত্ত প্রতীক। নানারূপ কামনাই, মনের মালিন্য এবং দুষ্ট ক্ষুধাই যোগের বা সাধনার বিঘ্নকর। তাই তাড়কা কামরূপী, মনের মালিন্য, ক্রোধ লোভ কামাদি ষড় রিপুর তাড়না। সেই মলদ ও করুষ জনপদের প্রাণীরা, এই সমস্ত রিপুর বশীভূত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিয়া উৎসন্ন হওয়াতে, ক্রমে সেই জনপদ গভীর অরণ্যে পরিণত হইতেছিল। জনপদবাসীরা লোভে পড়িয়া অখাদ্য আহার করিয়া পীড়িত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, এবং অন্যেরা আপনাদের মধ্যে ক্রোধ ও হিংসার বশে দ্বন্দ্ব করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিল। ইহাই এই বর্ণনার গূঢ় তাৎপর্য্য। পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, অগস্ত্য ঋষিস্থাপিত এই প্রদেশ জনশূন্য হইতেছিল। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে অগস্ত্য ঋষিই, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্য

অভিমুখে যাইয়া, সেই সেই প্রদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গঙ্গার দক্ষিণ দিকের তীরে একদিনের পথ অতিক্রম করিয়া যে স্থানে বিশ্বামিত্র রাম সমভিব্যবহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও অগস্ত্য ঋষিরই দাক্ষিণাত্যে একটী উপনিবেশ। তিনি শিষ্যগণসহ ক্রমেই আর্য্যাবর্ত্তের জনপদবহুল স্থান ত্যাগ করিয়া, তপস্যার জন্য নিবিড় জনসমাগমহীন প্রদেশের অন্বেষণে স্থানে স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া তপস্যানিরত হইতেন। উপনিষদের আরণ্যক ঋষিরা এই অরণ্যেই তপস্যা করিতেন। জনপদসংশ্রবে পাছে তাঁহাদের মন কলুষিত হয়, সেই জন্য অরণ্যবাসই তাঁহারা নিরাপদ মনে করিতেন। অগস্ত্য ঋষি এই নির্জ্জন স্থানে প্রথমে তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিলেন। ক্রমে এই স্থানে কালে জনপদের উদ্ভব হইলে সেই জনপদবাসীরা ক্রমে আহার, বিহার ও বিলাসিতায় আসক্ত হইল। তখন তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে সেই জনপদবাসীদের সংশ্রবে আসিয়া তাহাদের আশ্রমোচিত আহার বিহার নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের সহিত মেলামিশা করিবার ফলে, প্রবৃত্তির দাস হওয়াতে, সংযমাদি ভ্রষ্ট হইল এবং তাহাদের মনও মলিনতা পূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্ষুধার প্রকোপও বৃদ্ধি হইল—ঐ জনপদবাসীদের নানারূপ লোভজনক আহার্য্য বস্তুর আস্বাদন করিবার প্রবৃত্তিতে। শিষ্যগণের এইরূপ ক্রমিক অধঃপতন অনিবার্য্য দেখিয়া, তিনি এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আরও দূরে দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন। যে সমস্ত শিষ্য তখনও সংযমভ্রষ্ট হয় নাই, মাত্র তাহাদিগকেই সঙ্গে লইয়া প্রমত্তদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। এই শেষোক্তেরা জনপদবাসীদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল এবং তাহাদের ন্যায় পরিণাম প্রাপ্ত হইল। এইরূপেই অনেক তাপস উৎসন্ন ও নিধনপ্রাপ্ত হইল। এই তাড়কারূপ কামরূপী রাক্ষসীই

সেই তাপসদের কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি মনের মলরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাকলুষিত মলিন ও ক্ষুধাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

"পুরা বৃত্র বধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্।
ক্ষুধাচৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ ॥"

বৃত্র, অসুর বলিয়াই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং অসুর বধে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইলেন কিরূপে? কিন্তু বাল্মীকি তাহাকে অসুর বলেন নাই। সুতরাং এই বৃত্রের অর্থ কি? বৃ+ত্র বৃ-ধাতু আবরণে। সেই আবরণ হইতে যাহা ত্রাণ করে তাহাই বৃত্র। যেমন ক্ষৎ বা অনিষ্ট হইতে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্র। আবরণ কাহার? না মনের। মনের আবরণ বা মালিন্য তাহার অবিশুদ্ধতা নানারূপ কামনাদি রিপু দ্বারা হয়—যাহা ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা গৃহীত ও প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রের মন সেই কলুষরূপ আবরণ হইতে ত্রাণকারী বৃত্র দ্বারা যখন প্রভাবান্বিত ছিল তখন তিনি আত্মজ্ঞানী ছিলেন। অর্থাৎ মন যখন আত্মস্থ হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াই হয়। সেই বৃত্ররূপ শক্তিকে যখন তিনি বধ করিলেন, বা ভোগাসক্ত হইয়া তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হারাইলেন। এখানে বৃত্র অর্থে আত্মা। আত্মজ্ঞানেই মন ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে নিজকে স্বাধীন রাখিতে পারে। তাঁহার মন তখন পুনরায় মলিন হইল এবং তিনি ক্ষুধাগ্রস্তও হইলেন। অর্থাৎ মন তখন আত্মজ্ঞান হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইল ও কলুষিত হইল। স্বর্গে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই এইরূপ পুরাণে বর্ণিত আছে। তখন ইন্দ্র এই

অগস্ত্যাশ্রমে আসিয়া তপস্যা করিয়া, তাঁহার মনের মালিন্য ও ক্ষুধাকে এখানে পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় বিশুদ্ধ মনে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ব্রহ্মের কৃপা অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। আর ব্রহ্মবধ তাহার বিপরীত ব্রহ্মজ্ঞানচ্যুতি। এখানে বাল্মীকি ইন্দ্র শব্দ ইন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। "ইন্দ্রস্য আত্মনোলিঙ্গমনুমাপকম্। ইন্দ্র+নিপাতনাৎঘচ = ইন্দ্রিয়ং। ঈশ্বরেন সৃষ্টং। জ্ঞানকর্ম্মসাধনম্। আত্মার প্রকাশ ইন্দ্রিয় সাহায্যেই হয় এবং ইন্দ্রিয় মন দ্বারা চালিত হয়। মনও একাদশ বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে বৃত্তি নিচয় মন গ্রহণ করে, তাহাই মনের আবরণ; সেই আবরণেই যেন আচ্ছাদিত হইয়া মন আত্মার সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়। আবার তাহার আত্মজ্ঞান হইলেই, সেই আবরণ অপসৃত হয়। তাই আত্মাই মনকে তাহার আবরণ হইতে ত্রাণকারী অর্থাৎ বৃত্র। বৃত্রশব্দ বেদে মেঘ ও অন্ধকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যদি উপরোক্ত অর্থ করি তাহা হইলে তাহা কি অসঙ্গত হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মারীচ ও সুবাহু বধ

তাড়কার বন হইতে নির্গত হইয়া বহুপথ অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা আর একটী মনোরম আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলে, রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা অদূরে যে মনোহর ও শুভদর্শন প্রদেশ দেখিতে পাইতেছি উহা কি কাহারও আশ্রম?" তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাম! মহাত্মা বামনের উৎপত্তির পূর্ব্বে এই আশ্রম 'সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ এখানে মহাতপস্বী বিষ্ণু তপঃসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহাতপস্বী বিষ্ণু অনেক বৎসর তপস্যা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন! তৎকালে অসুরেন্দ্র বিরোচন-পুত্র বলি, যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া, স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করতঃ, দেবরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তখন দেবতারা এইস্থানে তপস্যানিরত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলেন 'আপনি মায়াদ্বারা বামনরূপী হইয়া বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া, আমাদের হিতসাধন করুন। এই উত্তম সুযোগ, কেননা বলি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া, চারিদিক হইতে আগত ব্রাহ্মণ ও যাচকদিগকে, যে যাহা চাহিতেছে তাহাই দিতেছে।' সেই সময় ভগবান কশ্যপও বিষ্ণুকে, পুত্ররূপে তদীয় পত্নী অদিতির গর্ভে, জন্ম লইবার জন্য প্রার্থনা করেন, এবং বলেন আপনার (বিষ্ণুর) তপসিদ্ধিহেতু, এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত

হইবে। অনন্তর বিষ্ণু বামনরূপে অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বলির নিকট উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিলেন। বলি তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলে, তিনি ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া, বলিকে বন্ধন করতঃ মহেন্দ্রকে স্বর্গে পুনঃস্থাপিত করিলেন।

'ত্রীন্‌পাদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্যচ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকান্ লোকার্থী সর্ব্বলোকহিতেরতঃ।'

পূর্ব্বে বিষ্ণু এই আশ্রমে বসতি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ এই আশ্রম উপভোগ করিতেছি। এই আশ্রমেই সেই যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আসিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমাকে সেই দুষ্টাচারীদিগকে সংহার করিতে হইবে। এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তদ্রূপ।"

তাঁহারা সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলে আশ্রমস্থ মুনিগণ, বিশ্বামিত্রের পূজা ও রামলক্ষ্মণকে যথাযথ অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র রামের অনুরোধে সেই দিনই নিয়তান্তঃকরণে যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে রাম বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "ভগবান্! কোন সময়ে সেই দুই রাক্ষসের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে নির্দ্দেশ করুন, যেন আমাদের অসাবধানতাবশতঃ সেই সময় অতিক্রান্ত না হয়।" তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া এইরূপ বলিলে, আশ্রমস্থ মুনিগণ বলিলেন, "এই মুনি বিশ্বামিত্র যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন, ইনি আজ হইতে ছয়দিন মৌনী হইয়া থাকিবেন, তোমরা এই কয়েক দিবস ইঁহাকে রক্ষা কর।" তখন দুই ভ্রাতা তৎশ্রবণে সন্নদ্ধ হইয়া নিদ্রাপরিহারপূর্ব্বক, ছয়দিনই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন"

"উপাসাঞ্চক্রতু বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ।
ররক্ষতুর্ম্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমম্॥"

ক্রমে পাঁচ দিন গত হইয়া ষষ্ঠ দিবস আগত হইলে, ঋত্বিকেরা যজ্ঞের অগ্নি জ্বালিলেন। এমন সময় সহসা গগনে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসদ্বয়, মায়া বিস্তার করতঃ গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া, তদভিমুখে ধাবমান হইল। পরে তাহারা ও তাহাদের অনুচরগণ তথায় আসিয়া রুধির ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাম সেই বেদীর নিকট সহসা শোণিত-রাশি পতিত হইতে দেখিয়া, তদভিমুখে দ্রুতপদে যাইয়া, আকাশে সেই রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমি এই মাংসাশী দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসদিগকে মানবাস্ত্র দ্বারা কম্পিত করি, যেমন অনিল দ্বারা মেঘ কম্পিত হয়; আমি ইহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না।" তখন রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মানবাস্ত্র মারীচের বক্ষে নিপতিত হইলে, সে তাহার আঘাতে শত যোজন দূরবর্ত্তী সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইল। রাম শীতেষু নামক মানবাস্ত্রে পীড়িত মারীচকে বিঘূর্ণিত অচেতন ও যুদ্ধনিরস্ত দেখিয়া, লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি দেখ ঐ মনুপ্রযুক্ত মানব শীতেষু অস্ত্র মারীচকে বিমোহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে কিন্তু উহার প্রাণ-সংহার করিতেছে না।"

"পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষু মানবং মনুসংহিতম্।"

তৎপরে রাম আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা সুবাহু এবং অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন। পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ নির্ব্বাধা দেখিয়া রামকে কহিলেন, "বীর! তুমি গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলে, এই সিদ্ধাশ্রমের নামও সার্থক করিলে। আমিও কৃতার্থ হইলাম।"

'কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্ত্বয়া॥'

পরে তাঁহারাও দুইজনে কৃতার্থতা লাভে মুদিত হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন।

"অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রামলক্ষ্মণৌ।
উষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥"

এই মারীচ ও সুবাহু বধের তাৎপর্য্য কি এবং এই সিদ্ধাশ্রমেই বা তাহারা বিশেষতঃ অত্যাচার করে কেন? এই সিদ্ধাশ্রমে বিষ্ণু বহু বৎসর তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইজন্যই ইহার নামও সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে এবং এখানেই বিশ্বামিত্র রামের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আবার এইখানেই বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বলিকে ছলনা করিলেন। বিশ্বামিত্র বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশতঃ সেই আশ্রম রক্ষা করিতেন। এই আশ্রমে বিষ্ণুও সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিশ্বামিত্রও সিদ্ধ হইলেন। বিষ্ণুর তপস্যারই বা কি প্রয়োজন? বিষ্ণু সগুণব্রহ্ম। বিশ্বরূপে প্রকাশিত নির্গুণ পরমাত্মার সগুণ রূপই বিষ্ণু। ব্যাপ্নোতি বিশ্বমিতি বিষ্ণু—বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণু; বিশতি—অনুপ্রবিশতি—বিশ্বস্থ প্রত্যেক পদার্থে তিনি অনুপ্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। এইজন্য তিনি বিষ্ণুব্রহ্ম—ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ সগুণরূপ। পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার অপ্রত্যক্ষ শূন্যাকার। তাই সগুণব্রহ্মবিষ্ণু, যেরূপ তপস্যা দ্বারা তাঁহার নির্গুণত্বে যান্, সেইরূপ সগুণব্রহ্মবিষ্ণু-ভক্ত বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মের সগুণ হিরণ্যগর্ভরূপ পর্য্যন্ত দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এখন তিনি রামকেই বা পরব্রহ্মপদকেই তাঁহার প্রাপ্য বা সাধ্য লক্ষ্য স্থির করিয়া, সেই সগুণ বিষ্ণুরূপের উপলব্ধি হইতে, নির্গুণ রাম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভূত বা রাম বা আত্মারাম হইলেন। রাম বা আরামের অবস্থাও শূন্যাকার।

"যৎ শূন্যবাদীনাং শূন্য তৎব্রবহ্ম ব্রহ্মবাদিনাম্॥"

এক কথায় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাধনার ফল প্রাপ্ত হইলেন। তাই রামকে বলিলেন "কৃতার্থোঽস্মি ত্বয়া" অর্থাৎ রাম! তোমার রাম নামের পদ আমার প্রাপ্য ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া, আমি এই ছয়দিন ধ্যানরত থাকিয়া, সেই পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া, কৃতকৃতার্থ হইলাম। সহজ ভাষায় যাহাকে বলে পরমপদলাভ। বিষ্ণুর ও বিশ্বামিত্রের সিদ্ধিলাভ কতকটা বুঝা গেল।

কিন্তু এইস্থানে পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত বিষ্ণুর বামন অবতার পরিগ্রহ ও বলিকে ছলনা করিবার কথা উল্লিখিত হইল কেন? আমরা প্রথমে বলি ও বামনের উপাখ্যানের মূল সূত্র, পুরাণ কর্ত্তারা কোথা হইতে কল্পনা করিলেন, তাহার একটু আভাস দিব। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুকে আদিত্য বা সূর্য্য সম্বোধনে, কতকগুলি তাঁহার স্তোত্রের সূক্ত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সূক্তটী আমরা উল্লেখ করিতেছি। অনুমান করা যায় এই বামনের উপাখ্যান এই সূক্ত হইতেই কল্পনা বলে উদ্ভূত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ১।১২২।১৬ সূক্তে আছে—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
ত্রেধা নিধদে পদম্॥"...ইত্যাদি

সায়নভাষ্যমতে ইহার বাঙ্গলা অর্থ "বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যাস্ক বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নিরুক্তে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে:—যদিদং কিঞ্চ তদ্‌বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রেধা নিধত্তে পদং—ত্রেধা ভাবায়—পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে, দিবি ইতি শাকপুনিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণনাভঃ। (নিরুক্ত ১২।১১)। এই অংশের উপর দুর্গাচার্য্য

ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিষ্ণুবাদিত্যঃ। নিধদে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। কৃতং তাবৎ। পৃথিব্যাঃ অন্তরীক্ষে দিবি। পার্থিবোঽগ্নি ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমু অক্রিম্বন্ ত্রেধাভাবে একমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উগ্যন্ পাদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যান্দিনে অন্তরীক্ষে। গয়শিরসি অস্তং গিরৌ। ইতি ঔর্ণনাভ মন্যতে।

প্রাচীন ঋষিরা সূর্য্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন। ঔর্ণনাভ বলেন যে সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে গমন, এই তিনটী বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আবার শাকপুনির মতেও পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও দ্যুলোকে তিন পদবিক্ষেপ করিয়া বিচরণ করেন। পৃথিবীতে পার্থিব অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে ও তদুপরি দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে বিষ্ণু বা অদিতির পুত্র আদিত্য বিচরণ করেন। সুতরাং এই তিনভাবে, আদিত্য ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া বিষ্ণু। ঔর্ণনাভের মতে ইহা সূর্য্যেরই তিন অবস্থা। যাস্কের নিরুক্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কোনও উল্লেখ নাই। তিনি অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যকে প্রধান দেব বলিয়াছেন। বেদে একজনই আদিত্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। আর সেই আদিত্য, সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক আদিত্য দ্বাদশ। তাহার মধ্যে বিষ্ণু একজন। অদিতি অর্থে—ন + দিতি = যাহার দিতি বা খণ্ড নাই—এক অখণ্ড সত্তা। অনন্ত আকাশ বা শূন্যকেই অদিতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শূন্য আকাশই অসীম ও অখণ্ড। আর সেই আকাশের একপ্রান্ত হইতে প্রাতে বাল সূর্য্য, মধ্যাহ্নাকাশে যৌবনদীপ্ত সূর্য্য, ও সায়াহ্নে অস্তোন্মুখ বা মরণোন্মুখ সূর্য্য প্রত্যহ

প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সুতরাং মাতা অদিতির ক্রোড়েই তাহার এই সন্তানরূপ সূর্য্যের যেন জন্ম, যৌবন ও মরণ এই তিন অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাই সূর্য্যকে অদিতির সন্তানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই ঋষির সূর্য্যের কল্পিত নাম আদিত্য। এখন পুরাণে সেই আদিত্যকে পৌরাণিক বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া, বিষ্ণু যে পৃথকভাবে বৈদিক ঋষিদেরও উপাস্য ছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য, তাঁহাকে কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করান হইয়াছে। আর সেই আদিত্যেরই "ত্রেধা নিধদে পদং" লইয়া এই বিষ্ণুর বামনরূপে অবতরণ করাইয়া বলি ও বামনের উপাখ্যান ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে রূপকাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার পুরাণকার, তাহার শাখা প্রশাখা দ্বারা তাহাকে একটা প্রকাণ্ড সত্য ঘটনার আকারে বর্ণনা করিয়া, লোকের এত বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, বামন মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে লোকে বিষ্ণু-অবতার জ্ঞানে প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকে। এই বামনাবতার সম্বন্ধে আমি আমার "পৌরাণিক সৃষ্টি রহস্য" নামক প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। বাল্মীকি ঋষির এই পৌরাণিক উপাখ্যান এস্থানে সন্নিবেশ কি নিতান্তই অবান্তর হইয়াছে? আমাদের তাহা বোধ হয় না, তাহার কারণ দর্শাইতে আমরা চেষ্টা করিব।

এস্থানে বাল্মীকির একটা উদ্দেশ্য আছে। বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন :—

"ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ।
বর্ষাণি সুবহুন্যত্র তথা যুগশতানি চ॥
তপশ্চরণযোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ।
এষ পূর্ব্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ॥

সিদ্ধাশ্রম ইতিখ্যাত সিদ্ধোহ্যত্র মহাতপাঃ।… …
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ।”

অর্থাৎ সর্ব্বদেব পূজিত বিষ্ণু, সুবহু বৎসর এবং যুগশত পরিমাণ কাল, এখানে তপস্যা করিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহা মহাত্মা বামনের পূর্ব্বাশ্রম। যেহেতু মহাতপা বিষ্ণু এখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইহার সিদ্ধাশ্রম নাম হইয়াছে। এখান হইতেই তিনি তপসিদ্ধ হইয়া কশ্যপের প্রার্থনানুসারে, তাঁহার ঔরসে, অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বামনাবতার হইলেন। তারপর বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া, তিনপদে ত্রিলোক অধিকার করিলেন। এখানে বিষ্ণুশব্দে পরব্রহ্মই বুঝাইতেছে। তিনিই তপস্যা করিয়া তাঁহা হইতে সৃষ্টি উদ্ভব করিয়াছিলেন। “স অতপ্যত” “তপস্তেপে” ইত্যাদি উপনিষদে আছে। আবার ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে আছে “ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।, এই সূক্তে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের তপস্যা হইতেই সৃষ্টির বিকাশ সুতরাং বাল্মীকির এই বিষ্ণু, পরব্রহ্মই। শ্লোকেও আছে

“তদ্‌বিষ্ণোর্পরম্‌পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।”

জ্ঞানিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ বা অবস্থা সর্ব্বদা দর্শন করে—তাহাতেই স্থিত হইয়া। ঋগ্‌বেদের উক্ত সূক্ত অনুসারে, সেই এক সত্তার তপস্যা হইতে, প্রথমে তাঁহার ঋতং বা সত্য সঙ্কল্প হইল; তারপর সত্যং বা পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা হইল, (যাজ্ঞবল্ক্য বলেন “সত্যানি পঞ্চ মহাভূতানি”), তারপর তাহা হইতে রাত্র বা তম বা বাষ্পরূপে জলের প্রথম অবস্থা হইল, পরে তাহাই ঘনীভূত হইয়া তরল জল হইল, আর সেই সলিল হইতেই দুধের শরের ন্যায় পৃথিবী হইল।

তারপর জলে নারায়ণ, মীনরূপ প্রথম জীবরূপ অবতার হইলেন। তারপর স্থল হইলে, প্রথমতঃ সেখানে ওষধিরূপে বিকশিত হইলেন। তারপর সেই স্থলে স্বেদজ, অণ্ডজ হইতে ক্রমে জরায়ুজ প্রাণীরূপে বিকশিত হইয়া, শেষে চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ মনুষ্যরূপে এই বামন অবতারে প্রকাশিত হইলেন। এই বামনরূপ মনুষ্যাকারে বিবর্ত্তন হইতে শত যুগ লাগিয়াছিল—কত লক্ষ বা কোটি বৎসর লাগিয়াছিল। তাই শাস্ত্রে বলে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্য জন্ম হয়। ইহাই বিষ্ণুর তপস্যা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ। তিনি অদিতির গর্ভে জন্ম লইলেন কেন? অদিতি তো অখণ্ড শূন্য স্থান বলিয়া বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। গর্ভে জন্ম অর্থে জরায়ুতে জন্ম। এই জরায়ুও উদরের শূন্য স্থানেই স্থিত। নতুবা ইহা ক্ষুদ্রাকার হইতে কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে? শূন্য স্থান পাইলেই সমস্ত পদার্থ-বর্দ্ধিত হইতে পারে। শূন্য স্থান পাইয়াই বৃক্ষ ঊর্দ্ধে বর্দ্ধিত হয়। আকাশ রূপ শূন্য বা আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। আকাশকেই অদিতি বলা হয়। এই পৃথিবীর দশ দিকেই বা চারিদিকেই আকাশ। কোন পদার্থের গর্ভ বলিলে তাহার অন্তরস্থ শূন্য স্থানকে বুঝায়। যেমন কুম্ভের গর্ভ অর্থাৎ তাহার অন্তরস্থ শূন্য স্থান। তেমনি পৃথিবীও অদিতির অন্তরস্থ শূন্যস্থানেই বিদ্যমান। আর এই পৃথিবীরূপ জরায়ু হইতেই মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত জরায়ুজ প্রাণীর জন্ম হইয়াছে। এই পৃথিবীস্থ আশ্রম বা আশ্রয় স্থানেই বিষ্ণু, বামন বা মনুষ্যাকারে প্রথম বিবর্ত্তিত বা অবতরিত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সৃষ্টিকরণেচ্ছারূপ তপস্যার সিদ্ধি লাভ। তপস্যা একটী সঙ্কল্প লইয়াই করা হয়। আর সেই সঙ্কল্পের কার্য্যে পরিণতিই সিদ্ধি।

আবার জরায়ুতে জীব কিরূপে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ আকৃতি বা রূপ

প্রাপ্ত হয়, তাহা দেখা যাউক। প্রথম পুরুষের রেত বা বীজ হইতে একটী কোষ মাতৃ জঠরে প্রবেশ করে। সেই জঠরে ঋতুমতী মাতারও একটী কোষ প্রথম হইতেই অপেক্ষা করিতেছে। এখন এই পিতৃনিসৃত কোষ, জরায়ুর সূক্ষ্ম ছিদ্র, যাহা ভিতর হইতে রজস্রাবে কিঞ্চিৎ প্রসারিত হইয়াছে তাহাই, অনুসরণ করিয়া, জঠরাভ্যন্তরে প্রবেশ করত, সেই মাতৃকোষের সহিত সর্ব্বপ্রকারে একরূপে মিশ্রিত হইয়া, একটী কোষে পরিণত হয়। এই গোলাকার পিতৃকোষ সেই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে একটী তীরের ফলার ন্যায় আকার ধারণ করে। ইহা সেই ছিদ্রাভ্যন্তরে সর্পগতিতে অগ্রসর হয়। তখন সেই ফলাই যেন সেই মাতৃকোষকে বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে এই মিশ্রিত কোষ হইতে অসংখ্য কোষের উদ্ভব হইয়া তাহারা একটা অণ্ডাকার ধারণ করে। তারপর তাহাদের মীনাকার হয়। তৎপরে তাহাতে, অস্থির সমাবেশ হওয়াতে তাহা কুর্ম্মাকার ধারণ করিলে, চারটী কোমল পদ উদ্ভূত হয়। ক্রমে সেই কোমল পদে অস্থির সমাবেশ হইলে তাহার মেরুদণ্ড গঠিত হয় এবং সেই কুর্ম্মাকার জীবই বরাহাকারে পরিণত হয়। প্রথমে কুর্ম্মের পৃষ্ঠে তাহার মেরুদণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যও চতুষ্পদরূপেই ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন চারি পায়ের সাহায্যেই প্রথমে চলাচল করে। তবে প্রভেদ এই যে, তাহার হস্তদ্বয় সম্মুখ দিকে বক্র হয়। আর পদদ্বয় পশ্চাৎদিকে বক্র হওয়াতে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি হয়; নৃসিংহ অবতারে এই হস্ত ও পদের, এইরূপ পশুর বিপরীত ভাবই দেখান হয়। পশুর হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে ও পদদ্বয় সম্মুখের দিকে বক্র হওয়াতে, তাহাদের সোজাভাবে দাঁড়াইবার শক্তি নাই। ইহাই বিষ্ণুর তপস্যার ফলে ক্রম বিবর্ত্তনে বা অবতরণে বামন রূপ মনুষ্যে পরিণতি বা সিদ্ধি।

অবতরণ অর্থাৎ নীচে নামা। উত্তরণ অর্থে উর্দ্ধগমন। যেমন বৃক্ষে উত্তরণ অর্থে উঠা। অবতরণ তাহা হইতে নামা। কোনও পদার্থ উপর হইতে বা শূন্য হইতে অবতরণ করে। বৃষ্টির জলবিন্দু, শূন্য হইতে ক্রমে তাহার সূক্ষ্মাকার হইতে স্থূলাকারে নিম্নে অবতরণ সময়ে, বৃহদাকার ধারণ করে। তেমনি শূন্যরূপ ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপে পরিণত হইলেই, তাঁহার অবতরণ হয় বা তিনি অবতার হন। তাই তৈত্তেরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে।

"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যো ঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণপক্ষঃ। অয়ং উত্তরপক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" সেই এই ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে শব্দ স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু; বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ সম্পন্ন অগ্নি বা তেজ; তেজ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল; জল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ, লতা গুল্মাদি) উৎপন্ন হইল। ওষধি হইতে অন্ন অর্থাৎ শস্যাদি ফলাদি—আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত, সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্তমস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষের শির, দুই বাহু বা পক্ষ, দেহ মধ্যভাগ আত্মা এবং নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সেই মীন হইতে আরম্ভ করিয়া যে শির, পক্ষ ও পুচ্ছ চতুষ্পদে বিদ্যমান ছিল, তাহাই মনুষ্যেও বিবর্ত্তিত হইয়া, তাহার পুচ্ছ এই দেহের নিম্নভাগে পরিণত হইয়াছে। ইহাই আত্মার ক্রম বিবর্ত্তনের স্বরূপ। ইহাই বিষ্ণুর অবতরণ।

তপস্যা দ্বারা দুই রূপ ফলই পাওয়া যায়। উত্তরণও হয় অবতরণও হয়। ইহাই বিষ্ণুর তপস্যাতে দেখান হইল। যেমন বৃক্ষে উঠাও যায়, নামাও যায়। বৃক্ষে উঠা যেমন কষ্টসাধ্য, নামাটা তত কষ্টসাধ্য না হইলেও সাবধানেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, নতুবা হঠাৎ পড়িয়া যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি বিষ্ণু বা সগুণ ব্রহ্ম তপস্যাদ্বারা উত্তরণ বা উর্দ্ধে উঠিয়া নির্গুণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন আবার এই বামন অবতারে তাহার বিপরীত দিক দেখাইলাম। তাহার কারণ বিশ্বামিত্র ইহার কোন দিক্‌টা সঙ্কল্প করিয়া, এই সিদ্ধাশ্রমে তপস্যা করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে। তিনি এই অবতরণের বিপরীত দিকটা অর্থাৎ উত্তরণ বা উর্দ্ধে গমন সঙ্কল্প করিয়াই, সিদ্ধি লাভার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি সেই বিষ্ণুর ন্যায় ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্যই তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনিও বামন বা মনুষ্য বংশীয় হিসাবে নারায়ণের বা ব্রহ্মের অবতার বা অবতারিত অবস্থা। নারায়ণের বিষ্ণুত্বপ্রাপ্তিতে অবতরণ, রামায়ণে অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তাই এই মনুষ্য-দেহ ধারণ অবস্থাতেই, ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য, তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আত্মা যেমন ক্রম বিবর্ত্তনে আকাশ হইতে মনুষ্যরূপে অবতরণ করিয়া তাঁহার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বিশ্বামিত্রও সেই মনুষ্যরূপ জীব হইতে উদ্বর্ত্তন করিয়া, ক্রমে তাহার বিপরীত দিক্‌ গামী হইয়া, সেই আকাশ বা আত্মারূপে নিজকে উপলব্ধি করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন—আর সেই অবস্থাই আত্মার রাম অবস্থা। কেননা তখন আত্মার সমস্ত বিবর্ত্তন রূপ কার্য্য শেষ হইয়া নিদ্রাবস্থা বা নিষ্কর্ম্ম অবস্থা। সমস্ত দিন কাজের পর নিষ্কর্ম্ম হইলেই সুষুপ্তি হয়।

সেই সুষুপ্তিতেই লোকে আরামপ্রাপ্ত হয়। তাই সুষুপ্তির আরামের তুলনাতেই এই অবস্থার নাম রাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আত্মারাম অবস্থা অর্থাৎ আত্মার বিরাম অবস্থা। পরমাত্মার গতি বা কর্ম্মে ব্যাপৃত অবস্থাকেই আত্মা বলে। অততি গমনে, অত ধাতু গত্যর্থে। অত ধাতু হইতে আত্মা সাধিত। পরমাত্মার গতির অবস্থাই আত্মা। তাই বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে তিনি মৃত্যুরূপে নিষ্কর্ম্ম অবস্থায় ছিলেন। তার পর মন করিয়া আত্মবান্ হইলেন। মন দ্বারাই আত্মার গতি হয়। অর্থাৎ তিনি গতিবান্ হইলেন। বাল্মীকি ঋষি, বিশ্বামিত্র যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই তাঁহার মুখেই বর্ণন করিলেন। এই পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া ত্রিলোক অধিকার করিবার উল্লেখ করা হইল কেন? ইহারও তাৎপর্য্য আছে। বামনরূপ মনুষ্য অবতারের দুই পদই হওয়া উচিত। যখন কশ্যপও মনুষ্য তখন তাঁহার ঔরসে যে জন্মিবে সেও মনুষ্য হইবে। ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি আদি সপ্তঋষি। মরীচি শব্দ হইতে মরীচিকা হইয়াছে। মরীচি শব্দের অর্থ কিরণ। সেই কিরণে মরুভূমিতে জলভ্রম হইলেই মরীচিকা হয়। মরীচিকা জলভ্রম মাত্র, ইহাতে জলের সত্তা নাই কিন্তু যেন জলই। ইহা মনের কার্য্য। তেমনি এই মরীচি ঋষিরও সত্তা নাই, উহা ব্রহ্মার কিরণমাত্র। অর্থাৎ মনুষ্যরূপ কশ্যপ জন্মিবার পূর্ব্ব মনোভাব। ব্রহ্মাও, ব্রহ্মের বিবর্ত্তনজাত হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ প্রথম শরীরধারী সৃষ্টিবিকাশ। তাই বৈদিক ঋষি বলিলেন "হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্তাগ্রে। ভূতস্যজাত পতিরেক আসীৎ॥" হিরণ্যগর্ভই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত ভূতের পতিরূপে প্রথমে জাত। এই ব্রহ্মা হইতেই তাঁহার পুনর্বিবর্ত্তনে মরীচি আদি ঋষি তাঁহার মানসপুত্র। মনই মরীচিকা

দেখে, তাই ব্রহ্মার মনে প্রথমতঃ স্থষ্টিক্রম এই মরীচিকার মতই উদয় হইয়াছিল। প্রজা বা পুত্র ব্রহ্মার স্থষ্টি—তাই তিনি প্রজাপতি। তিনি, যে প্রজার স্বরূপ মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই পূর্ব্বভাব তাঁহার মনে মরীচিকার ন্যায় উদয় হইয়াছিল। তাই মরীচি তাঁহার মনজাত মনুষ্যের স্বরূপের পূর্ব্বভাব—স্থতরাং মানসপুত্র। এই পূর্ব্বভাবই যখন কার্য্যে পরিণত হইল তখন তাহা কশ্যপ হইল। কশ্যপ শব্দের অর্থ কি? কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি নিরুক্ত্যা পশ্যতি ইতি পশ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতয়া সকলং জগদ্বিজানাতি স পশ্যঃ। পশ্য এব নিভ্র্মতয়াতি সূক্ষ্মমপি বস্তু যথার্থং জানাত্যেবাতঃ পশ্যক ইতি। আদ্যন্তাক্ষর-বিপর্য্যয়াসিদ্ধেঃ সিংহঃ কৃতেস্তর্কু রিত্যাদিবৎ কশ্যপ ইতি হয়বরট্ ইত্যেতস্যোপরি মহাভাষ্যপ্রমাণেন পদং সিদ্ধতি॥ ইতি। বা কশ্যং বিজ্ঞানঘনং পাতি রক্ষতি স্বাত্মনীতি। পরব্রহ্ম। তথা চ তাপনি শ্রুতিঃ—"তদেব ব্রহ্ম বাত্ম্যাত্মা এতস্য পাতা হর্ত্তা প্রজানাং গোপ্তা বাবহ কশ্যপো হ যোহয়মজ্ঞানভোক্তা।" কশ্যপ অর্থে —আত্মারই নাম কশ্যপ, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের পশ্যক বা জ্ঞাতা। সেই মরীচিকা রূপ জল যেন প্রকৃত জলই হইল—কশ্যপরূপে—অর্থাৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তনে মনুষ্যের বীজরূপে। এই বীজ স্থাপনের একটী স্থান চাইতো। কেননা বীজ কোথায়ও নিহিত না হইলে কোন কিছুর উদ্ভব হয় না। তখন অদিতিতে বা অখণ্ড আকাশের অন্তরে পৃথিবী স্থষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীও অদিতির একটী অংশ, কেননা অদিতিরূপ আকাশ হইতেই ইহা উদ্ভূত হইয়াছে। তাই সায়ন তাঁহার ভাষ্যে একস্থানে অদিতির অর্থ পৃথিবী করিয়াছেন—ঋগ্বেদের ১০।৬৪।৫ "দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।" সায়নভাষ্যে "—হে অদিতে! পৃথিবি! দক্ষস্য সূর্য্যস্য

জন্মনি ব্রতে যজ্ঞকর্ম্মনি রাজানৌ মিত্রবরুণৌ বিবাসসি। যথা ত্বং বেদীভূতা সতী তৌ পরিচর্য্যয়।" কশ্যপরূপ ব্রহ্মার মনুষ্যবীজ, এই অদিতির অন্তর বা গর্ভরূপ পৃথিবীতে নিহিত হইয়া, বামনরূপ প্রথম মনুষ্য উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত প্রজা বা তাঁহার সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মার কোনও স্ত্রীর উল্লেখ কোনও শাস্ত্রে বা পুরাণে নাই—যাহাতে তিনি বীজ নিহিত করিয়া এই নানাবিধ জীবরূপ সন্তান উদ্ভব করিয়াছিলেন। তাই উপনিষদে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজ শরীর হইতেই শতরূপা এক নারীর সৃষ্টি করিলেন। আর সেই শতরূপা নারীর নানারূপের সহিত তিনি ক্রমে ক্রমে মৈথুন করিয়া এই জগতের প্রাণীজগৎ নানারূপে সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীকেই অন্ন বলা হয়। সেই অন্নেই রেত নিহিত আছে। সেই রেতরূপ বীজ হইতেই সমস্ত পার্থিব পদার্থ উদ্ভুত। মনুষ্যও সেই পৃথিবীর উপকরণেই জাত, তাই ধরিত্রী বা পৃথিবী মাতা। সুতরাং কশ্যপরূপ, ব্রহ্মের মনুষ্যের বীজ, এই অদিতির জরায়ুরূপ পৃথিবীমাতার গর্ভেই নিহিত হইয়া বামনরূপ প্রথম মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছিল।

বামনের তৃতীয় পদ তাহার নাভি হইতে নিষ্কাশিত হইল। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে যে পুরুষের উল্লেখ আছে "ত্রিপাদূর্দ্ধং উদৈৎপুরুষঃ।" সেই বিরাট পুরুষের ত্রিপাদ। এই ত্রিপাদ দ্বারা তিনি ভূ ভুর্ব ও স্ব অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডরূপী পুরুষ ত্রিপাদসমন্বিত। কিন্তু মনুষ্যাকৃতি বামন দুই পাদ বিশিষ্টই ছিলেন। বলির নিকট দুই পদ ভূমি চাহিয়া প্রাপ্ত হইয়া আর একপদ চাহিলেন। তখন তাঁহার নাভি হইতে তৃতীয় পদ বহির্গত হইল। এবং তাহা তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বীয় ক্ষমতাতেই নির্গত করিলেন।

আত্মা, মনুষ্যদেহে তিন পদে বা অবস্থায় থাকেন; জাগ্রত পদে, স্বপ্ন পদে ও সুষুপ্তি পদে। জাগ্রত অবস্থায় তিনি পৃথিবী বা 'ভূ'তে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিচরণ ও সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে মনের সাহায্যে শূন্যে বা 'ভুবে' বিচরণ করেন ও তাঁহার সেই কার্য্য মন কর্ত্তৃক মরীচিকার ন্যায় সৃষ্ট হইয়া শূন্যেই আবির্ভূত হইয়া শূন্যেই লয় হয়। তাহার তৃতীয় অবস্থা সুষুপ্তি, এই সময়ে মন তাহার সমস্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া, শূন্যাকারে পরিণত হইয়া শূন্যরূপ আত্মাতে মিলিত হয়। অর্থাৎ মনের আরও উর্দ্ধ অবস্থায় গমন হয়। স্বপ্নাবস্থার কার্য্যও আমাদের অনেক স্মরণ থাকে, কেননা স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট অনেক বিষয় আমরা বলিতে পারি। কিন্তু এই স্বপ্নাবস্থা হইতে কখন যে আমরা সুষুপ্তি অবস্থাতে উপনীত হই, তাহা জানিতে পারি না। সুষুপ্তিতে আমরা কি অবস্থাতে থাকি তাহা আমাদের জ্ঞাত নহে। সাধারণতঃ আমরা জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার বিষয় জানিতে পারি বলিয়াই আমরা আমাদিগকে দ্বিপদ অবস্থাপন্ন মনে করি, কিন্তু আমাদের আর একটা তৃতীয় পদ বা অবস্থা আছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই থাকে। এখন দৃশ্যমান শূন্যকে অন্তরীক্ষ বা 'ভুব' কহে। তাহার উপরেও একটা আচ্ছাদন মত পরিদৃশ্যমান স্থানভ্রম হয়, তাহাই স্ব বা স্বর্গ। কিন্তু তাহাও প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড অসীম শূন্যই। সুষুপ্তি অবস্থাতে সমস্ত বাহ্য পদার্থের জ্ঞান লুপ্ত বা শূন্য হওয়াতে উহা একরূপ শূন্যাবস্থাই। এই অবস্থাতে মনুষ্য তাহার প্রাকৃতিক কারণেই উপনীত হয় বা এই পদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই তৃতীয় অজ্ঞাত পদ। এখন ইচ্ছা বা জ্ঞাতসারে বা জ্ঞানসহকারে এই শূন্যাবস্থায় যাইতে হইলে, ইহা সাধনা দ্বারাই হয়—যেমন যোগির

সমাধি অবস্থা। ইহাই তৃতীয় জ্ঞাতপদ। এই অবস্থাপ্রাপ্তি নিজ ইচ্ছা বা চেষ্টা বা সাধনা দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। প্রথমে সাধনা দ্বারা প্রত্যগাত্মা বা নিজদেহস্থিত আত্মার উপলব্ধি করিতে হয়। পরে সেই আত্মাই নিজের সমস্ত গতি শূন্য হইয়া স্থির হইলে, এই দেহ উপাধিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বগত হইলে, শূন্য আকাশ বা 'স্ব'র ন্যায়ই হয়—যাহাকে ভূমা বলে। আর দেহে এই আত্মা নাভিপ্রদেশেই অবস্থিত হৃদাকাশে থাকে। এই হৃদয়ের স্থানও নাভিরই সন্নিকট। সুতরাং যেন সেই নাভিপথেই দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভূমা হয় বা শূন্যাকারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়—যেমন বদ্ধ ভাণ্ডের বাষ্প বহির্গত হইয়া শূন্যে বিস্তীর্ণ হইয়া বিলীন হয়। তাই বামনরূপ মনুষ্য তাহার ইচ্ছা ও শক্তিতে নাভি হইতে তৃতীয় পদ নিষ্কাশিত করিয়া বলির নিকট হইতে ত্রিলোক অধিকার করিয়াছিল। অর্থাৎ যে বলি নিজ শক্তিতে ত্রিলোক-জয় করিয়া একাধিপত্য করিতেছিল, তাহাকেও বা তাহার ত্রিলোক বিজয়ী শক্তিকে এই মানব বামন নিজ শক্তিতে দমন করিয়া নিজের অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া যেন তাহাকে পদতলেই নিষ্পেষিত করিয়াছিলেন। মনুষ্যও এই শক্তি লাভ করিতে পারে তাহার সাধন দ্বারা, যখন সে ভূমা বা সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মত্ব লাভ করে। তাই বিশ্বামিত্রও যে, বামন হইয়াও দুই পদ সত্ত্বেও, নিজ সাধনা বলে, তৃতীয় পদ বা আত্মজ্ঞানরূপ পদ লাভ করিতে এই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছেন, তাহাই প্রকারান্তরে বামন বলির উপাখ্যানে রামকে জানাইলেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র ঋষির আত্মজ্ঞান লাভ সিদ্ধির পথে, এই মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসদ্বয়, কিরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিত, তাহাই

আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব। মারীচ শব্দ মার শব্দ হইতে উৎপন্ন। মার শব্দ মৃ ধাতু হইতে সম্পন্ন। মৃ ম্রিয়তে অনেন ইতি মার। যাহা দ্বারা মৃত্যু সঙ্ঘটন হয় বা যাহা মৃত্যুবৎ অবস্থায় পরিণত করে, তাহাই মার। মার অর্থে তীব্র কামনা বা বাসনা। তীব্র কামনা বা বাসনাতেই লোককে মৃতপ্রায় করে। দস্যু তীব্র কামনার বশীভূত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা প্রত্যাঘাত পাইয়া মৃতকল্প হয়। অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বুদ্ধদেবও এই তীব্র কামনাকেই মার নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাই মাররূপী বা কামরূপী তাড়কার মহাবীর্য্যশালী পুত্র মারীচ। তাহার বৃত্তের ন্যায় বাহু ও বৃত্তাকার বা গোলাকার মস্তক। তাহার এই বৃত্তাকার বাহুতে সমস্ত কাম বা বাসনা একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাই গোলার ন্যায় নিক্ষেপ করে। যেন সমস্ত কামনা ও বাসনারাশি স্তূপাকার হইয়া সাধকের মনকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে। যোগে এই চিত্তবিক্ষেপ একটী বিশেষ বিঘ্ন। সুতরাং যখনই বিশ্বামিত্রের ন্যায় লোকে সাধনা করিতে চিত্তসংযমের অভ্যাস করিতে চেষ্টিত হয়, তখনই এই কামনারাশিরূপ বৃত্তিসমষ্টি মনকে আকর্ষণ করিয়া তাহার বিক্ষেপ সাধন করে। এই মারীচ ও সুবাহু ষষ্ঠ দিনে আবির্ভূত হইল কেন? বিশ্বামিত্র পাঁচদিনে, ধ্যান নিরত হইয়া ষষ্ঠদিনে এই উৎপাত হইতে বিঘ্নপ্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিতে যখন সমর্থ হইলেন তখন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। এই মনকে বশে আনাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। মন সর্ব্বদাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়রূপদ্বার দ্বারা বহির্ম্মুখে ধাবমান হইতে চেষ্টা করে। সুতরাং এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়রূপদ্বার রুদ্ধ করিলে মন তখন রুদ্ধগৃহে বদ্ধ-বায়ু বা রুদ্ধ-পাত্রে বদ্ধ-বাষ্পের ন্যায় প্রভূত

শক্তিশালী হয়। মারীচ প্রথমে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মেঘের ন্যায় ধাবমান হইয়া তৎপ্রবে রুধির বর্ষণ করিল। ইহার তাৎপর্য্য কি? বিশ্বামিত্র ধ্যানে বসিয়া মনের যজ্ঞ বা মনমেধ যজ্ঞ করিতেছেন—অর্থাৎ যজ্ঞে যেমন ঘৃতাদি আহুতি দান করে, তেমনই অন্তরস্থ অগ্নিতে মনকে আহুতি দিয়া তাহাকে ভস্ম করিয়াই যেন, তাহার লয় সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। মন তখন ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হওয়াতে, তৎসাহায্যে বাহিরে বায়ুর ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারিয়া, ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া তাহার আরও সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। মন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। আর এই মেঘের রংও কাল বা তমাকার এবং শোণিতের রং লোহিত বর্ণ। এই দুই বর্ণের সূক্ষ্মগুণও তম ও লোহিত। সুতরাং এই সূক্ষ্ম গুণদ্বয় পর পর সূক্ষ্মমনের সহিত যেন যুদ্ধ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিবার বা নিজ নিজ বর্ণে রঞ্জিত করিবার চেষ্টা করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে তেজ, জল ও অন্ন (পৃথ্বী) এই সূক্ষ্ম তিন মূল তত্ত্ব মিশ্রণে অর্থাৎ ত্রিবিৎকরণে বিবিধ সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। আবার শ্বেতাশ্বর উপনিষদে (৪।৫) এইরূপ আছে, "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।" অর্থাৎ লাল বা তেজরূপী, সাদা বা জলরূপী এবং কালো বা পৃথ্বীরূপী, এই তিন রং বিশিষ্ট, তিন তত্ত্বের এক যে প্রজা (সৃষ্টি) উৎপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে, পিতা আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন "বৎস! জগতের আরম্ভে একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যাহা অসৎ (অর্থাৎ নাই) তাহা হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরম্ভে সৎই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। তারপর উহা (সৎ) অনেক অর্থাৎ বহু বস্তু হইবে মনে করাতে, তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম, তেজ

(অগ্নি) জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তারপর এই তিন তত্ত্বের মধ্যেই জীবরূপ পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, তাহাদের 'ত্রিবিৎকুরণ দ্বারা জগতের অনেক নাম রূপাত্মক বস্তু নির্ম্মিত হইল। স্থূল অগ্নি, সূর্য্য কি বিদ্যুৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাম্র (লোহিত) রং আছে, তাহা সূক্ষ্ম তেজরূপী মূলতত্ত্বের পরিণাম, যে সাদা (শুক্ল) রং আছে, তাহা সূক্ষ্ম জলতত্ত্বের পরিণাম, এবং যে কাল (কৃষ্ণ) রং আছে, তাহা সূক্ষ্ম পৃথ্বীতত্ত্বের পরিণাম। সেইরূপ মনুষ্য যে ভক্ষণ করে তাহাতে এই তিন মূল সূক্ষ্মতত্ত্বই থাকে। যখন ইন্দ্রিয় সকল খোলা থাকে ও সক্রিয় থাকে, তখন মন তাহাদেরই সাহায্যে, ঐ সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিণামে যে স্থূল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সহিতই লিপ্ত হইয়া কার্য্য করে। যখনই ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, তখন সেই সেই বস্তুর সূক্ষ্মতত্ত্বে সূক্ষ্মাকার মনকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। তাই কালরূপী পৃথিবীর তত্ত্ব কালমেঘরূপে, তেজরূপ অগ্নির তত্ত্ব লোহিত রং রূপে এবং জলরূপ তত্ত্বের সূক্ষ্ম রং সাদা বর্ণে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার একাকীত্ব অবস্থা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। মন সম্পুর্ণরূপে এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া একাকীত্ব লাভ করিতে পারিলে, তাহার উদ্ভব স্থান আত্মাতে লীন হয়, আর তখনই আত্মস্বরূপ লব্ধ হয়। ইহাকেই পাতঞ্জলীতে স্বরূপে স্থিতি বা স্বরূপ-সিদ্ধি বলা হইয়াছে। এই স্বরূপসিদ্ধিই আত্মারাম অবস্থা, আর 'রাম'ই সেই অবস্থার সংজ্ঞাজ্ঞাপক। তাই যখন মারীচরূপী কামনারাশি সেই সমস্ত পৃথিবী, তেজ ও জলসম্বন্ধীয় বস্তুর বা বৃত্তির সূক্ষ্ম অবস্থাতে সেই সেই রংএ মনকে তাহার রুদ্ধ অবস্থা হইতে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন বিশ্বামিত্র সেই রাম-অবস্থার ধ্যানে তাঁহার মনকে দৃঢ়ভাবে লিপ্ত রাখিবার জন্য; প্রাণপণে

প্রত্যাকর্ষণ করিতেছিলেন। এই মনকে প্রত্যাকর্ষণ, শুদ্ধ ও বিবেক-সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারাই করিতে হয়। শেষে সেই রামের আকর্ষণই প্রবল হওয়াতে তিনি রামত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-সিদ্ধি হইল। ইহাই হইল মারীচের স্বরূপ।

এখন সুবাহুর স্বরূপ আমরা একটী সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ অত্যধিক মদ্যপান ও মাংস আহার করিয়া যকৃতের পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে; বহুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বা অস্ত্রোপচার দ্বারা ভাগ্যক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইল; তাহার মনে অনুতাপ আসাতে প্রতিজ্ঞা করিল—আর কখনও ঐরূপ কার্য্য করিবে না। তাহার মনও বেশ স্থির হইয়াছে। এমন সময় একদিন উপকারী বন্ধু আসিয়া জুটিলেন। তিনি সেই পূর্ব্বকালের আমোদপ্রমোদের গল্প উত্থাপন করিয়া তাহার মনের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন সঞ্চার করিলেন। সেই সমস্ত বহুকষ্টে বিস্মৃত আপাতমধুর আমোদের গল্পের প্রসঙ্গে, তাহার মনও ক্রমে ক্রমে আলোড়িত হইতে আরম্ভ হইল। কিছুতেই আর সেইরূপ কার্য্য করিবে না স্থির সঙ্কল্প। তখন বন্ধু তাহার শেষ অস্ত্র তাহার দুই আপাত সুদৃশ্য বাহু দ্বারা তাহার গলা জড়াইয়া তাহাকে টানাটানি করিতে লাগিল। তখন সে তাহার পীড়ার যন্ত্রণা ভোগের কথা বিস্মৃত হইয়া, সেই সুবাহুর আকর্ষণেই আত্মসমর্পণ করিল। তাহার সঙ্কল্পও টুটিয়া কোথায় ভাসিয়া গেল, আবার সেই আমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। আবার কোনও ব্যক্তি অতিরিক্ত কামপরতন্ত্র হইয়া, কুস্থানে অভিগমন করিয়া জননেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক ব্যাধিগ্রস্ত হইল। তাহার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সেবনের কুফলেই যে এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি উৎপন্ন

হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হইল ও প্রতিজ্ঞা করিল, কোনরূপে একবার আরোগ্য লাভ করিতে পারিলে আর ও পথের অভিমুখে যাইবে না। এখানেও আবার তাহার সুবাহু দ্বারা আকর্ষণকারী বন্ধুর আবির্ভাব হইল, আর তাহার সঙ্কল্পও বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া গেল। এই সুবাহু আপাতদৃশ্য সুবন্ধুর ন্যায়, প্রলোভনেরই মূর্ত্ত প্রতীক। বিশ্বামিত্র একবার তপস্যাকালীন অপ্সরা মেনকার প্রলোভনে পড়িয়া সাধনাভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এবার তিনি রামের সাহায্যে তাহাকে জয় করিয়া সিদ্ধকাম হইলেন। ইহাই সুবাহু।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে বাল্মীকি, বিশ্বামিত্রকর্তৃক রামকে যোগ-সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের সোপানে আরোহণ করাইবার জন্যই তাঁহার অবতারণা করিয়াছেন। এখন এই মারীচ ও সুবাহু বধে, রামের কি উপকার বা পরীক্ষা হইল, তাহাই দেখাইতে হইবে। বিশ্বামিত্র ইতিপূর্ব্বে তাড়কাবধে রামের মনঃসংযমের শক্তির পরীক্ষা পাইয়াছেন। এখন তিনি রামকে সশস্ত্রে অহোরাত্র সর্ব্বক্ষণ, তাঁহাকে ছয়দিন পাহারা দিয়া, সতর্ক প্রহরীর ন্যায়, শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে নিয়োগ করিলেন। রামও, মুনির ন্যায় একাগ্রচিত্তে, অনাহারে, অনিদ্রায় তপোবন রক্ষার্থ যেন "উপাসাঞ্চক্রু" উপাসনায় ব্রতী হইলেন। এইরূপ একাগ্রতার ফলে তাঁহারও বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞান লুপ্ত হইয়া, মনঃসংযম হইলে তিনিও যোগাবিষ্ট হইলেন, এবং মুনির ন্যায়ই সেই মেঘসদৃশ কৃষ্ণ ও শোণিতের ন্যায় লোহিত রংএর জ্যোতিই দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। কেননা সেই মারীচ-নিক্ষিপ্ত শোণিত দৃষ্টেই তিনি মারীচের আগমন জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই মারীচকে তিনি মনুসংহিত অর্থাৎ মন দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট মানব

'শীতেষু' কিনা মনুষ্যের শক্তিসাধ্য শীতল অস্ত্রে বিদ্ধ করিয়া, শীতল সমুদ্রেই নিক্ষেপ করিলেন। যেন কামনারাশিকে তৎসময়ের মত ঠাণ্ডা করিলেন। অর্থাৎ সেই কামনারাশির উগ্র তেজে তিনি উত্তেজিত হন নাই। তিনি মারীচকে বধ করিয়া পূর্ণ রিপুজয়ী হইতে পারেন নাই। এরূপ হইলে এইখানেই রামায়ণও শেষ হইত। মারীচের পুনরভ্যুত্থান না হইলে রামায়ণের পরবর্ত্তী রহস্যসমন্বিত অংশও রচিত হইত না। বিশ্বামিত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনিও এই লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণের জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছেন। তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শিক্ষা অবিলম্বে ফলপ্রসূ হইবে। কেননা, রাম মনের একাগ্রতা সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা কখন যোগসাধনে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যোগসাধনে মনঃসংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিলে, মানসনয়নে এই পৃথ্বীর সূক্ষ্ম তত্ত্বরূপ কাল জ্যোতি প্রথমে উদ্ভাসিত হয়। তারপর তেজরূপ অগ্নির লাল জ্যোতি, আবার তাহারও তিরোভাবে চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি, আর শেষে মন স্থির হইলে তাহাই স্থিরসৌদামিনীরূপে আবির্ভূত হয়। তারপর তাহাও মানস নয়ন হইতে তিরোভূত হইলে মনের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মদর্শন হয়। আমায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত যোগিবর তিব্বতী বাবা প্রথম উপদেশ প্রদানের সময় ঠিক এইরূপই বলিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্র ঋষি নিজের উপকার সাধনার্থ প্রথমতঃ রামকে দশরথের ক্রোড়চ্যুত করিয়া আনিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এই বালক রামকে সাধনার পথে উপদেশ দিয়াছিলেন তখনই—যখন তিনি দেখিলেন, এই সর্ব্বগুণমণ্ডিত দশরথতনয় রাজপ্রাসাদের সুখভোগ

পরিত্যাগ করতঃ, অনভ্যস্ত পদব্রজে ছয় ক্রোশ পথ বিনা ক্লেশে, অম্লানবদনে অতিক্রম করিয়া, রাত্রিকালে কেবল বনজাত ফলমূলাদি মাত্র ভক্ষণ করিয়াই তৃপ্ত হইয়া, কঠিন ভূমিতে তৃণশয্যায় বৃক্ষতলেও সুনিদ্রা উপভোগের পর, পরদিন প্রভাতে অবিকৃত বদনে, সুস্থদেহে ও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। তাঁহার প্রথম পরীক্ষাতে বালক রাম যখন উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহাকে যথার্থ অধিকারী বিবেচনা করিয়া শিষ্যের উপযুক্ত মনে করিলেন। তৎপরেও তিনি তাঁহাদিগকে আরও ক্লেশপ্রদ অবস্থায় আনীত করিয়া পরীক্ষা করিলেন। সমস্ত দিন ভ্রমণের পর ভীষণ জঙ্গলপ্রান্তে আনিয়া বলিলেন, আমাদের গন্তব্যস্থানে যাইতে হইলে, এই ভীষণ বন অতিক্রম করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত ন্যূন সময়ে পৌছিতে পারা যায়, কিন্তু এই বনে ভীষণ হিংস্র জন্তুর উৎপাৎ আছে, অন্যথা এই বনকে বেষ্টন করিয়া যে পথ আছে তাহা নিরাপদ, কিন্তু তাহা অতিক্রম করা বহু সময়সাপেক্ষ। তখন তিনি রামকে বলিলেন, তোমরা যদি আমার সহিত আসিয়া এই ক্লেশপ্রদ ভ্রমণে অগ্রসর হইতে এখনও অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর। তোমরা রাজপুত্র, রাজসম্পদের মধ্যে বর্দ্ধিত। রথাদি আরোহণ ব্যতীত কখনও পুত্রবৎসল রাজা তোমাদিগকে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেন নাই। তোমরা কখনও সুস্বাদু সুপক্ক রাজভোগোপযোগী আহার ব্যতীত অন্য কিছু ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ কর নাই, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া ভৃত্যসেবায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করা ব্যতীত কঠিন স্থানে শয়ন কর নাই; এখন হয়তো তোমাদের সেই সমস্ত বিলাস ও সুখভোগের কথা স্মরণ হইয়া, তোমাদের মনে ক্লেশ ও দুঃখ উৎপাদন করিতেছে। বিশ্বামিত্র এইরূপ সমস্ত বাক্যে তাঁহাদের

পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি জাগরণ করাইয়া দেখিলেন, ইহাতে সেই সকল ভোগের কামনায় তাঁহাদের মন বিচলিত হয় কিনা এবং তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিনা? ইহাই যেন তাঁহার কামরূপী তাড়কা রাক্ষসী। যখন দেখিলেন, রাম অবিচলিতচিত্তে হৃষ্টান্তঃকরণে তাড়কাবধের জন্য উদ্যোগী হইয়া প্রস্তুত হইলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন—রাম এই সমস্ত কামনার তাড়নাকে দমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত যথেচ্ছা যাইতেই উদ্যত। ইহাই রাম কর্ত্তৃক তাড়কা বধ। তারপর তাঁহার শেষ ভীষণ পরীক্ষা হইল এই মারীচ ও সুবাহুবধে। বিশ্বামিত্র ছয়দিন মৌনী হইয়া, অনাহারে অনিদ্রায় একাসনে ধ্যাননিরত হইলেন। আর মুনিরা তাঁহার আদেশ জানাইলেন যে, যে পর্য্যন্ত রাক্ষসগণ না আসে সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে সতত সতর্ক থাকিয়া রক্ষা করিতে হইবে। রাক্ষস যে কোন দিন কোন মুহূর্ত্তে আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং রামকেও তাবৎকাল অনিদ্র ও অনাহারী অবস্থায়, রাক্ষস বধার্থ ধনুতে শরযোজনা করিয়া সতর্ক প্রহরীর ন্যায়, যেন উপাস্য দেবতা কখন আবির্ভূত হইবেন এই প্রতীক্ষায় তাঁহার (দেবতার) উপাসনায় নিরত হওয়ার ন্যায়, একাগ্রচিত্তে দীর্ঘ ছয় দিন একাসনে যাপন করিতে হইল। ইহাতে যখন রামের কোন ক্লেশ অনুভূতি হইল না, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার জন্য বহু কষ্টভোগ করিয়াছ; আমি তোমাকে আর ক্লেশ দিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি আমার সহিত থাকিলে হয়তো তোমাকে ইহা অপেক্ষাও আরও বেশি ক্লেশ পাইতে হইবে। সুতরাং তুমি রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজসম্পদ ভোগ কর। এই প্রলোভনেও রাম তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইলেন না, কেননা

বিশ্বামিত্র রামকে, দশদিনের জন্য তাঁহার সহিত থাকিবে বলিয়া রাজার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। রামও এই নি[illegible]পূর্ণ না হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। ইহাই তাঁহার সুবাহুরূপ প্রলোভন জয়। রাম এইরূপ অনাহারে ও অনিদ্রায় যখন দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন তখন মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে অন্ধকার ও ক্ষণে ক্ষণে আলো দেখিতে পাইতেছিলেন। যেমন ক্ষুধাতে ও অনিদ্রায় চোখে অন্ধকার দেখে, আবার দৃঢ়মনা হইয়া কোন কার্য্য-সাধনে ব্রতী হইলে মনের বলে সেই অন্ধকার দূর করিয়া লাল আলো দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এক এক বার নিদ্রার আবেশ হইতেছিল, তাহাতেই যেন চক্ষুর দৃষ্টি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছিল, তখনই আবার তাহা দূরীভূত করিয়া জাগ্রত রহিবার চেষ্টার সময় লাল আলো দেখিতেছিলেন। আবার ক্ষুধার পীড়নে আহারের প্রলোভনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে সহায় হইতেছিল। তাহাও তিনি দমন করিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট ছয়দিনের শেষে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য বিনা বাধায় সম্পন্ন করিলেন। ইহাই মনুষ্য রামের পক্ষে যথেষ্ট পরীক্ষা, তাহা বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন। ইহাতে রামের ঐতিহাসিকত্বেও কোন বাধা হইল না।

রাম তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যে এবং বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শিক্ষার ফলে অস্ত্র-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া, এই শূন্য হইতে আগত শূন্যচারী রাক্ষসদ্বয়কে বধ করিয়া, তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদেরই পরিচয় দিলেন। শূন্যগামী-পক্ষী বধ করা সহজসাধ্য নহে। এইরূপ লক্ষ্য-ভেদ করিতে হইলে বিশেষরূপে সেই শূন্যগামী প্রাণীর গতি অনুমান করিয়া কোন মুহূর্ত্তে শর বা গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা স্থির করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে রাম স্থলচর দ্রুতগামী জীব তাড়কাকে

বধ করিয়া, তাঁহার লক্ষ্য স্থিরতার পরিচয় দিয়াছেন। এখন আবার শূন্যচর, দ্রুতগামী উড্ডীয়মান জীবও বধ করিয়া অব্যর্থ সন্ধানের সাফল্য দেখাইলেন। পূর্ব্বকালে ঋষিরা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলে আদিম মনুষ্যেরা সেই যজ্ঞ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। আবার শূন্যগামী বৃহৎ পক্ষী কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর দেহ হইতে যে শোণিত নিক্ষিপ্ত হইত তাহা হইতেও যজ্ঞ অশুদ্ধ হইত। অনেক সময় শূন্যগামী বৃহৎ শকুনি জাতীয় পক্ষীও মাংসলোভেই যজ্ঞে, শূন্য হইতে আপতিত হইত, এবং তাহাদের মুখ হইতে সদ্যধৃত প্রাণীর রক্তও ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইত। রাম এইরূপ কোনও শূন্যগামী মাংসাশী বৃহৎ পক্ষীর দল বধ করিয়াছিলেন। কেননা বর্ণিত আছে মারীচ ও সুবাহুর সহিত অনেক রাক্ষসও আসিয়াছিল এবং রাম সেই সমস্তকেই নিহত করিয়াছিলেন। আবার পক্ষীরা যখন দলবদ্ধ হইয়া ঝাঁকে আসে, তখন তাহা দ্রুতগামী মেঘের ন্যায়ই দৃষ্ট হয়। ইহাই রামের ঐতিহাসিক উপাখ্যানের সমন্বয়ানুযায়ী তাৎপর্য্য বলিয়া অনুমান হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অহল্যা উদ্ধার

তৎপর দিন প্রভাতে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন "আপনার এই ভৃত্য উপস্থিত; এইক্ষণ আপনার আদেশানুসারে আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে তাহা আদেশ করুন।" তিনি এই কথা বলিলে, সেই আশ্রমস্থ ঋষিরা বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামকে বলিলেন। "নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরাধর্ম্ম সম্পাদক যজ্ঞ হইবে, আমরা তথায় গমন করিব এবং তুমিও আমাদিগের সহিত তথায় চল; যেহেতু সেখানে একটী পরম অদ্ভুত রত্নস্বরূপ ধনু আছে, তাহা তোমার দেখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যজ্ঞকালে সভাতে দেবতারা সেই ধনু জনককে প্রদান করিয়াছিলেন; সেই ধনু অপরিমিত বলসম্পন্ন, পরমোজ্জ্বল এবং অতি ভীষণ; দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস বা বানর কেহই তাহাতে গুণ আরোপন করিতে সমর্থ নহেন। বহু মহাবলসম্পন্ন রাজনন্দনেরা সেই ধনুতে জ্যারোপন করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই স্থানে জনকের পরমাদ্ভুত যজ্ঞ ও ধনু দেখিতে পাইবে। সেই মিথিলাধিপতি জনক, দেবতাগণের নিকট সেই সুনাভ নামক ধনু চাহিয়া লন। সেই রাজার গৃহে সেই ধনু অর্চ্চিত হইয়া থাকে।" অতঃপর বিশ্বামিত্র বনদেবতাদিগের উদ্দেশ্যে বলিলেন "আমি এই সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধ হইয়া, এস্থান হইতে হিমালয় পর্ব্বতবর্ত্তিনী জাহ্নবী তীরে যাইতেছি।" ইহার পর তাঁহারা উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা

বহু পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যাস্তে শোণা নদীর তীরে রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপর দিন প্রাতে তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া শোণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তারপর গঙ্গা পার হইয়া তাহার অপর পারে বহু পথ অতিক্রম করিয়া, বিশাল নগরীতে উপনীত হইয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপরদিন প্রাতে তাঁহারা মিথিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম, সেই মিথিলার উপকণ্ঠস্থিত উপবনে একটী নির্জ্জন পুরাতন রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইয়া, বিশ্বামিত্রকে, ঐ জনমানব-শূন্য পরিত্যক্ত আশ্রমটী কাহার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "রাম! যে মহাত্মা মহর্ষি কোপবশতঃ এই আশ্রমের প্রতি শাপ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি তোমাকে বিস্তারিত বলিতেছি। পূর্ব্বে এই দিব্য আশ্রম মহাত্মা গৌতমের ছিল। দেবতারাও ইহার সৎকার করিতেন। মহাত্মা গৌতম বহু বৎসর অহল্যার সহিত এই আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা গৌতমের অবর্ত্তমানে, উপযুক্ত সময় বোধে, ইন্দ্র তাঁহার (গৌতমের) বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট যাইয়া বলিলেন, 'সুন্দরি! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত সঙ্গম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে; রমণার্থী ব্যক্তি রতি বিষয়ে বিহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না।

"ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥"

অহল্যা তাঁহাকে মুনিবেশধারী ইন্দ্র জানিতে পারিয়াও, দুর্ব্বুদ্ধি হেতু, দিব্যরমণে কুতূহল বশতঃ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর তিনি পূর্ণমনোরথা হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন—"আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন শীঘ্র এই স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ আমার এবং

নিজের গৌরব রক্ষা কর।” তখন মহেন্দ্র গৌতমের ভয়ে সেই পর্ণশালা হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন এবং সম্মুখেই তপোবল-সমন্বিত শক্তিশালী গৌতমকে, তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিত ও কুশহস্তে, আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। তখন গৌতম, তাঁহারই বেশধারী ইন্দ্রকে কুটির হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে শাপ দিলেন “রে দুর্ম্মতি! যেহেতু, তুই আমার বেশ ধারণ করিয়া এই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছিস্, অতএব তুই অণ্ডকোষ বিহীন হইবি।” নিজ ভার্য্যাকে এরূপ অভিশাপ দিলেন—‘দুর্ব্বৃত্তে! তুই এই আশ্রমে বহু বৎসর নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশালিনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করতঃ বাস করিবি। যখন এই বনে দশরথনন্দন রামের আগমন হইবে, তখনই তুই পবিত্রা হইবি। তুই, তাঁহার আতিথ্য করিয়া, লোভ মোহ বর্জ্জিত হইয়া, স্বীয়রূপ লাভ পূর্ব্বক সানন্দে আমার নিকট আসিবি।’ মহাতপস্বী গৌতম এই বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ে যাইয়া তদবধি তপস্যায় নিরত হইলেন। অতএব রাম! তুমি গৌতমের আশ্রমে যাইয়া মহাভাগা দেবরূপিনী অহল্যাকে উদ্ধার কর।” তখন রাম সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তপঃ প্রভায় উদ্ভাসাঙ্গী অহল্যাকে দেখিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলেন। পরে অহল্যা, গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া, রামপদ-মূলে প্রণাম পূর্ব্বক সুসমাহিতা হইয়া, তাঁহাদিগকে পাদ্যঅর্ঘ দানে আতিথ্য সৎকার করিলেন। রামও যথা-বিধি তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইলেন।

এই অহল্যা উদ্ধারের তাৎপর্য্য কি? অহল্যা শব্দের অর্থ—ন+হল্যা (বিরূপত্ব) যাহার কোন বিরূপতা নাই। অর্থাৎ যে অনিন্দ্য

সুন্দরী। আবার হলশব্দের অর্থ ভূমিকর্ষণ যন্ত্র—লাঙ্গল। হল্যা অর্থাৎ হল দ্বারা কর্ষিতা। ন+হল্যা যে হলদ্বারা কর্ষিতা হয় নাই। মানবী অহল্যা হল দ্বারা কর্ষিতা হয় নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাহার দেহের বুদ্ধি তখন কর্ষিত হইয়া বিশুদ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, অহল্যা, একাধারে অনিন্দ্য সুন্দরী এবং অবিশুদ্ধমনা ; তিনি নিজ সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিতা ছিলেন এবং বিধিচক্রে গৌতমের হস্তে প্রদত্তা হইয়া, সেই তপোক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ঋষির দ্বারা, তাঁহার ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হইতে না পারিয়া, অতৃপ্তা ছিলেন। এরূপ অবস্থায় সুন্দরী যুবতী নারীর মন, সময় সময় যে ইন্দ্রিয় তাড়নায় উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? তারপর তিনি যখন ঋতুমতী ছিলেন, তখন তাঁহার উদ্দীপ্ত ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি-বশতঃই, ইন্দ্রের ন্যায় সুপুরুষের আহ্বানে, ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া আত্মদান করিতে, পদস্খলন হইয়াছিল।

"…সহস্রাক্ষঃ শচিপতিঃ। মুনিবেশধরোভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥"

ইন্দ্রও মুনির বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইন্দ্রমুনির বেশভূষা পরিয়া মুনির সাজে সাজিয়াছিলেন। গৌতমের রূপ যে ইন্দ্র ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। তাহা হইলে অহল্যা তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিতেন না বা গৌতম প্রথম দৃষ্টিতেই দূর হইতে তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেন না। সুতরাং ইন্দ্রের নিজ স্বরূপ দেখিয়াই, অহল্যা কাম-মোহিতা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তখন তিনি ঋতুমতী থাকাতে, তাঁহার মন তখন উত্তেজিত অবস্থাতেই ছিল, এবং তাঁহার স্বামীও, তীর্থে-স্নান উদ্দেশে গমন করা বশতঃ, অনুপস্থিত ছিলেন। অহল্যার উপাখ্যান সত্য হইলে, এবং ইহাকে রামের চরিত্রের একটী ঐতিহাসিক ঘটনা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, এই কাল্পনিক দেবতা

ইন্দ্রের স্থানে একটী মানবকে স্থাপিত না করিলে, ইহার ঐতিহাসিকত্ব অক্ষুন্ন থাকে না। বাল্মীকি শচীপতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শচী শব্দের অর্থ কর্ম্ম। যথা, ঋক্ বেদে—

"ন কিরস্থ শচীনাং নিয়ন্তা সুনৃতানাম্" (৮।৩২।১৪)
শচ্যাঃ পতি ইন্দ্র, কর্ম্মপালকে "শক্তিং শচীপতি শচীভিঃ"
(৭।৬৭।৫) "শচীতি কর্ম্মনাম, কর্ম্মনাম পালকৌ। অন্যত্র
"শচীবোঽভি" = কর্ম্মবন্ ইতি সায়ন ভাষ্য।

বেদে ইন্দ্রকে শচীপতি অর্থে বহুকর্ম্মবন্ বলা হইয়াছে। পুরাণে এই কর্ম্মার্থক শচীকে, নারী করিয়া, তাঁহাকে ইন্দ্রের স্ত্রীরূপে পরিণত করা হইয়াছে। কর্ম্মবান্ ইন্দ্র একবারে শচীরূপ নারীর পতিরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। বেদে তাঁহার বহু কার্য্যের বা কর্ম্মের কথা উল্লেখ আছে। তিনি বর্ষণকারী তাই বৃষ। তিনি বজ্র বা বিদ্যুৎ-দ্বারা বৃত্র (অন্ধকার) রূপ শত্রুনাশী, তাই তিনি বৃত্রহা। এইরূপ অনেক কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ॥

ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। এই ইন্দ্রই তখন বৈদিক ঋষিদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন

"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

এক সৎ ইন্দ্রকেই তাঁহার বহুরূপে প্রকাশিত বলিতেন। তিনিই পরম ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর ছিলেন। পুরাণে সেই ইন্দ্রকেই সেই পরমেশ্বরকেই যে রূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, এই অহল্যা উপাখ্যানেই আমরা তাহার বেশ পরিচয় পাই। পৌরাণিক ইন্দ্র শতক্রতু-রূপ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক কর্ম্মের মধ্যে এই পরস্ত্রীগমন কর্ম্মও অনেকস্থলে পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। আর স্বর্গের অপ্সরা

সম্ভোগের তো কথাই নাই। তাঁহার এই কার্য্য আধুনিক লম্পটের কার্য্য বলিয়াই অভিধেয় হওয়া সঙ্গত। স্বরূপ লম্পটদের কর্ম্মও এইরূপ সুন্দরী পরস্ত্রীকে ভুলাইয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করা। সুতরাং কাল্পনিক ইন্দ্রকে বাদ দিলে আমরা ইহাই অনুমান করিতে পারি যে, সেই পৌরাণিক ইন্দ্রেরই ন্যায় কর্ম্মকারী কোন সুন্দর ও যৌবনসম্পন্ন পুরুষ, ঠিক অহল্যার ঋতুমতী অবস্থা ও গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া, অহল্যাকে নিজের সুন্দররূপে প্রলোভিত করিয়া, তাহার রূপযৌবন ভোগ করিয়াছিল। এখানে বাল্মীকি সম্ভবতঃ ইন্দ্র শব্দ ইন্দ্রিয়ার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় শব্দ ইন্দ্র হইতে উৎপত্তি। এই ইন্দ্রিয় সাহায্যেই অন্যেরও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয় হইতেই বৃত্তিনিচয় বর্ষণ হয়। ইন্দ্রিয় দ্বার দ্বারাই তাহা মন গ্রহণ করে। তাই ইন্দ্রিয়কেও বৃষ বলা যাইতে পারে।

"ইন্দ্রিস্যাত্মনো লিঙ্গমনুমাপকম্। ইন্দ্রেন ঈশ্বরেন সৃষ্টং।
ইন্দ্র+ঘচ্ করণম্।"

ইন্দ্রিয় দ্বারাই আত্মার অনুমাপ বা অনুধাবন হয় বা আত্মা প্রকাশিত হয়। গৌতম অহল্যার ইন্দ্রিয়কেই অভিশাপ দিয়াছিলেন। অথবা যে পুরুষ তাঁহার পত্নীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল, তাহার ইন্দ্রিয়কেই বৃষণ রূপে বলিয়া, তাহার বর্ষণ বা সেচন শক্তি শাপ দিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গৌতমের শাপে ইন্দ্রের বৃষণ বা অণ্ডকোষ নষ্ট হইলে, দেবতারা সেই স্থানে মেষের বৃষণ যোজনা করিয়া দিয়া, তাঁহার সেই চিরাচরিত কার্য্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাই ইন্দ্রের আর একনাম, মেষ-বৃষণ। পুরাণ-কর্ত্তারা এই অহল্যার উপাখ্যানেই ইন্দ্রের মেষ-বৃষণ নামের উৎপত্তির

কারণ দর্শাইয়াছেন। বেদে ইন্দ্রের নাম মেষ-বৃষণ আছে। তাহার অর্থে ইন্দ্র মেষের ন্যায় বর্ষণ করেন বা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বৃষ ধাতু অর্থে বর্ষণ। ষণ্ডও রেত সেচন বা বর্ষণ করে বলিয়া তাহার নাম বৃষ। যেখান হইতে বর্ষণ হয় তাহাই বৃষণ। বৃষের অণ্ডকোষ হইতে রেত সেচন বা বর্ষণ হয় বলিয়া, অণ্ডকোষের আর একনাম বৃষণ। মেষ শব্দ মিষ শব্দ হইতে উৎপন্ন। মিষ=স্পর্দ্ধায়। মেষের রেত সেচনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি স্পর্দ্ধা আছে, তাহা সাধারণতঃ সকলেই দেখিয়াছে। পৌরাণিক ইন্দ্রেরও অসংখ্য অপ্সরা সম্ভোগ এবং পরস্ত্রী গমনে, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে এ বিষয় স্পর্দ্ধা খুব বেশি। কিন্তু বেদোক্ত ইন্দ্রের এই বারিবর্ষণে যথেষ্ট স্পর্দ্ধা আছে। কেননা তিনি মেঘকে স্পর্দ্ধা সহকারে বাহন করিয়া, তাহা হইতে বর্ষণ করেন। তাই তাঁহার আর এক নাম জীমূতবাহন। জীমূত অর্থে মেঘ। এই রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে পৌরাণিক কাহিনীর জন্মদাতা পৌরাণিক শ্রেষ্ঠ নারদ কর্ত্তৃক অহল্যার জন্মের কথা উল্লেখ আছে। তাহা এইরূপ —অহল্যা=ন+হল্যা (বিরূপতা)। যাহার সর্ব্বাঙ্গে একটুও বিরূপতার লেশ নাই এইরূপ এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা ব্রহ্মা সৃজন করিলে, ইন্দ্রের লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। ব্রহ্মাও ইন্দ্রচরিত্র বিশেষ অবগত, সুতরাং অন্যত্র সুপাত্রের অন্বেষণ করিয়া শেষে গৌতম ঋষির করেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রও নাছোড়। সুতরাং তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যে আসিয়া অহল্যার পর্ণ কুটিরের আশে পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিতেন। গৌতম তীর্থে গিয়াছেন। বেশ সুযোগ পাইয়া নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ করিলেন। কলিযুগের হিন্দুদের ইহা বড়ই সৌভাগ্য যে, এ হেন দেবতার আবির্ভাব আর হয় না। আর শাস্ত্রকারেরাও, এই ত্রিপাদ

পাপক্লিষ্ট কলিযুগে বেশ বুঝিয়া সুজিয়াই, ইন্দ্রের পূজাটী প্রচলনে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কোথাও কোথাও অনাবৃষ্টি হইলে, সেই বৈদিক ইন্দ্রেরই পূজার ব্যবস্থা হয়। আমাদের স্মরণ হয়, বাল্যকালে এইরূপ ইন্দ্রের পূজা একবার দেখিয়াছিলাম, তাহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে "কলিকা"তে গঞ্জিকা দিয়া অগ্নি-সংযোগ করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করা হইয়াছিল। বোধহয় অপর জাতির পক্ষে যজ্ঞের হবির পরিবর্ত্তে এই গঞ্জিকা দানই শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন। বাল্মীকি এখানে তাঁহার বিভিন্নরুচি পাঠকের জন্য, এই পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। আমরা এই ঐতিহাসিক অহল্যার সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া, তাহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করিলাম মাত্র। ইহার গ্রহণ পাঠকের রুচির উপর নির্ভর।

গৌতম অহল্যাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অহল্যার স্বেচ্ছায় কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করতঃ, তিনি বিশুদ্ধা হইলে তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ করিবেন, এ আশ্বাসও দিয়া যাইলেন। কি মহানুভবতা। তাঁহাকে সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া থাকিতে বলিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে এমন স্থানে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, যেখান হইতে তাঁহার, মানব কেন, পশুপক্ষীও, দৃষ্টিগোচর না হয়—অন্যজাতীয় প্রাণীর সঙ্গম দেখিলেও পাছে তাঁহার কাম উদ্রেক হয়। তাঁহার যে কমনীয় দেহের তিনি গৌরব করিতেন, তাহাকে ভস্মাচ্ছাদিত করিলে, যেন তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি আর নিজ রূপের গর্ব্ব অনুভব না করিতে পারেন। কঠিন ভূমি শয্যায় শয়ন করিলে কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক খুব কমই হয়। শয্যা অত্যন্ত নরম হইলে তাহাতে শয়ন করিলে, ঐ প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তাই ভূমি-শয্যার ব্যবস্থা দিলেন। যখন এইরূপ

দীর্ঘকাল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অনুতাপানলে শোধিত হইয়া তাঁহার মনসংযম হইবে, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তপস্যারত হইবেন। এই নিষ্কাম তপস্যার ফলে যখন তাঁহার মন বিশুদ্ধ হইয়া লয় হইবে, তখন তাঁহার আত্মজ্ঞান হইবে—তাহাই তাঁহার রামদর্শন। তখন আত্মজ্ঞানী গৌতম, (যাঁহার রাম সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছিল) যখন বুঝিতে পারিবেন, অহল্যারও সে জ্ঞান হইয়াছে, তখনই তাঁহাকে নিজ সমজ্ঞানে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। গৌতমের এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। তাই বহু-বৎসর প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যার ফলে, অহল্যার রাম দর্শন ঘটিল, আর তখনই গৌতম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য। ইহাতে আরও দেখান হইয়াছে, নারী পদস্খলিত হইয়া স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করিলেও, প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ ও তপস্যা বা সাধনার ফলে, আত্মজ্ঞানও লাভ করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যীশু খ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেবের জীবনীতেও দেখিতে পাই। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে সেই মহামনা আর্য্যঋষি গৌতম, বাল্মীকি প্রভৃতির সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলি, আধুনিক সমাজ কর্ত্তারা পরিত্যাগ করতঃ, কতকগুলি সঙ্কীর্ণ বিধি নিষেধের গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া, তাহা দ্বারাই সমাজ শাসন করিতেছেন। এই সকল বিধি নিষেধ প্রচলনে তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিতেছেন। স্বেচ্ছায় পতিতা দূরের কথা, বল প্রয়োগে দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা ধর্ষিতা এইরূপ নারীদিগকে তাঁহারা সমাজ বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাদের অধঃপতনের সোপান মসৃণ করিয়া দিতেছেন। সেই সমস্ত অধঃপতিতা নারীর পরিণাম কি শোচাবহ তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। তাহা দেখিয়াও তাঁহাদের স্বেচ্ছায় নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত হয় না। ইহাদের অনেকেই হয়তো যদি অহল্যার ন্যায় গৌতমের নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া, প্রায়শ্চিত্ত বা

অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, বিশুদ্ধ হইবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে অহল্যার স্বামীই জনসমাজে আদৃত হইত। আর ধর্ষিতা নারীর তো কথাই নাই। পুরুষ যদি তাহাকে রক্ষাই না করিতে পারিল তাহা হইলে তো অসহায় অবস্থায় যে কোন দুর্ব্বৃত্ত তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে। এখানে তাহার দোষ কি? কতদিনে আমাদের অন্ধ শাস্ত্রকর্ত্তা সমাজশাসকদের স্বেচ্ছায় অন্ধ নয়ন উন্মীলিত হইবে, এবং তাঁহারা শাস্ত্র সম্বন্ধে একদেশদর্শী না হইয়া, সমস্ত শাস্ত্রেরই আদর করিয়া, তাহাদের ন্যায় অন্যায় বিধি সকলের বিচার করতঃ, নিজেদের কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন? আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

গৌতম অহল্যাকে শাপ দিয়া বলিয়াছিলেন, যখন রাম এই আশ্রমে আসিবেন, তখন অহল্যা পবিত্রা হইলে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। গৌতম নিজে আত্মজ্ঞানী ছিলেন। তাই অহল্যাও তপস্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ রূপ রাম দর্শন করিতে পারিবেন এ বিষয় তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এই দাশরথি রামে যে পূর্ব্ব হইতেই রামত্ব বীজ নিহিত আছে ইহাই বাল্মীকি দেখাইলেন। গৌতম ঋষি রামের আগমন ঐরূপ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন, নতুবা রাম যে ঐ বনে আসিবেন তাহা তিনি কিরূপে তখন জানিতে পারিয়াছিলেন? বিশ্বামিত্র ঋষি গৌতমের ইতিহাস জানিতেন, তাই তিনি রামকে সেখানে আনয়ন করিয়া, অহল্যাকে দর্শন করাইয়া, এই রাম দেহই যে তাঁহার লক্ষ্য রামের সংজ্ঞা জ্ঞাপক তাহাই দেখাইলেন। বস্তুতঃপক্ষে ইহাতে অহল্যার উদ্ধারও নাই, আর কবি কীর্ত্তিবাসের রামপদস্পর্শে অহল্যার পাষাণত্ব মোচনও নাই। রাম আসিয়া প্রথমতঃ অহল্যারই পাদবন্দনা করিয়াছিলেন।

"রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌজগৃহতুর্ম্মুদা।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ।"—

গৌতমও যখন জানিতে পারিলেন যে অহল্যা দীর্ঘ সময় তপ ও সাধনা দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তথায় উপস্থিত হইয়া রামকে দেখিতে পাইলেন। তখন উভয়ে মিলিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরধনুর্ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ

তাঁহারা সেই গৌতম আশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়া রাজর্ষি জনকের যজ্ঞশালাতে প্রবেশ করিলেন। সেই যজ্ঞে অনেক ঋষি ও নানা দেশবাসী বেদাধ্যায়ী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র নির্জ্জন স্থানে তাঁহাদের আবাস স্থির করিলেন। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুরোহিত অহল্যানন্দন শতানন্দসহ প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য দিলেন। তৎপরে তিনি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুই দেবতুল্য কুমার কে এবং কাহার পুত্র? ইঁহারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন এবং কি প্রকারেই বা পদব্রজে আসিয়াছেন? বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ইঁহারা রাজা দশরথের পুত্র। ইঁহারা নিরাপদে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছেন এবং আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন।"

তৎপর দিন প্রভাতকালে রাজা, বিশ্বামিত্র ও রামলক্ষ্মণকে সভাস্থলে আহ্বান করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, "ইঁহারা লোকপ্রসিদ্ধ রাজা দশরথের পুত্র। আপনার গৃহে যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহারা এখানে আসিয়াছেন। আপনি ইঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করান, ইঁহারাও সেই ধনু দর্শন করিয়া,

পূর্ণমনোরথ হইয়া যাহা অভিলাষ হয় তাহা করুন।” তখন রাজা বলিলেন, “এই ধনু যে নিমিত্ত আমার নিকট আছে তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা দেবরাত নামে নরপতি ছিলেন; তাঁহার হস্তে এই ধনু ন্যাসস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে বীর্য্যবান্ মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক, লীলাসহকারে দেবতাদিগকে কহিয়াছিলেন ‘সুরগণ! যেহেতু আমি হবির্ভাগার্থী হইলেও তোমরা আমার ভাগ নির্দ্দেশ কর নাই; তজ্জন্য আমি তোমাদের সর্ব্বলোক পূজনীয় মস্তক এই ধনু দ্বারাই ছেদন করিব।’ পরে দেবগণ বিমনা হইয়া দেবাদিদেব হরকে প্রসন্ন করায়, তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। মহাদেবের সেই ধনু তৎকালে ন্যাসস্বরূপ দেবগণ কর্ত্তৃক, আমার পূর্ব্বজাত দেবরাতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। একদা আমি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময় আমার লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে একটী কন্যা উত্থিতা হয়। ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার সময় সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি) হইতে সেই কন্যা পাইয়াছিলাম বলিয়া সে সীতা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই নন্দিনী ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আমি সেই অযোনিসম্ভবা কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি বীর্য্যবলে সেই ধনুতে জ্যারোপণাদি করিতে পারিবেন, তিনি এই কন্যা লাভ করিবেন এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলাম। ভূতলোত্থিতা আমার সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিলে, বীর্য্যশুল্কা বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে আমার কন্যা প্রদান করি নাই। তারপর তাহারা মিলিত হইয়া, মিথিলাতে আসিলে, আমি তাহাদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করাইলাম। তাঁহারা কেহই সেই ধনু উত্তোলিত বা পরিচালিত

করিতে পারিলেন না। আমি সেই সকল রাজাদিগের বীর্য্য অল্প দেখিয়া, তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। অনন্তর সেই সকল রাজগণ মৎকর্ত্তৃক আত্মকে অবমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন,—ধনুতে জ্যারোপণরূপ বীর্য্য বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ক্রোধে মিথিলাপুরী অবরোধকরতঃ উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। পরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে আমার সমস্ত সাধন ক্ষয় হইল। তখন আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তপস্যাদ্বারা সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলে, তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত রাজারা, চতুরঙ্গ সৈন্যকর্ত্তৃক নিহতপ্রায় ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া, নানাদিকে পলায়ন করিল। আমি সেই পরম প্রদীপ্ত ধনু রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। যদি রাম সেই ধনু আকর্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমার অযোনিজা কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিব।” তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সেই ধনু আনিতে বলিলে, তিনি সচিবগণকে তাহা সভাস্থলে আনিতে আদেশ দিলেন।

তখন অতি দীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চাশত শত (পঞ্চ সহস্র) লোক অতি কষ্টে যে অষ্টচক্রসমন্বিতা মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। অমাত্যেরা সেই লৌহনির্ম্মিত অষ্টচক্রসমন্বিত মঞ্জুষা, জনক সমীপে উপস্থিত করিলেন। তখন রাজা, রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, “ব্রহ্মণ! এই শ্রেষ্ঠ ধনু জনক বংশীয় সকলেরই পূজিত। ইহা সীতাপরিণয়াভিলাষী মহাপরাক্রান্ত ও মহাবীর্য্যশালী কোন রাজাই উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় নাই। মনুষ্যগণের তো কথাই নাই, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসগণের মধ্যেও কেহ ইহাতে জ্যারোপণ, শরসন্ধান বা টঙ্কার দিতে সমর্থ নহে। আপনি ইহা এই রাজকুমারদ্বয়কে দর্শন করান।”

তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন—"বৎস! তুমি এই ধনু দর্শন কর।" রামও, বিশ্বামিত্রের নিয়োগানুসারে, সেই মঞ্জুষা উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক ধনু সন্দর্শনকরতঃ সকলের সমক্ষেই বলিলেন, "আমি এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনু হস্তদ্বারা বহন করিব এবং ইহা উত্তোলন করিতে ও ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্ন করিব।" তৎপরে রাম, সেই বহুসহস্র দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে, সেই ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে গুণ সংযোজন করিলেন এবং টঙ্কার দিলেন, পরে সেই ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ধনুর নির্ঘাততুল্য তুমুলশব্দে বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত সকলেই মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন জনক, বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "ভগবন্! এই ধনুতে গুণ আরোপণ যে কেহ করিতে পারিবে আমি কখনও এরূপ ধারণা করিতে পারি নাই। সুতরাং দশরথনন্দন রামের বীর্য্য আমি সম্যক্ অবগত হইলাম। আমার নন্দিনী সীতা যে ইঁহাকে পতিলাভ করিয়া জনককুলের কীর্ত্তিবৃদ্ধি করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার তনয়া 'বীর্য্যশুল্কা' আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল; আমি রামকে আমার প্রাণপ্রিয়তমা সীতা সম্প্রদান করিব; আপনার অনুমতিক্রমে মন্ত্রিগণ ত্বরায় অযোধ্যায় যাইয়া, রাজা দশরথকে এখানে সমাদরে আনয়ন করিতে প্রেরিত হউক।" তৎপরে রাজা দশরথ সমস্ত পৌরজনসহ মিথিলাতে উপস্থিত হইলে, মহাসমারোহে সীতার সহিত রামের ও জনকের তিন ভ্রাতষ্পুত্রীর সহিত, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পাদিত হইল।

আমরা পূর্ব্বাপর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে রামের ইতিহাস একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সীতার বিবাহ ও ধনুর্ভঙ্গের বিবরণে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আসে।

সীতার জন্মের যে বিবরণ জনকমুখে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস হয় না, যে সীতা নাম্নী তাঁহার কোনও কন্যা ছিল। কেন না লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তিনি একটী কন্যা প্রাপ্ত হন এবং সেই কন্যা অযোনিজা অর্থাৎ কোন নারীগর্ভসম্ভূতা নহেন এরূপ বলিয়াছেন। ইহা অন্ধশাস্ত্রে বিশ্বাসিগণ ভিন্ন কেহই বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত হইবেন না। ইহা সেই মৎস্যগর্ভসম্ভূতা মৎস্যগন্ধার ন্যায় অবজ্ঞাচক্ষুতেই দৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে কি কোন সীতা ছিলেন না? কিন্তু বাল্মীকি বলিয়াছেন

"অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।"

ইহাতে মৃত্তিকা হইতেই যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহা বলেন নাই। সীতা লাঙ্গলের ফলার মুখ হইতেই উঠিয়াছিলেন। সুতরাং সেই ভূমিতেই সীতা ছিলেন—প্রোথিতা অবস্থায়, আর সেই লাঙ্গল যখন সেই ভূমি খনন করিল, তখনই তিনি দৃষ্টিগোচরা হইলেন। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে একটী সত্য ঘটনা সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। অনেকেরই তাহা দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব। কোন কৃষক সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগমনকালে দেখিতে পাইল তাহার গৃহের সন্নিকটস্থ সদ্যঃকর্ষিত স্থানের মৃত্তিকা নড়িতেছে। সে ইহা নিতান্তই অদ্ভুত ভাবিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই মৃত্তিকা অল্প খুঁড়িয়াই দেখিতে পাইল একটী সদ্যঃপ্রসূত শিশু নড়িতেছে। তখন সে সযতনে তাহাকে উঠাইয়া নিজগৃহে আনিয়া নানারূপ শুশ্রূষা করতঃ তাহাকে রক্ষা করিল। হয়তো কোন শিশু মৃতপ্রায় অবস্থায় জন্মিয়াছিল আর তাহাকে তাড়াতাড়ি মাটিতে পঁতিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত অনেক শিশুই ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, পরে চিকিৎসকের অনেক প্রয়াসে জীবিত হইয়া দীর্ঘজীবী

হয়। বঙ্গদেশে এবং অনেক দেশেই এই মৃতশিশুদিগকে মাটিতে পুঁতিবার প্রথা আছে। কুলমান ভয়ে লজ্জিতা অনেক নারী, তাহাদের অবৈধ উপায়ে গর্ভ সঞ্চার হইলে, সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে অনেকস্থলে ঐরূপেই লোকনয়নের অদৃশ্য করিয়া নিজদিগকে সমাজচ্যুতির শাসন হইতে রক্ষা করে। এখনও রাজপুতনার কোথাও কোথাও এইরূপ কন্যারত্ন তিরোভূত করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও ইহার বহুল প্রচার ছিল। সৎপাত্রে কন্যাদানের উপযুক্ত বর প্রাপ্তির অসম্ভাবনাতেই এইরূপ নির্ম্মম আচরণ করিতে লোকে কুণ্ঠিত হইত না। পুরাকালে রাজপুত্রীদের বিবাহার্থ উপযুক্ত বরের অভাব হওয়াতেই, রাজাদের অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক মহিষীর সমাগম হইত। এক্ষেত্রে ও এইরূপই কিছু সম্ভব হইয়াছিল অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না। হয় তো কোন অভিজাতকুলসম্পন্না শিশুকন্যা, তাহার পিতামাতা কর্ত্তৃক উক্ত কারণে, সদ্যই মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইয়াছিল, আর ঠিক সেই সময়ে রাজা জনক স্বহস্তে লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে সেই লাঙ্গলের অগ্রভাগে উত্থিত এই কন্যাটী পাইয়াছিলেন। লাঙ্গলের ফলাতে যে গর্ত্ত হয়, যাহাকে সীতা বলা হয়, তাহাও অগভীর। সুতরাং মাটির অল্প নীচেই এই কন্যাটি প্রোথিত হইয়াছিল। তারপর রাজা সযত্নে তাহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া সেই মৃতকল্পা কন্যাটীকে শুশ্রূষাদি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করতঃ তাহাকে আত্মজা বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছিলেন। ইহাই সম্ভবতঃ প্রকৃতপক্ষে ঘটনা। আর তাহা হইলেই সীতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত প্রাণীর হস্তে আনীত পায়স ভোজনে গর্ভধারিণী মহিষীর প্রসূত বিষ্ণু অবতার রামের সহিত, একটী ধরিত্রী-উদ্ভবা অযোনিজা কন্যার

সম্মেলন সঙ্ঘটন না হইলে সৌসাদৃশ্য অভাবে রামের অবতারত্বও প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

তারপর এই বীর্য্যশুল্কা অযোনিজা কন্যার বিবাহার্থ পণস্বরূপ যে ধনু স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও আর একটী অলৌকিক পদার্থ। রাজা বলিলেন দক্ষযজ্ঞে মহাদেব যে ধনু ব্যবহার করিয়াছিলেন, দেবতারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া, জনককুল সম্ভূত কোন পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে, সেই ধনু ন্যাসস্বরূপ দিয়াছিলেন, আর তাহাই তাঁহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং উপস্থিত সেই ধনুতেই জ্যারোপণ ও টঙ্কারদানে সমর্থ ব্যক্তিকে সীতা প্রদান করিতে তিনি পণবদ্ধ। সেই ধনুবহনকারী লৌহচক্রসমন্বিত মঞ্জুষাটী, পঞ্চসহস্র দীর্ঘদেহধারী বলবান্ ব্যক্তি অতিকষ্টে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, রাজসভায় আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যেথানেই রামকে বিষ্ণুঅবতার দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই বাল্মীকি 'এক'কে এক সহস্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বাপর আমরা এই রামায়ণের স্থানে স্থানে দেখিতে পাই। সুতরাং সেই হিসাবে যদি আমরা এস্থলেও ধরিয়া লই, যে পাঁচজন লোক এই লৌহচক্র সমন্বিত মঞ্জুষাটী আনয়ন করিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। বস্তুতঃ ধনুখানি অত ভারি ছিল না। তাহা সম্ভবতঃ বংশনির্ম্মিত হইলেও তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাত ৪॥০ হাত হওয়াতে বৃহৎ ছিল। অন্য মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহাতে গুণযোজনা ও টঙ্কার দেওয়া অসম্ভব হইলেও, সেই জনকবংশীয় অন্ততঃ একজন রাজা পূর্ব্বে এই ধনু ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরা এই ইতিহাসের সহিত কাল্পনিক দেবতার সংস্রব বরাবরই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছি, অন্যথা ইহা বহুলোকের অবিশ্বাস্য হইতে পারে। তাই ইহাই অনুমান হয় যে দেবরাত নামক জনকবংশীয় ক্ষত্রিয়

রাজ, দীর্ঘদেহ ও অতিশয় বলবান্ হওয়া প্রযুক্ত, এই বৃহৎ ধনু নির্ম্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেন। পরে তাঁহাদের বংশীয় যে সকল রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ব্যবহার করিতে, শক্তির অল্পতা হেতু, সমর্থ হন নাই। তাই পূর্ব্বপুরুষের গৌরব রক্ষার্থ এই ধনু সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যেমন ইংলণ্ডের প্রথম রিচার্ডের বৃহৎ তরবারি বা রাজপুত রাজ ভীমসিংহের তরবারি এখনও সযত্নে, দর্শকদিগের দর্শনার্থ, সাধারণ প্রদর্শনীগৃহে রক্ষিত হইয়াছে। লেখকেরও একজন খুল্লপিতামহ একটি বৃহৎ কাষ্ঠের মুদ্গর দ্বারা ডাকাত তাড়াইতেন, তাহা তাঁহার পল্লীগৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। মুদ্গরটী, লেখক দীর্ঘকায় ও বলবান হইলেও যুবা বয়সে সহজে আয়ত্ব করিতে পারেন নাই।

যখন চারিদিক হইতে বিশ্রুতা কন্যা সীতার পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজারা আসিতে লাগিলেন, তখন জনক কাহাকে কন্যাদান করিবেন, কে উপযুক্ত পাত্র হইবে ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্ ব্যক্তিকেই সীতা সম্প্রদান করিবেন ইহাই মনন করিয়া সেই অমিতবলশালী পূর্ব্বপুরুষের ব্যবহৃত ধনুকই প্রার্থীদের বীর্য্যপরীক্ষার লক্ষ্যরূপে স্থিত করিলেন। আর সে ধনু বহু পুরাতন হওয়াতে জীর্ণতা প্রাপ্তও হইয়াছিল। সুতরাং তাহাতে রাম টঙ্কারও দিলেন আবার তাহা ভাঙ্গিয়াও গেল। রামও মহাবীর্য্যবান্ ও আজানুলম্বিতবাহু ছিলেন। এই আজানুলম্বিতবাহু সমধিক বীর্য্যবত্তার চিহ্ন। আফ্রিকার গরিল্লাদের বাহু অতিশয় দীর্ঘ ও তাহাতে এত শক্তি যে তাহারা একটা দোনলা বন্দুক হস্তদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, এরূপ অনেক শিকারীর মুখে শোনা যায়।

এই ধনু দেবতা কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইল কেন? সম্ভবতঃ এই ধনু অস্ত্র দৈববশেই দেবরাত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কোনও কিছু আবিষ্কার

দৈবের সাহায্যেই প্রথম হয়। পূর্ব্বতন আদিম মনুষ্যের মধ্যে যিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন তিনি দৈববশেই কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রথম আবিষ্কর্ত্তারা, এইরূপ দৈবাৎ দর্শনের পর নিজ বুদ্ধিবলেই সেই সেই জিনিষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ইহা দেব কর্ত্তৃক ন্যস্ত হওয়া বলিয়া রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত সীতার জন্মের বা রামের ধনুর্ভঙ্গে কোন অলৌকিক বা অমানুষিক কার্য্যের সমাবেশ পাইলাম না। জনক এই ধনু পূর্ব্বপুরুষের আবিষ্কৃত না বলিয়া, শিব কর্ত্তৃক দত্ত শৈবধনু বলিলেন কেন ?"

"তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্ ॥"

শিব অর্থে মঙ্গল। শৈবধনু অর্থে মঙ্গলকারী ধনু। এই ধনু অস্ত্রই তখন আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র ছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষের সেই বৃহৎ মুদ্গর ডাকাত তাড়াবার প্রধান সহায় ছিল বলিয়া তাহাও যেন আমাদের শৈব মুদ্গরই ছিল। দূর হইতে শত্রু নিপাত করিতে, এই ধনুই তখন প্রধান অস্ত্র ছিল। ইয়ুরোপেও বন্দুক আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই ধনুঃশর দ্বারাই যুদ্ধ হইত এবং ইহাই প্রধান অস্ত্র ছিল। পক্ষান্তরে বিষ্ণু অবতার রামের অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্তরূপ নীরস কূট ব্যাখ্যা শ্রুতিমধুর হইবে না। তাঁহারা রামায়ণের আপাতদৃশ্য শ্রুতিমধুর অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশে রামের বিষ্ণু অবতার জ্ঞানেই সুখী হউন।

এপর্য্যন্ত আমরা ইতিহাসের দিক দিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষার্থ যাহা প্রয়োজন সেইরূপ আলোচনাই করিলাম। অতঃপর ইহাতে যে রহস্য নিহিত আছে সেই দিকটা দেখাইবার চেষ্টা করিব। আর সে রহস্যের মূল এই সীতার জন্ম ও ধনুর্ভঙ্গেই নিহিত আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা

ভেদ করা সম্ভবও নহে। আমাদের সেই রহস্যের গন্ধ, এখানেই প্রাপ্ত এবং তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকেই হইয়াছে। জনক বলিতেছেন—

"দক্ষযজ্ঞ বধে পূর্ব্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীল মিদমব্রবীৎ॥
যস্মাৎ ভাগার্থিনো ভাগান্ না কল্পয়তে মে সুরাঃ।
বরাঙ্গানি মহার্হানি ধনুষা শাতয়ামি বঃ।
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রাসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ভবঃ॥
প্রীতিযুক্তস্তু সর্ব্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্।
তদেতদ্দেবদেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ॥
ন্যাসভূতং তথা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভৌ।
অথমে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা তদা॥
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা॥
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা।
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়ং অযোনিজা॥
আত্মানমবধৃতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ॥
রোষেণ মহতা-বিষ্টাঃ পীড্যন্ মিথিলাং পুরীম্।
ততঃ সম্বৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্ব্বশঃ।
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ! ততোঽহং ভৃশ দুঃখিতঃ॥"

ইহার তর্করত্ন মহাশয় কৃত অনুবাদ পূর্ব্বে দিয়াছি। পাঠক তাহা দেখিলে দেখিতে পাইবেন তিনি 'ক্ষেত্রং শোধয়তার' কোন অর্থ করেন নাই। এখানে ক্ষেত্রশব্দের পুনরুক্তি বিনা কারণে হয় নাই। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অর্থ হইতেছে দেহ রূপ ক্ষেত্র এবং তাহার শোধন অর্থাৎ তাহার বিশুদ্ধীকরণ। ভূমিকর্ষণ করিয়া উত্থিতা

হইল যেন আত্মজা মানবী সীতা, আর দেহমন-রূপক্ষেত্র বিশুদ্ধ করিয়া লব্ধ হইলেন বিশ্রুতা অযোনিজা 'শীতা'। মনুষ্য নির্ম্মিত ধনুটঙ্কারে প্রাপ্যা আত্মজা সীতা, আর দেবদেবেশ ভব হইতে প্রাপ্ত ধনুষ্টঙ্কারে লভ্যা অযোনিজা শীতা। ইহাই ঐ শ্লোকগুলির পার্থক্য দেখাইতেছে। এই সীতা ও শীতা শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ কি? এই দুই শব্দের বর্ণের পার্থক্য থাকিলেও তাহারা একার্থবোধক। সীতা, স্ত্রী—সীনোতীতি। সিঞ্‌ বন্ধে+বাহুলকাৎ ক্তা দীর্ঘশ্চ= লাঙ্গল পদ্ধতি। দ্বে লাঙ্গলরেখায়াং সিনোতি খনতি ভূমিং সীতা। শীতা=শেতে ভূবি ইতি শীতা। শি ধাতুশয়নে তালব্যশাদিশ্চ। উভয়ের অর্থই অভিধানে জনকনন্দিনী, রামপত্নী। এই সীতা শব্দ বেদেও লাঙ্গল পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সিনোতি=খনন করিয়া বন্ধন মোচন করা। লাঙ্গলে ভূমি খনন করিয়া যে গর্ত্ত করা হয় তাহাই সীতা আর তাহাতে যে শয়ন করিয়া থাকে তাহাই শীতা। সেই কন্যা সেই ভূমি মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, আর তাহাকে সেই ভূমির বন্ধন হইতে মোচন করা হইল—খনন করিয়া, তাই তাহার নাম হইল সীতা। সুতরাং ভূমির বন্ধন মোচন করিয়া যে উঠিল সেই মানবী সীতা। আর দেহভূমিতে যে শয়ন করে সে শীতা বা দেহপুরে শয়ন করে যে পুরুষ—পুর+শি+ড। পুরুষ দ্রষ্টব্য নহে। তাহাকে তাহার জ্যোতিদর্শনেই অনুমান করা হয়—যেমন সূর্য্যের জ্যোতি দ্বারাই সূর্য্যের দর্শন হয়। মেঘাচ্ছন্ন জ্যোতি-বিহীন সূর্য্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পুরুষ বা আত্মা সূর্য্যের ন্যায় জড়পিণ্ড নহে। তাই তাহার জ্যোতি দ্বারাই প্রথমে তাহার দর্শনজ্ঞান হয়। পরে তাহার অনুভূতি আসে। আত্মদর্শন প্রথমে ঐ জ্যোতি দ্বারাই হয়। তাই সীতা বা শীতা আত্মজ্যোতিঃ। দেহমন শোধিত হইলেই

এই জ্যোতি দর্শন হয়। সুতরাং সীতা অযোনিজা এবং দেহরূপক্ষেত্র ও মন শোধিত হইলেই ইহা লব্ধ হয়। এবং ইহাই বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতিতেই বিশ্রুতা। সুতরাং ক্ষেত্র শব্দের পুনরুল্লেখেই বাল্মীকি-রহস্য প্রকাশিত।

এই ধনু প্রাপ্তিরই দুইরূপে উল্লেখ আছে। প্রথমে দেবতারা পাইলেন দেবাদিদেব ভব হইতে। তৎপরে দেবতাগণ কর্তৃক ন্যস্ত হইল দেবরাতে। ন্যাস অর্থে ত্যাগ। দেবতারা ত্যাগ করিলেন কেন? দেবতারা এই রত্নের মর্ম্ম অবগত ছিলেন না। বানরে মুক্তামালার মূল্য জানে না তাই তাহা ফেলিয়া দেয়। হরের ধনু-যে ধনু দ্বারা হরকে জানা যায়। ইহা সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা হর বা ভবকে জানা যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের পন্থা। ভব যে ধনু ব্যবহার করেন সেই ধনু দ্বারাই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। রিচার্ড কর্তৃক ব্যবহৃত ধনুর জ্ঞান হইলেই রিচার্ডের কথা স্মরণ হয় এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ হয়। দেবতাদের এই ভবের বা আত্মার জ্ঞান হয় নাই। আত্মজ্ঞান হইলে তাঁহারা ভীত হইতেন না। আত্মজ্ঞানী অমৃত। ভব অর্থে যে স্বয়ং ভূ বা অস্তি। যে অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত হয় নাই—অনাদি, অজ সুতরাং পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। তাঁহার আর একটী নাম 'হর'। সমস্ত বিশ্বরূপ সৃষ্টি হরণ করিয়া যিনি একা বিদ্যমান থাকেন বা সমস্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞান হরণ করিয়া কেবল আত্মারূপে যে পরমাত্মা থাকেন তিনিই হর বা হরি। হৃ ধাতু হইতে হর সাধিত। দেবতাদের যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাহা কেনোপনিষদে বর্ণিত আছে।*

---

* দেবতারা অসুর বিজয় করিয়া নিজেদের শক্তি ও মহিমার গর্ব্ব করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্ম যক্ষরূপে শূন্যে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা সেই যক্ষ কে জানিবার জন্য

দেবরাত শব্দের অর্থ কি? দেবং+রাতি। রাতি অর্থে ভোজন করা, যেমন বানং বনজাতফলং রাতি ইতি বানর (অভিধানে এইরূপ ব্যুৎপত্তি আছে)। সুতরাং দেবতাকে যে স্বীকার করে না বা মানে না সেই দেবরাত। দেবতাকে উপাসনা না করিয়া যে দেবেরও দেবতা বা স্রষ্টা সেই দেবাদিদেবকে জানে সেই দেবরাত। ভবকে তিনি জানেন। তাই ভবের ধনু তিনিই প্রাপ্তির উপযুক্ত বা অধিকারী। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ এই 'হর' বা আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অন্যত্র উল্লেখ আছে যে আদিজ্ঞানী মহর্ষি কপিলশিষ্য পঞ্চশিখ দেবরাতের নিকট গিয়াছিলেন। সুতরাং আত্মদর্শী সাংখ্যযোগী পঞ্চশিখের নিকট হইতেই পূর্ব্বতন জনক এই সাংখ্যযোগ শিক্ষা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আর পুরুষানুক্রমে পরবর্ত্তী জনক-

---

জাতবেদা অগ্নিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুমি কে? তোমার ক্ষমতা কি?' তখন অগ্নি বলিলেন, 'আমি সর্ব্বদহ অগ্নি, নিমেষে এই বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারি।' তখন ব্রহ্ম তাহাকে একটী ক্ষুদ্র তৃণ দিয়া বলিলেন 'এই তৃণগাছটী দগ্ধ কর।' অগ্নি সেই তৃণগাছটী দগ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া লজ্জায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বায়ু ব্রহ্ম সকাশে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্ম তাঁহাকে তাহার ক্ষমতা জিজ্ঞাসা করিলেন। বায়ু বলিলেন, 'আমি মাতরিশ্বা—এই বিশ্বের শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য আমাদ্বারাই হয় এবং ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তে এই বিশ্ব উড়াইয়া দিতে পারি। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বায়ু সেই তৃণগাছটী নড়াইতেও না পারিয়া অধোমুখে ফিরিয়া আসিলে, দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রকে তদভিমুখে যাইতে দেখিয়া ব্রহ্ম অদৃশ্য হইলেন। তখন সেই আকাশে বহুশোভমানা হৈমবতী নারী উমার আবির্ভাব হইল। সেই উমা দেবতাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের শক্তির পরিচয় পাইলে তো? এই ব্রহ্মের শক্তিতেই তোমরা শক্তিমান্ হইয়া অসুর বিজয় করিয়াছ।" তখন দেবতাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে মাত্র জ্ঞান হইল, দর্শন হইল

বংশীয় রাজারা এই সাংখ্যযোগের সাধন করিতেন। দেবরাতই এই বংশে প্রথমে ইহা শিক্ষা করেন, তাই তিনি ইহার জনক। আর সেই যোগশিক্ষা পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার বংশধরেরা সকলেই আচরণ করিতেন, তাই উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন তাঁহারা পর পর তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেই সাংখ্যযোগের নিদর্শনরূপ ধনুরই যেন পূজা অর্চ্চনা করিতেন। তাই জনক বংশীয় সকলেই রাজর্ষি এবং এই সাংখ্যযোগের ধারাবাহিক জনক। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এই জনকবংশীয় কোন রাজর্ষির সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

না, কেন না ব্রহ্ম পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই উপনিষদোক্ত হৈমবতী উমাই পুরাণকারের হিমালয়-নন্দিনী পার্ব্বতীরূপে পরিণতা হইয়া শেষে শিবের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন। সুতরাং সেই উমা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। উমা—উং পরমেশ্বরং মাতি মিমেতি। যদ্দ্বারা পরমেশ্বরকে অনুমাপ করা যায় বা মনন করা যায় তাহাই উমা বা তপস্যা। তপস্যা দ্বারা মেনকা কন্যা পাইয়াছিলেন এই জন্য উমা নাম রাখিয়াছিলেন। উং শব্দ পরমেশ্বর বোধক কিরূপে? আমরা অন্যমনস্ক অবস্থায় কোন ব্যক্তি কর্তৃক হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলে (যেমন চিমটি কাটিলে) স্বতঃই প্রথমে বলি উঃ। মৃতদেহে আঘাত করিলে তাহার মুখ হইতে ঐ উঃ শব্দ নির্গত হয় না। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর পৃষ্ঠে আঘাত করিলে সে প্রথমেই উঁয়া করিয়া উঠে। তাই বলিতে হইবে যে সেই দেহে যে আত্মা আছেন, তিনিই এই উ শব্দ দ্বারা তত্তৎ দেহে তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াই যেন বলিতেছেন 'আমি আছি।' সুতরাং উ শব্দ আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞাপক শব্দ। তপস্যা দ্বারাই আত্মার উপলব্ধি হয়। তাই উমা আত্মারূপ পরমেশ্বরেরই অঙ্গীভূতা। হিরণ্যগর্ভ রূপেই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ। "হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে।" তাই ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপক লিঙ্গ বা সংজ্ঞা হিরণ্যবর্ণা বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বা হেমবর্ণা। আর সেই হেমবর্ণে প্রতিভাত উমাই হৈমবতী। হেমবৎ হইতেও হৈমবতী হয় আবার হিমবৎ হইতেও হৈমবতী হয়। তাই উমা শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী।

করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবও তাঁহার পুত্র শুককে এই জনকবংশীয় কোন রাজর্ষির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাভারতেও মাণ্ডব্যজনক, সুলভাজনক, পরাশর জনক সংবাদ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। সুতরাং যখনই আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সেখানেই প্রায় ইহা জনক রাজার সংশ্রবেই কথিত হইয়াছে। এই জনক রাজারা বিদেহরাজ নামেও বিখ্যাত। তাঁহাদের এই বিদেহ নামেরও অর্থ আছে। আত্মলাভেই বিদেহ কৈবল্যলাভ হয়। অর্থাৎ দেহজ্ঞান শূন্য হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাই রামায়ণের স্থানে স্থানে যেখানে সীতাকে অযোনিজা অর্থাৎ আত্মজ্যোতি অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানেই বৈদেহী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বাল্মীকি, রামায়ণে প্রকাশ্যে রাম চরিত্র রচনা করিবেন বলিয়াই ভূমিকা রচনা করিয়াছেন সুতরাং সীতা শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। শীতা শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার রহস্য প্রকাশ করেন নাই! কেবল উল্লিখিত শ্লোক কয়েকটীতেই তিনি অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন। তাহার উদ্ঘাটন পাঠকের দৃষ্টিসাপেক্ষ।

এই জনক এক বৎসর রিপুরাজাদের অর্থাৎ ষড়রিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া আত্মবিশ্বাস হারাইয়া, সাধনাচ্যুত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রিপুর পীড়নে তাঁহার সাধনাচ্যুতি হইয়াছিল "আত্মানমবধূতে" অর্থে আত্মাকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ করিয়া; অবধূত অর্থে সন্ন্যাসাশ্রমী। তারপর বহুতপস্যার ফলে দেবতারা তুষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বল পাঠাইলে তিনি চ্যুতরাজ্য বা পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তপস্যা ও সাধনাদ্বারা তিনি যোগের চতুরঙ্গ-স্বরূপ মন-সংযমাদি শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অধিকারী হইতে সমর্থ হইলে হৃতরাজ্য অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বপদ বা অবস্থা বা রাজর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই ইহার

তাৎপর্য্য। এখন যখন তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট শুনিলেন রাম কামরূপী তারকা বধ করিয়া ছয়দিন একাগ্রচিত্তে ধ্যানস্থ হইয়া (উপাসঞ্চক্রতুঃ) মারীচ ও সুবাহু বধরূপ দুর্দ্দমনীয় যোগবিঘ্নকারক বিক্ষেপশক্তিকেও দমন করতঃ শোণিত নিক্ষেপ রূপ রক্তাভ জ্যোতি দর্শন করিয়াছেন, তখন এই বালব্রহ্মচারীকে বিশ্বামিত্রের অনুরোধে সেই সাংখ্যযোগের উপদেশ দিলেন—এই ধনুর্ভঙ্গরূপ সাধনা দ্বারা। যখন রাম সেই ধনুর্ভঙ্গরূপ দুঃসাধন ক্রিয়া সাধনেও সমর্থ হইলেন তখন তাঁহাকে সেই দুষ্প্রাপ্যা সীতাও সম্প্রদান করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সেই আত্মজ্ঞানে লব্ধ সীতারূপ আত্মজ্যোতিঃ রামেরও দর্শন হইল যেন জনকের দৃষ্ট জ্যোতিই রামহৃদয়ে সঞ্চারিত বা সম্প্রদত্ত হইল। এই জ্যোতিঃ হৃদয়েই দর্শন হয়। তাই ইহাকে আত্মহৃদি জ্যোতি বলে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অন্য জনককে এই আত্মহৃদিজ্যোতির কথাই বলিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যবহারিক পুরুষ কিসের সাহায্যে কার্য্য করে?" তিনি বলিলেন, "আদিত্যের সাহায্যে।" প্রঃ—"আদিত্যের অভাবে কিরূপে হয়?" উঃ—"চন্দ্রমার সাহায্যে।" প্রঃ—"চন্দ্রমা না থাকিলে?" উঃ—"অগ্নির সাহায্যে"। প্রঃ—"অগ্নির অভাবে?" উঃ—"বাকের সাহায্যে।" অর্থাৎ যেমন অন্ধকারে কোন প্রাণীর কথা বা শব্দ শুনিলে লোকে তাহাই অনুসরণ করিয়া তৎস্থানে গমন করিতে সমর্থ হয়। প্রঃ—"বাক্ না থাকিলে কিরূপে হয়।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আত্মহৃদি জ্যোতির সাহায্যেই তখন লোক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে ইন্দ্রিয় অভাবে বাহ্য জ্যোতি সাহায্যে উদ্ভাসিত না হইলেও মনই সমস্ত দিক্ দর্শন করিয়া নিজেই সৃষ্টি করতঃ সুখ দুঃখ উপভোগ করে।" সুতরাং হৃদিস্থিত

আত্মজ্যোতি দ্বারাই আত্মা প্রকাশিত হয়। রামের ধনুর্ভঙ্গরূপ সাধনা দ্বারা কিরূপ আত্মহৃদি জ্যোতি রূপ সীতা দর্শন বা লাভ হইল তাহাই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ধনুর্ভঙ্গ করিতে হইলে তাহা কি প্রণালীতে বা কিরূপ অবস্থায় সাধিত হয়, আমরা প্রথমে তাহাই দেখাইব। রাম ধনুখানি উঠাইয়া তাহা বাম হস্তে ধারণ করিলেন। ধনু অর্থে প্রকাণ্ড বংশ বা নমনীয় কোন কঠিন দণ্ড। তাহার এক প্রান্তে গুণ সংযুক্ত থাকে। এই গুণ প্রায়ই চর্ম্ম বা প্রাণিদেহস্থ শুষ্ক অন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হয় অথবা মার্জ্জিত রজ্জু দ্বারাও তাহা নির্ম্মিত হয়। রাম সেই ধনুর এক প্রান্ত বাম হস্তে ধারণ করিয়া অন্য প্রান্ত তাঁহার পদতলে স্থাপন করিয়া পদতলস্থ প্রান্তসংলগ্ন সেই গুণকে অন্য প্রান্তে যোজন করিলেন। শুধু সরল ভাবে ইহা করিলে ধনুতে কোন শক্তিসঞ্চার হয় না সুতরাং সেই দণ্ডের বাম হস্তস্থিত প্রান্তকে ক্রমে নমিত করিয়া সেই দণ্ডকে বক্র করতঃ তবে তাহাতে রজ্জু বা গুণ সংযুক্ত করিতে হয়। এই বক্রাকার ধনুর গুণেই আঘাত করিলে বা বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে টং শব্দ উত্থিত হয়। সেই জন্য এই ক্রিয়াকে টঙ্কার বলা হয়। এই ধনু দণ্ড, বিশেষতঃ তাহা যদি মনুষ্য দেহ অপেক্ষা দীর্ঘ হয়, তাহাকে নমিত করা অতিশয় শক্তি ও বলের প্রয়োজন। এই ধনু দণ্ডের দৈর্ঘ্য ৫ হস্ত, ৪॥ হস্ত অথবা ৪ হস্ত পরিমিত। নিজ হস্তের ৩॥ হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে, ইহা আয়ত্ত করাও প্রভূত বল প্রয়োগ সাপেক্ষ। রাম যখন সেই ধনুর দুই প্রান্তে তাহাকে বক্র করিয়া, গুণ সংযোগান্তে, টঙ্কার দিলেন, তখন তাঁহার বাম হস্তে সেই ধনুর মধ্যভাগ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই হস্ত যতদূর সম্ভব সরলভাবে বিস্তার করিয়াছিলেন, আর তাঁহার দক্ষিণ হস্ত

মধ্যস্থলে বক্র হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। যেমন ধনুর মধ্যভাগও ক্রমে ক্রমে অধিক বক্র হইল, তেমনি দক্ষিণ হস্তস্থিত গুণও মধ্যস্থলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে বক্রাকার হওয়াতে ধনুটী যেন একটী চতুর্ভুজ আকার ধারণ করিল। এরূপ অবস্থায় ধনুদণ্ডটী মধ্যস্থলে ভাঙ্গিলে তাহার দুই প্রান্ত এক স্থানেই মিলিত হয়। আর তাহা ধনুর্ধারীর বক্ষের মধ্যস্থলেই হয়। অর্থাৎ রাম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট ধনুর প্রান্তদ্বয় যেন রামের বক্ষঃস্থলের মধ্যদেশেই, তাহার ভগ্ন অবস্থায় স্থিত হইল। ইহাই স্বাভাবিক। পাঠক ধনু দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এখন আমরা এই ধনুর্ভঙ্গের প্রণালীর সহিত যোগাচরণের প্রণালীর সাদৃশ্য আছে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। যোগসাধনে উপবিষ্ট হইবার সময় পদ্মাসনে বসিয়া দেহের মেরুদণ্ডকে সরল ভাবে স্থিত করিয়া গ্রীবা ও মস্তককেও সরল করিতে হয়। তখন মস্তক সহিত এই মেরুদণ্ড কটিদেশ পর্য্যন্ত একটী সরল দণ্ডের মতই হয়। তারপর প্রাণায়াম করিয়া, অর্থাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বায়ু গ্রহণ করিয়া তাহাকে অভ্যন্তরে স্থিরভাবে ধারণ করিতে পারিলে কুম্ভক সাধন হয়। এই কুম্ভকও স্থায়ী করিতে পারিলে কটিদেশে একটী কম্পন অনুভূত হয়, আর সেই কম্পনের সহিতই একটী আভাযুক্ত তেজ যেন বিদ্যুৎ আভার ন্যায় প্রকাশিত হয়। মন তখন সেইদিকে ধাবিত হয়। আবার শিরোদেশে ভ্রূমধ্যেও কিঞ্চিৎ কম্পনের সহিত সেইরূপ বিদ্যুৎ আভা দর্শন হয়। প্রথমতঃ কুম্ভক অবস্থায় এই ভ্রূমধ্যেই জ্যোতি দর্শন হয়, তৎপরে সেই কটিদেশস্থ শক্তি ও জ্যোতি দর্শন হয়। এই কটিদেশস্থ শক্তিকেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কহে। ইহাই ক্রমে উর্দ্ধগামী হয়। আবার ভ্রূমধ্যস্থ জ্যোতিও

নিম্নগামী হয়। কখনও যুগপৎ ক্ষণিক এই দুই জ্যোতি দর্শন হওয়াতে তাহারা যে উভয়ে পৃথক, তাহা বুঝা যায়। ইহা যদি দুই পৃথক স্থানে আবির্ভূত হয় ও ক্ষণিক ও যুগপৎ দৃষ্ট হয়, তবে ইহাদিগকে আত্মজ্যোতিঃ বলিয়া স্বীকার করিলে, আত্মাও তাহা হইলে দ্বিভাগে দুইস্থানে স্থিত আছে, এইরূপ অনুমিত হয়, এবং আত্মার অংশ বা ভাগ আছে ইহাই স্থির হয়। কিন্তু আত্মা তো একই, তাহার অংশও নাই, খণ্ডও নাই। সুতরাং এই দুই স্থানই তাহার প্রকৃত স্থিতিস্থান নহে। তাহার স্থিতিস্থান অন্যত্র প্রমাণিত হয়। আত্মাও তাহার জ্যোতি দ্বারাই প্রকাশিত। সুতরাং দেহাভ্যন্তরেও এই জ্যোতির প্রকাশও আত্মা দ্বারাই হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে মনই এই দুই স্থানে নিবিষ্ট হওতঃ আত্মার চিৎশক্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া, যেন আত্মাই দুই স্থলে প্রকাশিত বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ মন তাহার বহির্গমনের দ্বারের নিকট থাকিয়াই, সেই দ্বার সমূহের দ্বারা, বাহিরে উঁকিঝুঁকি দিবার জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা করে। এই মনের বহির্গমনের দ্বারগুলি আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। তন্মধ্যে ৪টী ইন্দ্রিয় ও ত্বকের কিয়দংশ এই মস্তক দেশেই স্থিত। সুতরাং এই দ্বারবৃন্দ সমন্বিত মস্তকরূপ বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ভ্রূমধ্যেই, মনের ক্রিয়া করিবার প্রিয় স্থান। তাই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ হইলে অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিলে, মন রুদ্ধ বাষ্পের ন্যায় কম্পিত হয়। আর কম্পনেই তেজ বা জ্যোতিঃ উদ্ভূত হয়। মনে তখন আত্মার সমস্ত চিৎশক্তি পুঞ্জীভূত হয়। তাই সেই চিৎ প্রকাশক জ্যোতি ভ্রূমধ্যে মানস নয়নে উদ্ভাসিত হয়। তার পরই সেই কটিদেশের শক্তি উত্তেজিত হয়; এবং তাহাতে যে আভা আবির্ভাব হয় তাহা মন অনুভব ও দর্শন করিতে পারে। এখন মনকে,

এই দুই জ্যোতি অনুসরণ করিয়া একটী সাধারণ স্থানে স্থিতি লইয়া স্থির হইতে হইলে, তাহাকে উপর হইতে নীচে নামিতে হয় ও নীচ হইতেও উপরে উঠিতে হয় এবং এক মধ্যস্থানে মিলিতে হয়। যাহাকে ইংরেজীতে বলে Meet halfway। আর এই মিলন স্থলই হইল দেহের মধ্যস্থানে নাভির সন্নিকট হৃদয়স্থিত প্রদেশ। যখন হৃদয় স্থানে বা দেহের মধ্যস্থানে এই জ্যোতির্দ্বয় মিলিত হইল, তখন তাহাদের যেন ক্ষণিকের জন্য তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই, আর একটী স্বপ্রকাশ জ্যোতি নিজ বিভাতে সেই স্থানকে বিভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল। ইহাই আত্মহৃদিজ্যোতির প্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ ক্রমে বর্দ্ধমান হয়। মনস্থির করিলে, মন ইহাতেই একাগ্র হইয়া ক্রমে ইহাতেই লীন হয়। ইহা কুম্ভক অবস্থাতে সাধিত হয়। যেমন কুম্ভের অভ্যন্তরে বদ্ধবাষ্প স্থির হইলে আর কুম্ভ নড়েনা তেমনি এই দেহের অভ্যন্তরে রুদ্ধ বায়ু স্থির হইলে এই দেহরূপ কুম্ভও স্থির হয়, মনও স্থির হয়। তাই ইহার নাম কুম্ভক। তখন দেহের পোষণার্থ যে বায়ু চলাচল করে, তাহা মনের অজ্ঞাতেই হয়। কেননা মন তখন ঐ জ্যোতিতেই একাগ্র হয়। তখন আর তাহার দেহজ্ঞানও থাকে না। সে তখন ঐ জ্যোতি দর্শনেই তন্ময়। তাহার দেহজ্ঞান থাকিলে, তাহার নিশ্বসিত বায়ুর বহির্গমন না হইলে বিশেষ অস্বস্তি অনুভূত হয়। এইরূপ অস্বস্তি হইলে মন সেইদিকে আকৃষ্ট হয়, জ্যোতিও তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়। ভ্রূমধ্যে সেই দৃষ্ট জ্যোতি অনুসরণ করিয়া, তাহাতে একাগ্র না হইতে পারিলে কুম্ভক সাধনও হয় না। তাই পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের ভ্রূমধ্যে লৌহ শলাকা আঘাত করিয়া আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ তোতাপুরী বলিয়াছিলেন "আরো ক্যা মা মা করতা হ্যায়, হিঁয়া দেখো।" ইহা আমি আমার কোন অতিবৃদ্ধ আত্মীয়, যিনি

ঠাকুরের নিকট প্রায় তাঁহার প্রথম সাধনাবস্থার কাল হইতেই সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শেষাবস্থাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট শুনিয়াছি।*

ইহাই দেহধনুর সহিত রামকৃত ভগ্ন ধনুর, যথাযথ সৌসাদৃশ্য। এক ধনুর্ভঙ্গের উপমা ভিন্ন আর কোন উপমা দ্বারা ইহা প্রদর্শন করান যায় না। ধনুরই দণ্ডের মধ্যভাগ ও গুণের মধ্যভাগ সজোরে বিস্তীর্ণ করিলে তাহার প্রান্ত ভাগদ্বয়ও, সেই ধনুর্ধারীর বক্ষঃস্থলের মধ্যেই যথাক্রমে নিম্ন হইতে উপরে উঠিয়া ও উপর হইতে নিম্নে নামিয়া, এক স্থানে মিলিত হয়। আবার যখন সমস্ত শক্তি প্রয়োগে হস্তদ্বারা ঊর্দ্ধপ্রান্ত ও পদ দ্বারা নিম্নপ্রান্ত সংযত করিতে হয়, তখন এই উভয় অঙ্গই কম্পিত হয়, ও মনকেও :এই উভয় স্থলেই সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে একাগ্র করিতে হয়। শক্তি সমস্ত শরীরেই থাকে। কিন্তু মনের সাহায্যেই তাহাকে যথা-স্থানে বা অঙ্গে প্রয়োগ করিতে হয়। জনকের এই ধনুর নাম সুনাভ ধনু। বিশ্বামিত্র রামকে বলিয়াছিলেন, "চল, মিথিলাতে জনক রাজার সুনাভ ধনু তোমাকে দর্শন করাইব"। ইহাকে সুনাভ বলিবার তাৎপর্য্য কি? যে ধনুর নাভি সু বা শ্রেয়স্কর তাহাই—সুনাভ। ধনুর

---

* ইনি পরমহংসদেবের গৃহস্থ শিষ্য ৺কিশোরীলাল রায়, বনহুগলিতে ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৯৫ বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার গুরুদেব তিব্বতী বাবাও আমাকে প্রথমে এই উপদেশ দিয়া মনের একাগ্রতা সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। তারপর তিনি প্রাণের উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাণের উপাসনা অর্থাৎ মনকে প্রাণে স্থির করা। প্রাণ অর্থে হৃদয়। অর্থাৎ মনকে সেই হৃদয়ে একাগ্র হইয়া স্থির করিতে হয়। এই হৃদয়ে প্রাণকে স্থির করিতে হইলে, সেই জ্যোতি দ্বয়ের অনুসরণ করিয়া, আর তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হৃদয়ে পৌছিতে হয়।

মধ্যভাগেই তাহার শক্তি নিহিত। যে ধনু সহজে বক্র হয় না তাহারই শক্তি বেশী। আর তাহাতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয় তাহাতেই বেশী দূরের লক্ষ্য ভেদ হয়। যাহার মধ্যভাগ সহজে নমনীয় তাহা দ্বারা কি দূরস্থ পদার্থ বিদ্ধ হয়? সুতরাং সেইরূপ ধনু ব্যবহারই শ্রেয়স্কর। এইরূপ ধনুতে টঙ্কার দিতে হইলে অসাধারণ শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি নাভি প্রদেশেই আত্মার স্থিতি স্থান জ্ঞানীদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে এই নাভি প্রদেশে আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তাহারই দেহদণ্ড সু হয় বা সুনাভ হয়। তাহারই শ্রেয়ঃ লাভ। আর এই আত্মজ্ঞান লাভই নিশ্রেয়সঃ-যোগিগণের প্রাপ্য লক্ষ্য। মেরুদণ্ডের সম্মুখ ভাগেই, মধ্যস্থলে স্থিত এই নাভি। টঙ্কৃত ধনুর মধ্যস্থলেই যেন তাহার নাভি। আর সেই মধ্যস্থলেই শর যোজিত হইলে, সেই শরের লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার শক্তি হয়। তাহার এই নাভিতে বা মধ্যস্থলে শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে, তাহার প্রান্তদ্বয়কে শক্তি সহকারে নমিত করিয়া ধনুকে বক্র করিতে হয়। তেমনি দেহদণ্ডরূপ ধনুর দুই প্রান্ত যেন নমিত হইয়াই তাহার মধ্যস্থলে বা নাভিতে মিলিত হয়।

বিশ্বামিত্র রামকে ইতঃ পূর্ব্বে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন তাহার মনের একাগ্রতা সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইবার উপযুক্ত মনে করিয়া সেই বিশ্রুত বংশপরম্পরায় সাংখ্য যোগে-সিদ্ধ, আত্মজ্ঞানী রাজর্ষি জনকের নিকট উপদিষ্ট হইবার জন্য লইয়া যাইলেন। তিনি নিজেও যখন ইহা লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনিও এ উপদেশ রামকে দিতে পারিতেন! কিন্তু তিনি যে রামের সাহায্যেই নিজে সিদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং সেই সহায়কেই পুনঃ তাহা শিক্ষা দিতে শ্রেয়স্কর মনে করিলেন

না। আর তাঁহার সে জ্ঞানও সন্তঃপ্রাপ্ত, কেননা মাত্র পূর্ব্ব দিবসেই তিনি সিদ্ধ হইয়া রামকে বলিয়াছিলেন তোমার সাহায্যেই আমি সিদ্ধ হইয়াছি। তিনি কি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন রাম তাহা জানেন না। আর তিনি তখনও তাহাতে দৃঢ় অভ্যস্ত হন্ নাই। তাই বহুকালে অভ্যস্ত পারদর্শী রাজর্ষি জনকের নিকটেই লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া, জনক রামকে অধিকারী বিবেচনা করিয়াই তাঁহাকে (রামকে) সেই ধনু প্রদর্শন করাইলেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের প্রণালীর উপদেশ দিলেন। উপযুক্ত গুরু, উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকেই, সেই প্রণালীর, উপদেশ দান করেন। শিষ্য তাহা নিজে চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারাই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে আত্মদর্শী কোন গুরুই শিষ্যকে আত্মদর্শন করাইতে পারেন না। তাঁহারা মাত্র নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ প্রণালীই বলিয়া দেন। এই আত্মদর্শন একবার লাভ করিলেই তাহা যে আমরণ চিরস্থায়ী থাকে না তাহার দৃষ্টান্তও ঐ জনকের মুখেই বিবৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেন তিনি রিপুরাজাদের পীড়নে এক বৎসর পীড়িত হইয়া, সাধনাচ্যুত হইয়াছিলেন। পুনরায় বৎসরাবধি তপস্যা ও সাধনা দ্বারা যখন যোগোচিত চতুরঙ্গ বল প্রাপ্ত হইলেন তখনই তাঁহার পূর্ব্ব রাজর্ষিত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা যে রামের জীবনেও সঙ্ঘটিত হইতে পারে তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেলেন। রামের পক্ষেও যে তাহা ঘটিয়াছিল তাহাও বাল্মীকি দেখাইয়াছেন। তিনি মারীচকে বাঁচাইয়া, তাহার পথ করিয়া রাখিলেন। বিশ্বামিত্র এই জনকগৃহে রামের সিদ্ধির পর, তপশ্চরণার্থ হিমালয় প্রদেশে চিরতরে নিজকার্য্য সাধনে অন্তর্হিত হইলেন। রামায়ণে আর তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। বাল্মীকি বিশ্বামিত্র সাহায্যেই রামের সাধনা শিক্ষা দেখাইলেন।

এই জনক প্রদর্শিত যোগ সাধন প্রণালীকে সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত করিবার কোন হেতু বা সূত্র এই বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও আছে কি? ইতঃপূর্ব্বে কোন স্থানে তিনি আদিজ্ঞানী মহর্ষি কপিলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে অগস্ত্য ঋষির কথাও বলিয়াছেন এবং রাজর্ষি দেবরাতের উল্লেখও আছে। কপিল ঋষির আবির্ভাবের সময় নির্ণীত হয় নাই। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের শেষের দিকেই পুরুষ সূক্ত ও দেবীসূক্তেই তাৎকালিক সেই বক্তা ঋষিদের আত্মজ্ঞান উদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্‌বেদের বক্তা ঋষিদের মধ্যে প্রথম অগ্নি ইত্যাদি উপাসক হইতে শেষে আত্মা উপাসক রূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি হইতে যে কত শত বৎসর লাগিয়াছিল তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। শেষোক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরাই প্রকৃত আদিজ্ঞানী। আর মহর্ষি কপিলও আদিজ্ঞানী অর্থাৎ কাহারও নিকট উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়াই স্বীয় অনুভূতি বলেই জ্ঞানী। তাই এই বোধ হয় তিনিও ঐ ঋগ্‌বেদের আত্মজ্ঞান প্রকাশক বাক্যের বক্তা ঋষিদের সমসাময়িক। মহর্ষি কপিলকৃত সাংখ্য সূত্র। তিনি যে যোগপন্থা দেখাইয়াছেন, তাহাই আবার মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে বিশদরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তারপর বাল্মীকি এই ধনুর্ভঙ্গ উপাখ্যানে একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন ঐ অষ্টচক্র সমন্বিত মঞ্জুষার উল্লেখ করিয়া। রাবণের শক্তিশেলকে অষ্টঘণ্টা সমন্বিত বলিয়াছেন। রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি বর্ণনা পড়িলে ইহাই অনুমিত হয় যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাগুলি উল্লেখ করিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই সংখ্যাগুলি উল্লেখের গুরুত্ব উপলব্ধি ও তাহার যথাযোগ্য সমন্বয় করিতে পারিলেই আমরা সাংখ্যযোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব।

এই অষ্টচক্রের কথা বলিয়া তিনি অষ্টধা প্রকৃতিকেই লক্ষ্য

করিয়াছেন। সুতরাং যে সমস্ত পাঠক সাংখ্যশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবল তাঁহাদিগের জন্যই আমরা সাংখ্যমতের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই স্থানে বলিতে বাধ্য হইলাম। যখন অধুনাতন প্রায় প্রত্যেক গৃহেই নারী পুরুষ গীতার নানারূপ ভাষ্যাদি সমন্বিত ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহারা তাহাতে উল্লিখিত প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেকের গীতা পাঠের ফল হইয়াছে তাঁহাদের কৃষ্ণ ভগবানের মূর্ত্তিকে ফল, পুষ্প তোয় দানে পূজার পরিণতি রূপে। তাঁহাদের ভগবানোক্ত মে, মাম্, মহ্যং শব্দের মর্ম্মও ঐ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির চরণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের নিকট, এই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষের মর্ম্মও অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িবার ন্যায়ই চিরতমসাচ্ছন্ন থাকারই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে গীতা পাঠে তাহার মর্ম্ম অনেকেই যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, বা তাহার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। এরূপ বলাতে আমাদের ধৃষ্টতা হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং বিবেকানন্দ বলিয়াছেন কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে, তাহা উপলব্ধি না করিলে, তাহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। বেদ বেদান্ত, গীতা প্রভৃতির শ্রবণে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে আর তাহা উদ্গীরণ বা তাহার তর্ক বিতর্ক আলোচনা শুধু পাণ্ডিত্যের নিদর্শন মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। নিজে উপলব্ধি না করিলে কেবলমাত্র পরের উপদেশে কোন বিষয়ের সত্যতা বিষয়ে কেহ কি নিশ্চিত হইতে পারে? একজন এইরূপ বলিল, পরক্ষণেই আর একজন অন্যরূপ বলিল। মহর্ষি কপিলও আদিজ্ঞানী আত্মদর্শী, মহর্ষি ব্যাসও বেদ উপনিষদাদি পাঠে ও স্বীয় অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা জ্ঞানী। এই দুই জ্ঞানী ব্যক্তি যদি দুই

প্রকার বলেন তাহা হইলে কাহার কথা বিশ্বাস করিব? মহর্ষি কপিলের সাংখ্য মতের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অদ্বৈত বেদান্তমতের পরিবর্ত্তন হইয়া দ্বৈত ভাগবত ধর্ম্ম বা ভগবৎ পূজায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং কোন্ পথ শ্রেয়স্কর তাহা কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে? এই দ্বিধা বা সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তখন মনে বিচার শক্তির আবির্ভাব হয়। তখন তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া মন সেই সত্যবস্তুরও উপলব্ধি করিতে কৃতকার্য্য হয়। যে মহাত্মা প্রকৃতই আত্মসত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সেই এক আত্মার কথাই বলিবেন, শিষ্যের তাহা উপলব্ধি হউক বা না হউক। উপযুক্ত অধিকারীকেই এইরূপ মহাত্মারা শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। আর তাহাদেরই দ্বিধা-ভঞ্জন হইয়া যায়—সেই আত্মজ্ঞানী গুরুর মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ বলে। কেহ তাঁহার শিষ্য হউক বা না হউক তাহাতে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। আমার গুরুদেব তিব্বতীবাবা এই শ্রেণীরই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি শিষ্যের উন্নতির কিছু লক্ষণ দেখিলে তাহাকে তাঁহার পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিতেন না বা কেহ তাঁহার প্রসাদ চাহিলে বলিতেন, 'প্রসাদ কাহার? তুমি আবার কাহার প্রসাদপ্রার্থী হইবে? তোমাতে আমাতে তো সেই একই আত্মা বিরাজমান, সুতরাং তোমাতে আমাতে উচ্চ-নীচ ভেদ থাকিলেই তো একজন উচ্চের প্রসাদ একজন নীচের প্রার্থিত বস্তু হইতে পারে?"

বেদান্তমতে সৃষ্টি মনের কার্য্য। সুতরাং মন লয়ে সৃষ্টির অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দুই শব্দ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ মনের ব্যবহারেই সৃষ্টি দৃশ্যতঃ বর্ত্তমান। আর সেই ব্যবহারের নিরাশেই সৃষ্টি অদৃশ্য; তখন শুধু পরমার্থ বা পরমাত্মাই

থাকেন। সৃষ্টিও, মনের নাশেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। আর মায়ার অধ্যাসেই, মরুতে মরীচিকার ন্যায়, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তির ন্যায়, এই বিশ্ব পরিলক্ষিত হয়। বেদে বা উপনিষদে কোথাও ঠিক বৈদান্তিকের মায়ার ন্যায় মায়া শব্দের ব্যবহার নাই। বেদে আছে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (ঋ, ৬।৪৭।১৮)

এ মায়া বিশ্বসৃষ্টির কর্ত্রী মায়া নহে। ইহা ইন্দ্রেরই নানারূপ রূপ পরিবর্ত্তনের হেতুরূপ মায়া। ইন্দ্র তখন কেবল দিবিতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে উপাসিত হইতেন এবং তাঁহারই নানারূপ বিভূতি, অগ্নি, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি রূপে প্রকাশই তাঁহার মায়া। তৎপরে সেই বৈদিক ঋষিদেরই কেহ জ্ঞানের উচ্চমার্গে আরোহণ করিয়া বলিলেন

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাঅহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥"

অর্থ=তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। সেইজন্য (অন্য) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ এই ভেদও ছিল না। রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোনও সাধন (প্রকেত) ছিল না। (যাহা ছিল) তাহা একমাত্র আপন শক্তি (স্বধা) দ্বারাই বায়ু বিনা শ্বাসোচ্ছ্বাস করিত অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিমান্ হইত। তাহা ব্যতীত কিম্বা তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না। এই স্বধা শব্দের অনেক অর্থ হয়। স্বং দধাতি ইতি স্বধা অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে ধারণ করিয়াছিলেন। তারপর আর এক অর্থ হয় স্বাং দধাতি। এখানে স্ত্রীলিঙ্গ আর একটী পদার্থ ধারণ করা বুঝায়। এই অর্থে মায়ার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু তিনি একই ছিলেন। তাঁর কোন লিঙ্গ ছিল না। আর একটী কিছু সত্তা ধারণ করিলে তিনি দ্বিধা

হইবেন। আবার স্বাদয়েতি অনেন ইতি স্বধাও করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা দ্বারা আস্বাদ করা হয় তাহাই স্বধা অর্থাৎ মায়া দ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়া আস্বাদ করিতেন। ইহার মধ্যে কোনটা মুখ্য ও কোনটা গৌণ অর্থ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? তাহা হইলে মায়া কোথা হইতে আসিল? মোট কথা তিনি একাকীই ছিলেন। বহু হইতে ইচ্ছা হইল। "একোঽহং বহু স্যাম্।" আমি একা আছি বহু হইব। তাহা হইলে যখন আর দ্বিতীয় কিছু ছিল না তখন তিনিই নিজ সত্তা হইতে বহু সৃজন করিয়াই সৃষ্টিরূপে বিকশিত হইলেন। তিনি যে আছেন, তখন তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, কেন না এই দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট বিশ্ব, যাহা তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, বিদ্যমান আছে এবং সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমি আছি ইহাতো আমি উপস্থিত প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার মৃত্যুর পর আমার অস্তিত্ব থাকে কি না তাহা তো আমি বলিতে পারি না। অন্যের মৃত্যু দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হয় যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমারও অস্তিত্ব থাকিবে না। ট্রাম গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। আমরা আকাশে ঐরূপ বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখিয়াছি বলিয়াই বলিতে পারি উহাও বিদ্যুৎ। যিনি এই বিদ্যুতকে ধরায় আনিয়া তাহা দ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইতেছেন, তিনি আকাশে বিদ্যুৎ অদৃশ্য হইলেও তাহার অস্থিত্ব আছে জানিয়াই তাঁহার গবেষণার দ্বারা এতদূর পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন-যে এখন আমরা সমস্ত কার্যাই প্রায় বিজলি সাহায্যে করিতে পারি। সুতরাং আমার যদি অস্তিত্বই না থাকিল, আমি যদি মায়ার অধ্যাসে ভ্রান্তিই হইলাম, তাহা হইলে আমার অস্তিত্ব অন্বেষণ চেষ্টাও বৃথা। তাই সাংখ্য মত প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিল নিজের অস্তিত্ব এবং সৃষ্ট

বিশ্বের অস্তিত্ব, তাহা ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহা যে তৎক্ষণে অস্তি বা আছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, তাঁহার অনুভূতি দ্বারা বিশ্লেষণ করতঃ যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধি দ্বারাই এই স্থূল দেহ কিরূপ স্তরে স্তরে সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া শেষে বুদ্ধিরূপেই পরিণতি প্রাপ্ত হয় তাহাই, তিনি নিজ অনুভূতি সাহায্যে সংখ্যা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাই ইহার নাম সাংখ্য। এই বুদ্ধি দ্বারা যে পর্য্যন্ত দর্শন সম্ভব তাহাই বক্তব্য হইতে পারে। তার পর যে অবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। আবার বেদান্ত মতে সৃষ্টির বা বিশ্বের রচনা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া এই সাংখ্য মতেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কপিল ঋষির নিকট ঋণী। তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং কপিল ঋষি যে প্রণালীতে তাঁহার অনুভূতির সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই সত্য, এবং মনুষ্যও সেই প্রণালী অবলম্বনে সাধনা করিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াও তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে। আর সেই প্রণালীই সাংখ্য যোগ। এখন এই সাংখ্য যোগে কি পর্য্যন্ত সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বলিব। কিন্তু তাহার শেষ কোথায় তাহা মহর্ষি কপিল ব্যক্ত করেন নাই।

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই জগতের মূল কারণ ও উপাদান। উভয়েই স্বয়ম্ভু ও অনাদি। প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। তখন প্রকৃতি অব্যক্তা ও অপ্রকাশিতা। এই তিন গুণের অসাম্যাবস্থা হইলেই তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রকৃতি জড় অচেতনা। জড় পদার্থের ন্যায় তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। সে পুরুষের চিৎশক্তিতেই ক্রিয়াক্ষমা হইয়া আবার পুরুষকেই তাহার

সহিত লিপ্ত হইতে আকর্ষণ করে। যেমন রঙ্গমঞ্চে নটী নানারূপ সুবেশ ধারণ করিয়া, দর্শকগণকে, তাহার হাবভাবে, নৃত্য গীতাদি দ্বারা বা করুণ রসাদি আপ্লুত বাক্যচ্ছটায় মোহিত ও তত্তৎভাবাপন্ন করে, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষকে তাহার সত্ব, রজঃ তমো গুণাদি উদ্ভূত নানারূপ বিচিত্র কার্য্য দ্বারা মোহিত ও তত্তৎভাবাপন্ন করে। যতক্ষণ প্রকৃতির এই আকর্ষণ সমভাবে থাকে, ততক্ষণ পুরুষ সেই ভাবাপন্ন অবস্থাতে থাকা প্রযুক্ত যেন নিজেই সুখ, দুঃখ তাপ ভোগ করে। তখন সে রঙ্গমঞ্চের দর্শকের ন্যায় মুগ্ধ অবস্থাতে থাকে। অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া কোন কোন দর্শক অশ্রুপাত বা অন্য বিসদৃশ পাদুকা নিক্ষেপাদি করিয়া থাকে। তাহারা সেই ভাবাপন্ন না হইলে এরূপ কার্য্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। পুরুষেরও তদ্রূপ অবস্থা হয়। প্রকৃতি তাহার তিনগুণের সাহায্যে অষ্ট প্রকারে বিকৃত হইয়া ব্যক্ত হয়। তাহার এই ব্যক্তির বা প্রকাশ হইবার ধারা অষ্টপ্রকার। যথা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ রূপ সূক্ষ্মগুণ। ইহা হইতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

"শব্দরাগাৎ শ্রোতমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ।
রূপরাগাৎতথাচক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া॥"

অর্থাৎ প্রাণীর আত্মার শব্দ শুনিবার ইচ্ছা হইলে পর কর্ণ, রূপ দেখিবার ইচ্ছায় চক্ষু, গন্ধ আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছা হইলে নাসিকা উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট উপায়েই প্রকৃতি পুরুষকে অভিভূত করে। পুরুষ এই অভিভূত অবস্থায় চিরকাল থাকিলে তাহার মুক্তি হয় না। কিন্তু সেই রঙ্গালয় হইতে, মুগ্ধ দর্শক, নিষ্কাশিত হইয়া যখন নটীর স্বরূপ বুঝিতে পারে এবং নিজে যে ক্ষণতরে মুগ্ধ হইয়াছিল

জানিয়া তাহার আত্মগ্লানি হয়, তখন তাহার আত্মনির্ভরতা ফিরিয়া আসাতে সে প্রকৃতিস্থ বা আত্মস্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং নিজকে স্বাধীন মনে করে, তেমনি পুরুষ যখন বুঝিতে পারে সে প্রকৃতি হইতে পৃথক এবং প্রকৃতি কর্তৃক মুগ্ধ হইয়াই, তাহারই প্রভাবে সুখ, দুঃখ ও তাপে মোহিত হইয়াছিল, তখন তাহার এই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা হয়। আর সেই চেষ্টা বা ইচ্ছাকে মুমুক্ষু অবস্থা বলে। পুরুষের নিজের স্বরূপ প্রাপ্তিই এবং তাহাতে স্থিতিই তাহার মুক্তি, কৈবল্য বা একাকিত্ব। আমরা ইহা বেশ জানি যে এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং প্রকৃত আমি এই দেহাত্মক আমি নহি। কেননা শবদেহ তো 'আমি' বলিতে পারে না! কিন্তু যতক্ষণ এই দেহে জীবাত্মা থাকাতে ইহা জীবিত থাকে ততক্ষণ সেই বাল্য হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লোকে বলে "আমি ইহা করিতেছি, আমার দেহটা ভাল নাই" ইত্যাদি। সুতরাং সেই আমি যে বলায়, সেই আমি যতক্ষণ দেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই দেহ আমার দেহ থাকে। এই "আমি"ই সেই জীবাত্মা বা পুরুষ, —কেননা দেহ পুরেই সে শয়ন করিয়া থাকে। তাই লোকে সাধারণতঃ বলে 'দেহ হইতে আত্মা পুরুষ চলিয়া গিয়াছে'। মৃতদেহ পোড়াইলে কেহ 'আমি' বলেনা; কিন্তু জীবিত দেহে অগ্নি সংযোগ হইলেই বলে "উঃ পুড়ে মরলেম।" সুতরাং এই দেহ যে পদার্থে জীবিত থাকে সেই জীবই ইহার কর্ত্তা। আর জীবরূপী আত্মাই এই দেহস্থিত পুরুষ। পুর+শী+ড। শী ধাতুর অর্থ শয়ন করা। যেমন গিরিতে যে শয়ন করে সে গিরিশ।

এই পুরুষেরও যে সময় সময় মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, তাহা এই দেহ দ্বারাই মনুষ্যের অনুভূতি হয়। যেমন বদ্ধ আবৃত

ভাণ্ডে, অন্নসিদ্ধ হইবার সময় তাহার অভ্যন্তরস্থ রুদ্ধ বাষ্প, যতই আকারে বর্দ্ধিত হয় ততই বহির্গমনের জন্য সেই ভাণ্ডের উপরিস্থিত আবরণকে মধ্যে মধ্যে উত্তোলন করিয়া নিষ্কাশিত হয়, তেমনি আমাদের আত্মা পুরুষও সময়ে সময়ে এই দেহ ভাণ্ডরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে আমাদিগকে প্রেরণা দেয়। ভাণ্ড জড় পদার্থ, সে তাহার অভ্যন্তরের বাষ্প চাপ (Pressure) অনুভব করিতে পারে না; আমরা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন অনুভবক্ষম প্রাণী, আমাদের সে চাপ সময় সময় উপলব্ধি হয়। যাহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম বা যাহার কিছু বিবেক জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেই তাহা অনুভব করিতে বা সোজা কথায় ধরিতে পারে—যেমন ঋষি ষ্টিভেন্‌সন্ বাষ্পের চাপ সম্বন্ধে অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া এত বড় একটা অদ্ভুত ষ্টিমএন্‌জিন রূপ বাষ্পীয় রথ আবিষ্কার করিলেন। সেই বাষ্পের ক্ষমতা বা শক্তি যে কতদূর তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমরাও যদি আমাদের অভ্যন্তরে স্থিত কোন শক্তিধারীর শক্তিতেই যে আমাদের এই দেহ চালিত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে তাহার অন্বেষণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে। একটী স্প্রিং বিহনে সমস্ত ঘড়িটী সমস্ত আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদি সহ অক্রিয় বা অকেজো হয়। যদি সেই স্প্রিংটী প্রাপ্তব্য পদার্থের সীমার মধ্যে থাকে, তবে তাহা সংগ্রহ করিয়া, সেই ঘড়িটীকে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থ করিতে পারি। কিন্তু দেহরূপ ঘড়ির স্প্রিংরূপ আত্মাটী একবার এই দেহ ছাড়িয়া গেলে, ঐ স্প্রিং প্রাপ্তির অভাবে সেই অকেজো ঘড়ির ন্যায়ই তাহা পরিত্যক্ত হয়।

সাংখ্যমতে এই দেহ, প্রকৃতির উপাদানে নির্ম্মিত, আর সেই প্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষ তাহাকে চিৎশক্তি দানে কার্য্যকরী

করিতেছেন—অর্থাৎ তাহাকে যেন চেতাইয়া দিতেছেন—যেন অচল গাড়ীর চাকাকে ঠেলিয়া দিতেছেন। যে পুরুষ এই প্রকৃতির বেষ্টনী হইতে, স্বীয় মহিমা উপলব্ধি করিয়া, স্বীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতঃ, নিজে মুক্ত হন্ সেই পুরুষই পাতঞ্জলীর ক্লেশ, কর্ম্ম বিপাকাশয় রহিত নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা বীজসম্পন্ন পুরুষ। এই পুরুষের দর্শন লাভই আত্মদর্শন বা স্বরূপসিদ্ধি। ইহাই সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষের কৈবল্য বা স্বাধীনতা লাভ। সাংখ্যশাস্ত্রে, এই অবস্থাতে পরিণতি লাভ করিতে যে পর পর অবস্থা হয়, তাহাই সংখ্যা করিয়া বা গণনা করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। সংখ্যা কথা হইতেই সাংখ্য শব্দ উৎপন্ন। প্রথমে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ চক্ষুকে যেন অন্ধই, কর্ণকে বধিরই, নাসিকাকে ভোঁতাই, জিহ্বাকে অরুচিই, চর্ম্মকে যেন গণ্ডারের চামড়া করিয়াই, ইন্দ্রিয়গুলির বোধশক্তি রোধ করিতে হয়। ইহাদিগকে রুদ্ধ করিতে হইলে মনকে অন্য বিষয়ে লিপ্ত করিতে হয়। কিন্তু চঞ্চল মন বাহিরের কোন পদার্থের সংস্পর্শে না আসিতে পারিলে, তাহার অন্যরূপ নানা চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বুদ্ধির সাহায্যেই তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে বার বার লিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এখন ধ্যেয় বিষয় একটী জ্ঞাত বিষয় না হইলে মন তাহার ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞাত বিষয়ে মন লিপ্ত হইতে পারে না। তাই পতঞ্জলি বলেন—"ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা।" অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করিয়া এই ঈশ্বর প্রণিধানরূপ একটি উপায়ও বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরের উপাসনা বা তাহার পূজা করা নহে—তাহার সর্ব্ব অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া। ঈশ্বর কি, তাহাই জানা নাই। তাহার প্রণিধান কিরূপে করা সম্ভব? তারপর বলা

হইল এই ঈশ্বর ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয় হইতে মুক্ত পুরুষ বিশেষ। আর তাহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার বীজ আছে। অর্থাৎ তিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ। বুঝা গেলনা সর্ব্বজ্ঞ কিরূপ অবস্থা। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহার উপলব্ধি অসম্ভব। তাহা হইলে এখনও ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর বলা হইল "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" প্রণব অর্থাৎ ওঁ শব্দ তাঁহার বাচক বা সংজ্ঞাজ্ঞাপক। বেশ, ওঁ ওঁ করিয়া তাহাকে ডাঁকা গেল—কিন্তু তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার প্রণিধানও হইল না। এখন পুরাণকার বলিলেন অ-উ-ম্, এইরূপে ডাক। অ-উ-ম্ জপ করিয়া গলা ভাঙ্গিল কিন্তু ঈশ্বরের সাড়া পাওয়া গেল না। অ-উ-ম্ তিন অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর ধারণা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাক। বলা গেল ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর কে, তাহাও তো জানা নাই, সুতরাং এই তিন অক্ষরে তাঁহাদিগকে কিরূপে ধারণা করা যাইবে? কেন বাপুহে! তুমি তো চিত্রে বা বর্ণনায় তাঁহাদের তিনজনের পৃথক্‌:পৃথক্ রূপ দেখিয়াছ বা অবগত আছ সেইরূপই ধারণা করনা কেন? তাঁহাদের রূপ যে ঐরূপ বর্ণিত রূপই তাহাই বা স্বীকার করিতে যাইব কেন? আবার তাঁহাদের তিনজনকে ধ্যান করিলে তিনজন ঈশ্বরের ধ্যান করা হইল। তাহা হইলে তো তাঁহারা তিনজন বিভিন্ন পুরুষ হইলেন, এবং তাঁহাদের রূপ ও আকৃতি ও দেহ বিভিন্ন হওয়াতে তাঁহারা পৃথক্ স্থান ব্যাপিয়া স্থিত। সুতরাং একের স্থিতিস্থান অন্যের অপরিজ্ঞাত হওয়াতে তাঁহাদের কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইল না। যে সর্ব্বজ্ঞ হইবে সে একাই হইলে এবং একাকীই সর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া সর্ব্বগত হইলে তবেই তাহার সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়। সুতরাং পাতঞ্জলীর ঈশ্বর ইঁহাদের কেহ নহেন। এমতাবস্থায় তাঁহার প্রণিধানও বিফল। ইহার

পর আর উত্তর আছে কি? পুরাণকার এইখানেই নিস্তব্ধ। তারপর উপনিষদ বলিলেন অ-উ-ম্ দ্বারাই ঈশ্বর প্রণিধান হইবে এবং তাহার উপায় আছে। আত্মা তিন অবস্থাতে দেহপুরে বাস করেন—জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাঁহার এই তিন অবস্থা। অ-জাগ্রত অবস্থা, উ-স্বপ্নাবস্থা ও ম্-সুষুপ্তি অবস্থা। বুঝা গেল না—এই তিন অক্ষরের পরিবর্ত্তে অন্য তিন অক্ষরেই বা তাঁহার সেই তিন অবস্থা ব্যক্ত হইবে না কেন? বাপুহে! অ-উ-ম্ যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা কর, তখন নিজেই ইহার উত্তর পাইবে। যখন যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে অভ্যস্ত হওয়া গেল, তখন দেখা গেল 'অ' উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠ দুইটী বিস্ফারিত হয় আর তাহা জাগরিত অবস্থাতেই হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে আঘাত করিলে সে জাগ্রত হইয়াই 'অ' উচ্চারণ করে। তারপর সেই 'অ'র সহিতই 'উ' উচ্চারণ করিলে ওষ্ঠ দুইটী সঙ্কুচিত হয়—যেন শব্দ ভিতরের দিকেই টানিয়া লওয়া হইতেছে। আর সেই সময় জাগ্রতের বিস্ফারিত নয়নও যেন ভিতরের দিকেই আকর্ষিত হয়। শিশু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে রোদনের শব্দ যখন ক্রমে মৃদু হইয়া তাহার তন্দ্রার আবেশ হয়, তখন ঐ 'অ' শব্দ 'উ'র ন্যায় পরিণত হয়, ও ক্রমে 'ম্' শব্দে পরিণত হইলে শিশু নিদ্রাভিভূত হয়। একটানা 'উ' শব্দ করিয়া 'ম্' শব্দ করিলে, সেই উভয়শব্দ যেন অভ্যন্তরের দিকেই যায়, এবং মুখ বন্ধ হইলেও এই ম্ অভ্যন্তর হইতেই উত্থিত হয়। তাহা হইলে যে শব্দ প্রথমে বাহিরে যাইতেছিল তাহাই ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া 'উ' হইয়া শেষে 'ম্'এ পরিণত হইল। 'উ' উচ্চারণ সময়ে অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা—ইন্দ্রিয় নিদ্রিত হয় কিন্তু মন জাগ্রত থাকে। এই জাগ্রত ও নিদ্রার মধ্য অবস্থাই স্বপ্নাবস্থা। আবার নিদ্রা বা

সুষুপ্তির পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই 'ম্' শব্দই যেন শোনা যায়। ম্ শেষ হইলেই গভীর নিদ্রা, ইহা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অ-উ-ম্ শব্দ যখন অভ্যন্তর হইতেই আসিতেছে ও যাইতেছে তখন এই শব্দকারীর সেই অভ্যন্তর ভিন্ন আর কোথায় থাকা সম্ভব?

বিজ্ঞান বলিবে, যে বায়ু নিশ্বসিত হইয়াছিল তাহাই বাহিরে আসিবার সময় কণ্ঠসংলগ্ন পর্দ্দাদ্বয়ে (vocal chord) আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া 'অ' শব্দরূপে পরিণত হয়, আবার নিশ্বসিত বায়ু অভ্যন্তরে যাইবার সময় সেই দুই সঙ্কুচিত পর্দ্দাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই 'উ' শব্দ উত্থিত হয়। এই নিশ্বাস ক্রিয়ার সময় বায়ুর গতি মুখ ও নাক উভয়পথেই চলাচল করে। মুখ বন্ধ করিলে যে ম্ শব্দ হয়, তাহা নাক বন্ধ করিলে, বন্ধ হয়। সুতরাং ইহা বায়ু দ্বারাই সাধিত হইতেছে। আত্মা দ্বারাই বা তাহার কর্ত্তৃত্বে ইহা হইতেছে সে সিদ্ধান্ত টিঁকিল কোথায়? গর্ভ হইতে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু আপাতদৃষ্টিতে স্পন্দহীন, সুতরাং মৃত, অথচ তাহার দেহে কোন পূর্ব্বে মৃত্যুর চিহ্ন নাই। শিশু কাঁদে না সুতরাং মৃত। অনেক চেষ্টার পর শিশু "উঁয়া" করিয়া উঠিল। আর তখনই তাহার নিশ্বাস ও প্রশ্বাস আরম্ভ হইল। নূতন জীব কি তাহাতে চিকিৎসক দ্বারা প্রবিষ্ট করান হইল? ইহা কি সম্ভব? সুতরাং তাহাতে জীবাত্মা ছিলেন—যেন নিদ্রিতই ছিলেন। সেই শিশুর দেহে আঘাত করাতেই যেন তিনি জাগরিত হইয়া 'উঁয়া' বলিয়া প্রকাশ হইয়াই, যেন বলিলেন "আমি আছি' 'আমি আছি"—এই দেহে যেন সুপ্ত অবস্থাতেই ছিলাম; আমার মন, আমাতেই লয় হইয়াছিল—যেন উর্ম্মিবিহীন স্থির সমুদ্রের ন্যায়; এখন সেই আঘাতে আমা হইতে, বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের ন্যায়, সেই মনই জাগ্রত হইল।" আত্মার গতি অবস্থাই—এই তরঙ্গাকারে চঞ্চলতা

রূপ-মন। এখানে কিন্তু দেখা গেল সেই অ-উ-ম্ শব্দ বিপরীতভাবে ম্-উ-অ রূপে উৎপন্ন হইল। এখনও কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে এই আত্মাই, ঐ শব্দ উচ্চারণের কর্ত্তা? উপনিষদের ঋষি যাহা স্বীয় অনুভূতিতে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন, পুরাণকারদের মত তাঁহারা কল্পনার আশ্রয় লন নাই। তাহ'লে অ-উ-ম্ উচ্চারণকারী—আত্মাই।

এখন এই শব্দ উচ্চারণকারীকে, তাহার কৃত শব্দ অনুসরণ করিয়াই ধরিতে হইবে। নিবিড় অন্ধকারে, মনুষ্যের শব্দ শুনিয়া, তাহা অনুসরণ করিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতে শুনিতে যাইতে পারিলেই তবে শব্দ উচ্চারণকারীকে ধরিতে পারা যায়। সেই শব্দ ভিন্ন আমার কর্ণে কিছুই প্রবেশ করিতেছে না—যেন সেই শব্দেই আমি তন্ময়। সুতরাং মনকে সর্ব্বদাই জাগরিত রাখিয়া তাহার জ্ঞান শক্তি অটুট রাখিতে হইবে। স্বপ্নাবস্থায় মন জাগ্রত থাকে, কিন্তু তখন তাহা দেহজ্ঞান শূন্য। মন তখন স্বাধীন, ইচ্ছামত বিচরণ করে; তখন তাহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারের সাহায্যে বাহির হইতে হয় না; সে তখন সর্ব্বব্যাপী হয়; নিজেই নির্ম্মাণ করে নিজেই ভাঙ্গে। তারপর যখন সুষুপ্তি অবস্থা আসে তখন মনও অচেতন হয়, আর তাহার কোনও জ্ঞান শক্তি থাকে না। সুতরাং সে অবস্থার কথা তাহার স্মরণ থাকে না। এখন এই মনকে শাসনে আনিয়া, তাহাকে সচেতন বা জাগ্রত রাখিয়া নিদ্রার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই আত্মদর্শন। এই মনের শাসন, বুদ্ধি দ্বারাই হয়। নিদ্রাতে মনের লয় হয়। এই অবস্থাতে, তাহা হইলে মনেরও লয় হইলে, আত্মদর্শন করে কে? মন লয় হইলে থাকে বুদ্ধি; এই বুদ্ধিতেই আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় আর সেই বুদ্ধিই আত্মদর্শন করে। তাহা হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে এই অবস্থায় প্রকৃতির প্রধান বা প্রথম

বিকার বুদ্ধি ও আত্মা উভয়েই তখন থাকে। তাহা হইলেই দেখা গেল বুদ্ধিরূপ প্রকৃতি বিকার ও আত্মারূপ পুরুষ উভয়ই পৃথক্। এই বুদ্ধি নির্ম্মল সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইলেই নির্ম্মল আত্মাতে মিশাইয়া যায়, যেমন স্বচ্ছস্ফটিকে কোন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। স্বচ্ছস্ফটিকের উপরে জ্যোতি পড়িলে তাহা স্ফটিক ভেদ করিয়া যখন তাহার অপর পার্শ্বেও প্রসারিত হয়, তখন স্ফটিকের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না সমস্তটাই যেন জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতি ও স্ফটিক অভেদাকারেই বোধ হয়। স্থতরাং এই বুদ্ধিও স্বচ্ছ হইলে তাহাও আত্মার জ্যোতিতেই মিলিয়া যায়—যেন প্রকৃতির বিকৃত অবস্থা বা তাহার গুণের কিছু বিরূপপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্ত অবস্থা বুদ্ধি, পুনরায় প্রকৃতির স্বরূপ অবিকৃত অবস্থা বা স্বচ্ছ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতেই মিলিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রকৃতি পুরুষেরও ভেদ থাকে না। একখানি কাচ যেন প্রকৃতির বুদ্ধি বিকারের সূক্ষ্মাবস্থা। এই কাচে যদি অন্য কোনও পদার্থ সংলগ্ন না থাকে তাহা হইলে তাহাতে কোন প্রতিবিম্ব ফলিত হয় না। অন্য পদার্থের সংযোগ সাহায্যেই কাচ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে। একখানি অতিবৃহৎ কাচের সেই দ্বিতীয় গুণযুক্ত পদার্থ দ্বারা লিপ্ত অংশটুকুই বৃহৎ প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত প্রথম বিকৃত অবস্থার ব্যক্তি—এই বুদ্ধিরূপে। বুদ্ধি সত্ত্বগুণান্বিত হইলে, তাহার অংশ পরিমাণ তখনও থাকে, স্থতরাং সেই অংশপরিমাণ আত্মাকেই, সে অনুভব করিতে পারে। অর্থাৎ দেহ পরিমিত বুদ্ধি, দেহ পরিমিত আত্মারই উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু সেই বুদ্ধি, যখন তাহার সেই সত্ত্বগুণও শূন্য হয়, তখন সে অব্যক্ত বৃহৎ ভূমা প্রকৃতিতে পরিণত হয়, আর আত্মাও তখন সেই বুদ্ধি দ্বারা পরিমিত না হওয়াতে তাহার ভূমা অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির যে শেষ বন্ধন বুদ্ধি তাহাও তাহার থাকে না। তখন বদ্ধ

বাষ্পের বিস্তীর্ণাকাশে ব্যাপ্তির ন্যায়, আত্মাও বিস্তীর্ণ আকাশরূপেই বিস্তীর্ণ হয়। এই অবস্থায় বুদ্ধি মন কিছুই না থাকায়, তাহার স্মৃতি, কে লইয়া ফিরিয়া আসিবে? তাই এই অবস্থা অননুভবনীয়-যোগির সমাধি অবস্থা, বুদ্ধের নির্ব্বাণ অবস্থা।—তাই মহর্ষি কপিল এই অবস্থার কথা কিছু বলেন নাই। তাঁহার শেষ অনুভবনীয় অবস্থা—ঐ প্রকৃতির প্রথম ব্যক্তি-বুদ্ধি একদিকে, আর আত্মা আর এক দিকে। এই পর্য্যন্ত ভেদের শেষ সীমা সংখ্যা করিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পর্য্যন্তই যোগীরও অভ্যাসে অনুভবনীয় অবস্থা—যাহা অধ্যবসায় সহকারে, যোগোচিত আচরণ ও সাধনা দ্বারা কঠোর অভ্যাসের ফলে, আরণ্যক সন্ন্যাসী ও পক্ষান্তরে রাজর্ষিদের বা বশিষ্ট যাজ্ঞবল্ক্যাদি গার্হস্থাশ্রমাবলম্বী ঋষিদের ন্যায়, এই কলিযুগের সন্ন্যাসী বা গৃহস্থেরও প্রাপ্য হইতে পারে। তাই আমাদের গুরুদেব গৃহস্থ শিষ্যদিগকে তাঁহার উপদেশদানে বঞ্চিত করেন নাই। ইহার ফলপ্রাপ্তি বা সিদ্ধি লাভ সেই শিষ্যের আচরণ ও অভ্যাস এবং অধ্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। তিনি বলিতেন "মনকে হাতে রাখিয়া, জাগ্রত ও নিদ্রার সন্ধিস্থানে লক্ষ্য রাখিও। জ্ঞানের অবস্থাতেই নিদ্রার অবস্থা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা ও অভ্যাস করিও।" ইহা অমূল্য উপদেশ। এইরূপ অভ্যাস বা সাধনাতে সিদ্ধ হইতে পারিলেই যোগী আত্মদর্শনে সিদ্ধকাম হয়। সাংখ্যযোগ শাস্ত্র পাতঞ্জলীতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বাল্মীকিও এই গার্হস্থাশ্রমী রামের সাধন পন্থাই তাঁহার রামায়ণে দেখাইয়াছেন। আমরা অনধীত সাধারণ পাঠকের জন্যই, এই সাংখ্য যোগশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশমাত্র আলোচনা করিলাম। অধীত পাঠকের হয়তো ইহা বিরক্তিকর হইতে পারে।

এক্ষণে আমরা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ দেখাইয়া, রামের

এই ধনুর্ভঙ্গের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। বাল্মীকি বলিয়াছেন—

"নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে কথঞ্চন।"

অতি দীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চাশত শত লোক অতিকষ্টে যে অষ্টচক্র সমন্বিতা মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। এখানে বাল্মীকি পঞ্চ সহস্র না বলিয়া পঞ্চাশত শত বলিলেন। তিনি তাঁহার চিরাচরিত এককে এক সহস্র বলিবার ধারা কেন পরিত্যাগ করিলেন? পঞ্চাশত বা পঞ্চাশ, পঞ্চবিংশতি বা পঁচিশের দ্বিগুণ। তাহারা চক্র সমন্বিত মঞ্জুষা টানিয়া না আনিয়া স্কন্ধে বহন করিয়া আনিল, কেন না তাহাকে নড়াইতে পারিল না। তাহার এক এক দিকে ২৫০০ পঁচিশ শত লোক তাহাকে বহন করিয়াছিল। সুতরাং এই পঁচিশ কথাটীই এখানে প্রয়োজনীয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতির ২৪ তত্ত্ব হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি। সেই ২৪তত্ত্ব যথা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই একুনে ২৪। আর পুরুষ ১। এই পঁচিশতত্ত্ব। পুরুষ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জড় প্রকৃতির সহিত একস্থানেই অবস্থিত, কেননা তাহারা উভয়েই অনাদি ও স্বয়ম্ভু। যেমন পিতা ও মাতার কোষাণু একত্রিত হইয়া থাকে। তাহাতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া বহু কোষাণু উৎপাদনে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়; নিষ্ক্রিয় হইলে অণ্ড সৃষ্টি হইত না। পিতার কোষাণু ও মাতার কোষাণু উভয়েই পঞ্চভূতের উপাদান রূপ প্রকৃতি ও জীবাত্মা রূপে আত্মাসন্নিবিষ্ট থাকে। উভয়েরই কারণ ও উপাদান একই রূপ। একটী জীবিত একটী মৃত থাকিলে ক্রিয়া উৎপাদন হইতে না পারায় ভ্রূণ গঠিত হয় না। সুতরাং এই উভয় কোষাণুতেই প্রকৃতি ও পুরুষ

সাম্যাবস্থায় থাকে। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যদি আর ক্রিয়া না করে তাহা হইলে তাহাদের সাম্যাবস্থায়স্থিতি হয়। এই প্রকৃতি ও পুরুষের একত্রে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতির প্রতিকৃতি ঐ মঞ্জুষাটী। আবার সেই অবস্থাতে পুরুষের চিৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়াবতী হইলে প্রকৃতির গুণের অসামঞ্জস্যে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃতির জড়ত্ব বেশ বুঝা যায়। মাতার কোষাণু তাহার আধারেই (Ovary) তাহার উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তাহার নিজের চলিবার যেন শক্তি থাকে না। জরায়ুর উভয়পার্শ্বে তাহার হস্তস্বরূপ যে কোমল নলদ্বয় আছে, তাহাই বক্র হইয়া তাহাদের যেন অঙ্গুলিসমষ্টিযুক্ত প্রান্ত দ্বারাই, সেই কোষকে গ্রাস করিয়া তাহার (নলের) অভ্যন্তরের ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া, নিজ শক্তিতেই তাহাকে জরায়ুর অভ্যন্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু পিতার কোষাণু নিজ শক্তিতেই জরায়ুর ছিদ্রাভ্যন্তর দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই পূর্ব্বেস্থিত মাতৃকোষাণুর সহিত মিলিত হইয়া তাহার কার্য্য আরম্ভ করে, আর তার ক্রমবর্দ্ধন জন্য সেই মাতৃরূপী প্রকৃতিই উপাদান প্রদান করে। এই মঞ্জুষার অষ্ট অচল চক্র তাহার অষ্ট বিকারের অব্যক্ত অবস্থার সূচক। পুরুষ নিষ্ক্রিয় বিধায়, তাহার চিৎশক্তিতে চেতিত হইয়া সচল না হওয়াতে তাহারা যেন জড়পদার্থের ন্যায়ই প্রতীয়মান। চক্র অচল হইলে প্রকৃতিও অচল। চক্র চল হইলেই গাড়ী চলে। কেননা প্রকৃতি জড়। একটী চক্রের ঘূর্ণন কার্য্য প্রকাশ হয় অন্য কোন শক্তির দ্বারা—সেই ঘূর্ণনই তাহার কার্য্যের ব্যক্ত অবস্থা বা বিকৃতি। গোল কোন পদার্থ যতক্ষণ ঘূর্ণিত না হয় ততক্ষণ তাহার চক্রত্ব উপলব্ধি হয় না। এই মঞ্জুষা রূপ প্রকৃতির এক এক পার্শ্বে

চারি চক্র থাকাতে তাহা অষ্টচক্রা। সুতরাং এই পঁচিশ তত্ত্ব সমন্বিত ২৫ রূপ দুই পার্শ্ব যুক্ত পদার্থটীকে টানিতে হইলে বা বহন করিতে হইলে ২৫×২ বা তাহার দ্বিগুণ লোকের প্রয়োজন। এই পঁচিশ তত্ত্ব অষ্ট প্রকারেই বিকৃত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই অষ্টপ্রকার বিকৃতিই যেন ইহার অষ্টচক্র। একমণ ওজনের একটী পদার্থের যদি দুইদিকে দুইটী চাকা থাকে আর তাহা বহন করিতে যদি দুইদিকে দুইজন লোকের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ২৫ মণ ওজনের পদার্থটী বহন করিতে ২৫×২=৫০ জন লোকের প্রয়োজন হয়। এই পঞ্চাশত সংখ্যার নির্দ্দেশ থাকাতেই এই মঞ্জুষাটী যে ২৫এরই প্রতিকৃতি তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সেই প্রকৃতির অব্যক্ত বিকারকে ব্যক্ত করিতে হইলে পুরুষের চিৎশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, বা নিদ্রিতবশতঃ তাহার চিৎরূপ শক্তিও নিষ্ক্রিয়। কাজেই সেই মঞ্জুষার চক্র ঘুরাইতে না পারিয়া, এই পঞ্চাশত শত লোক তাহাকে তদবস্থাতেই বহন করিয়া লইয়া আসিল। তাহারা তাহার দুই পার্শ্বে সমানভাবে বিভক্ত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া আনিল। মোটরগাড়ীর চক্র যখন তাহার অক্ষের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া ঘুরিতে পারে না, তখন তাহা ঠেলিয়া না আনিয়া বহু লোকের স্কন্ধে বা অন্য বৃহৎ গাড়ীতে স্থাপিত করিয়া স্থানান্তরিত করিতে হয়। এখানেও তদ্রূপ অবস্থাই হইয়াছিল। সেই ২৫ রূপ মঞ্জুষা যেন ২৫ তত্ত্ব সমন্বিত প্রকৃতির মূর্ত্ত প্রতীক ইহাই এই বর্ণনার তাৎপর্য্য। যখন সেই মঞ্জুষা সভাস্থলে আনা হইল তখন রাম, বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সেই মঞ্জুষা হইতে ধনু উত্তোলন করিলেন। প্রকৃতিই যদি ঐ মঞ্জুষা হয়, তাহা হইলে গুণ সমন্বিত ধনুটী কি? ধনু অর্থে শুধু

তাহার দণ্ডই নহে। দণ্ড ও তাহার গুণ একত্র অবস্থাতেই ধনু নামে কথিত হয়। তাই বলা হয় ধনুর গুণ। সেই মঞ্জুষাতে এই ধনুদণ্ড সরলভাবে তাহার শিথিল গুণ সংযুক্ত হইয়া শায়িত অবস্থায় ছিল—যেমন রজ্জু কোন স্থানে পড়িয়া থাকিলে শিথিল বা 'এলমেল' ভাবে থাকে। ধনুর নিম্নপ্রান্তে প্রথম গুণসংযোগ করিয়া তাহা পদদ্বারা স্থির করিয়া, সেই গুণকে টানিয়া ধনুর অন্য প্রান্ত নমন করিয়া তাহাতে সংযুক্ত করিতে হয়—যেন শিথিল গুণকে টানিয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করা হয়। তারপর সেই গুণকে আরও আকর্ষণ করিয়া তাহা ছাড়িয়া দিলে বা তাহাতে আঘাত করিলে টং শব্দ হয়। ঐ টং শব্দ উত্থিত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহাতে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে,। দীর্ঘদিবস পীড়িত রোগী কথা বলিতে পারে না, তাহার কিছু 'শক্তির' সঞ্চার হইলেই সে কথা বলিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই গুণ যেন টং শব্দ করিয়াই জানাইল তাহার যথেষ্ট শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। এখন ধনুটা কি? শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে মৃতকল্প অবস্থায় দেখিলে ধাত্রী বা চিকিৎসক তাহার পৃষ্ঠে বা মেরুদণ্ডে আঘাত করে। সেই মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াই শিশু রোদন করে। তাহা হইলে ঐ মেরুদণ্ড হইতেই তাহার রোদনের শক্তি উত্তেজিত হইয়াছে। দেহের এই মেরুদণ্ড হইতেই তাহার সর্ব্বস্থানে শক্তি সঞ্চালিত হয়। সেই মেরুদণ্ডের মধ্যেস্থিত পুঞ্জীভূত রজ্জুর ন্যায় স্নায়ুসমষ্টি হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া সমস্ত দেহে, ত্বক্ হইতে আনখাগ্র বিকীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যেই প্রত্যেক স্থানে অনুভূতিরও কার্য্য করিবার শক্তির সঞ্চার হয়। এই ধনুর দণ্ডই যেন প্রকৃতির মেরুদণ্ড। যেন তাহাই প্রকৃতির দেহরূপ মঞ্জুষার

অভ্যন্তরে তাহার মধ্যস্থানে ছিল। আমাদের শরীরেরও মধ্যস্থানে এই মেরুদণ্ড স্থিত। ধনুর বক্রাকারে দুই প্রান্তে গুণ সংযুক্ত করিয়া তাহা আরও আকর্ষণ করিলে, তাহা হইতে নিক্ষিপ্ত শর যে শক্তি প্রাপ্ত হয় তাহা ঐ গুণেরই শক্তি। গুণের আকর্ষণেই গুণের শক্তিসঞ্চার হয়। তেমনি প্রকৃতির গুণসমূহও নাড়াচাড়া খাইয়া অসামঞ্জস্য প্রাপ্ত না হইলে তাহাদের কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। এই গুণই যেন তাহাকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচলিত করিয়া যেন তাহাকে নমন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। যেমন বল্গার চালনে অশ্ব গতিশীল হয় তেমনি এই গুণগুলি দ্বারা প্রকৃতি চালিত হয়। একটী লোকের প্রকৃতি বা তাহার স্বভাব কি তাহা জানা নাই। তাহাকে আঘাত করিলেই যদি তাহার ক্রোধের উদয় হয় তাহা হইলে বুঝা যায় সে রজপ্রকৃতির লোক। সে আঘাত পাইয়া প্রতিআঘাত দিতে উদ্যত হয়। বালিরাশি একস্থানে পড়িয়া আছে, তাহাতে কিছু দ্বারা আঘাত করিলে সেই বালিরাশিই চারিদিকে উৎকীর্ণ হইয়া আঘাতকারীকে বিব্রত করে। আঘাত দ্বারা পাপোষ ঝাড়িবার সময় ইহা প্রত্যক্ষ হয়। সেই বালিই ঘনীভূত অবস্থাতে তমআকারে ছিল, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ছিল, তাহাই আবার রজআকারে চলচ্ছক্তি সম্পন্ন হইল। তাই রজ বা ধূলিকণার দৃষ্টান্তে এই গুণকে রজ বলা হইয়াছে অর্থাৎ যাহা চলে। জল তরল অবস্থায় নিশ্চল, তম বা ঘনীভূত অবস্থায় তাহা পাষাণ সদৃশ কঠিন শিলা বা প্রস্তর। আবার তাহাই বাষ্পাকারে চলচ্ছক্তিসম্পন্ন। এখন সেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি যদি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী না হইয়া প্রত্যাঘাতের পরিবর্ত্তে ক্ষমা করে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতি

সত্ত্বগুণান্বিত, কেননা তাহাকে সৎলোক বলা হয়। আবার সে যদি সেই আঘাতকারীকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লয় তাহা হইলে তাহাকে অত্যন্ত তমোগুণান্বিত বলা হয়। তাহার কি পাষাণ হৃদয়! পাষাণ হৃদয় না হইলে একটী জীব কারণ বা বিনা কারণে হত্যা করা যায় না। আক্রমণকারী ব্যাঘ্রকে হত্যা করা তমোগুণ নহে, কিন্তু ভয়ে পলায়িত বা শাবককে স্তন্যদানে রত ব্যাঘ্র হত্যা করা পাষাণ হৃদয়ের পরিচয়। পাষাণ বা প্রস্তরের রং কাল, আর তম অর্থেও অন্ধকার বা কাল। তাই যে গুণে লোক পাষাণ হৃদয় হয়, তাহাকেই তমোগুণ বলা হয়। যাহার অতিনিদ্রার স্বভাব, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া যে কেবল নিদ্রাই উপভোগ করে, তাহাকেও তমোগুণান্বিত বলে। পাষাণে আঘাত করিলে যেমন তাহা সহজে ভগ্ন করা যায় না, তেমনি অতি নিদ্রাগ্রস্ত লোককে জাগরিত করা দুরূহ। লোকটা পাহাড়ের মত ঘুমুচ্ছে বলা হয়। তাহা হইলে দেখা গেল এই গুণগুলি যেমন লোকের প্রকৃতি অর্থাৎ প্র-সম্যক প্রকারে কৃতি বা কার্য্য-করণ উদ্রিক্ত করে, এবং তাহাদের স্বভাব প্রকাশ করে, তেমনি স্থষ্টির মূল উপাদান রূপ পদার্থকে এই গুণগুলিই উদ্রিক্ত করিয়া তাহার কার্য্যকরণ প্রকাশ করে। তাই সেই মূল উপাদানকেই প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই মূল সত্ত্বাটীই প্রকৃতি। শুধু উপাদান দ্বারা কোনও পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তাহাকে বিবিধরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে একটা শক্তিরূপ কারণের প্রয়োজন। সেই শক্তিই হইল পুরুষের চিৎশক্তি। এই চিৎশক্তি দ্বারা যেন চেতিত হইয়াই প্রকৃতি কার্য্য করে।

আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম এই মঞ্জুষাটী তাহারা অষ্টচক্রসহ যেন অষ্টধা প্রকৃতি, আর তাহার মধ্যস্থলে স্থিতধনুটী

তাহার মেরুদণ্ড ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট গুণ তাহার সাম্যাবস্থ একত্রীভূত গুণত্রয়। পুরুষ সেই প্রকৃতির ধনুতে শক্তিপ্রদান করিয়া তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া থাকে। বাল্মীকি বলিলেন,

পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহ্নাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্ম্মাত্মা সলীল মিব তদ্ধনুঃ॥
আরোপয়িত্বা মৌর্ব্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্বভঞ্জ ধনুর্ম্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ॥”

সেই ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সাধন দ্বারা তাহার ফলরূপ আত্মাধারণকারী (আত্মদর্শী) রাম যেন তাঁহার দেহস্থ পুরুষের লীলার ন্যায়ই, সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করতঃ তাহাকে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিয়া শুধু টঙ্কারই দিলেন না, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ রাম সেই প্রকৃতির ধনুতেই যেন গুণ সংযোগ করিয়া সেই গুণকে টানিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিলেন; পরে তাহাকে টঙ্কার দিয়া তাহাতে যেন তাঁহার চিৎশক্তি প্রদান করিয়াই তাহাকে কার্য্যকরণোন্মুখী করিলেন, এবং তাহার কার্য্যে নিজে অভিভূত না হইয়া, তাহার মেরুদণ্ডরূপ ধনুর্ভঙ্গ করতঃ তাহাকে আবার নিষ্ক্রিয় করিয়া, একাকীই রহিলেন। রাম, ২৫ তত্ত্বের পরিণামে উৎপন্ন এই দেহরূপ প্রকৃতিতে স্থিত তাঁহার নিজদেহের—ধনুরূপ মেরুদণ্ডে, যোগস্থিত হইয়া, চিত্তের একাগ্রতা সাধন করতঃ, সেই দেহের মেরুদণ্ড রূপধনু ভাঙ্গিয়া, দেহরূপ প্রকৃতির কার্য্য হরণ করিয়া অর্থাৎ দেহজ্ঞানশূন্য হইয়া, সেই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত আত্মহৃদি জ্যোতিতে চিত্ত লয় করিলেন এবং নিজেকেই সেই পুরুষরূপে উপলব্ধি করিলেন—প্রকৃতিকে যেন পরিত্যাগ করিয়াই, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া, কেবল বা স্বাধীন হইলেন। এই ধনু যে তাঁহার দেহস্থিত ধনু তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তিনি

'সলীলমিব' যেন লীলা করিবার মতই সাধন করিলেন। পুরুষ লীলা করিবার ইচ্ছাতেই এই প্রকৃতিকে চিৎশক্তি দ্বারা ক্রিয়াশীল করিয়া, এই সৃষ্টিরূপ লীলা খেলা কিছুক্ষণ করেন; আবার সেই ক্রিয়াতেই কিছুকাল মোহাচ্ছন্ন থাকিয়া, তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, সেই লীলা খেলা ভাঙ্গিয়া, স্বরূপে যাইয়া পুনরায় একাকীই বিদ্যমান থাকেন—যেমন শিশু একটী মৃত্তিকা পিণ্ড হইতে পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া, সেই পুতুলের বিবাহ দিয়া, তাহাদের মিলন সুখে সুখী এবং বিচ্ছেদে, মোহাচ্ছন্নবশতঃ সুখ দুঃখ কিছুকালের জন্য অনুভব করে, আবার তাহারই যখন নিজ গৃহের কথা স্মরণ হয়, তখন সেই খেলা অলীক মনে করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া গৃহে যাইয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়। বাল্মীকি এই ধনুর দৃষ্টান্তেই রামের আত্মদর্শন প্রণালী বর্ণনা করিলেন। এই সৃষ্টিরূপ লীলা পুরুষ নিজ ইচ্ছাতেই করেন। তাই উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, "স ঐক্ষত," "স অকাময়ত" "একোঽহং বহু স্যাম্।"

আর বৈদিক ঋষি বলিলেন তাঁহার উগ্র তপস্যার ফলে সঙ্কল্পের উৎপত্তি হইতে সৃষ্টির উদ্ভব। পুরাণও তাহাই অনুসরণ করিয়া তাহার শিবরূপ পুরুষ ও পার্ব্বতী রূপ প্রকৃতির মিলনে এক বৃহৎ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছে। যখন পার্ব্বতী বেশ-ভূষায় বিভূষিত হইয়া মদন ও বসন্ত সহকারে শিবের যোগভঙ্গ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে যাইলেন তখন তিনি (শিব) নিজ তেজে, তাঁহার লীলা করিবার অনিচ্ছা বশতঃই মদন ভস্ম করিলেন। আবার সেই পার্ব্বতীই যখন যোগিনী হইয়া তপস্যা করিলেন তখন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এ মিলন তাঁহাদের সেই পূর্ব্বাবস্থায় নিষ্ক্রিয় অবস্থার মিলন। যখন দুইজনই মূল ও অনাদি বশতঃ এক জাতীয় অবস্থা হইলেন তখনই তাঁহাদের মিলন হইল। এ মিলন সেই অনাদি অবস্থার মিলন না

হইলে পার্ব্বতীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইত। কুমার পার্ব্বতীর গর্ভ সম্ভূত নহে। এ মিলন তাঁহাদের স্বাভাবিক মিলন—যে অবস্থায় তাঁহারা উভয়ে স্বয়ম্ভু হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে অনাদিকাল হইতে মিলিত ছিলেন। হিমালয় রূপ অচল মৃতবৎ হিম বা শীতল, নিষ্ক্রিয় অসীম পরব্রহ্ম হইতে, একদিকে কৈলাসে, (হিমালয়ের শৃঙ্গকে—জলে, লসতি যাহা বিভাসিত হয়—উজ্জ্বল স্বচ্ছ মণি) শিবরূপ শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, অন্যদিকে হিরণ্যগর্ভা, হিরণ্য বা হেমবর্ণা উমা প্রকৃতি রূপে, যেন তাহার (পরব্রহ্মের বা হিমালয়ের) কন্যারূপে—(যাহারা উভয়েই এক স্থানেই হিমালয়েই অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান ছিল)—যেন সেখান হইতেই পৃথকীভূত হইয়া উত্থিত হইল। আবার তাহারা সেই একস্থানে হিমালয় গৃহেই মিলিত হইল। কৈলাস হিমালয়েরই একটী শিখর। হিমাচল—হিম এবং অচল। জলও শিলাকারে হিম এবং অচল, আবার পর্ব্বত ও অচল। দুই অচল একস্থানে মিলিয়া হিমালয় পর্ব্বত।

বাল্মীকিও ইহা পুরুষের লীলাইব লীলার ন্যায়ই বলিয়াছেন। রাম ইতঃপূর্ব্বে যোগের অঙ্গীভূত সমস্ত সাধন করিয়া, নিজকে প্রকৃতির মোহজনিত সমস্ত কামনা প্রলোভনাদি আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই প্রকৃতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিয়া যেন তাহাকেই ভঙ্গ করিয়া, তাহার বেষ্টনি বা বন্ধন হইতে কিরূপে মুক্ত হইলেন তাহা ঐ ধনুর্ভঙ্গরূপ দৃষ্টান্তে দেখান হইয়াছে। আর সে ধনু যে তাঁহার দেহস্থিত ধনু তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। যে দেহস্থিত পুরুষ, প্রকৃতির ধনু ভঙ্গ করিতে পারে, সেই পুরুষ বা আত্মাই পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। রামও, দেহরূপ প্রকৃতির ধনুতে দেহস্থ পুরুষের সীতারূপ জ্যোতি যখন দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার

দেহরূপ প্রকৃতি (দেহ প্রকৃতিরই সমস্ত উপাদানে নির্ম্মিত তাই প্রকৃতিরই প্রতিকৃতি) অন্তর্হিত হইয়া সেই জ্যোতিই কেবল বিদ্যমান রহিল। সুতরাং সেই জ্যোতি যেন তাঁহারই জ্যোতি রূপে প্রকাশিত হইল, কেননা তখন তাঁহার দেহাত্মকজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল; অর্থাৎ তিনি সেই জ্যোতি প্রকাশক পুরুষরূপেই পরিণত হইলেন— তিনি আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তাই এই মঞ্জুষাটি, দেহরূপ প্রকৃতিতে তাহার মেরুদণ্ডরূপ ধনু ও সেই দেহরূপ পুরে শায়িত পুরুষ বা আত্মারই,—প্রতিকৃতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই জ্যোতি যাহা হৃদয়প্রদেশে স্বপ্রকাশিত হয়, তাহা একবার স্থির হইয়া ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইলে, তখন দেহের কোন আকৃতি ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকে না, আর তাহা দেহকে অন্তর্হিত করিয়া ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিরাটত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন যেন সমস্ত বিশ্বটাই ঐ জ্যোতিতে লয় হইয়া যায়—ইহাই যোগীর বিরাটরূপে আত্মোপলব্ধি। কিন্তু রামের এরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি তখনও সিদ্ধ হয় নাই। এই জ্যোতি একদিকে স্বপ্রকাশ অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মন অন্য বিষয়চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে নিমগ্ন হয়, সেই সময়টা জ্যোতিটাও ক্ষীণভাবে দৃশ্য হয়। তখন বুদ্ধিই মনকে ফিরাইয়া ঐ জ্যোতির দিকেই লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সুতরাং মন জ্যোতিতে লয় হইলেও, বুদ্ধির অস্তিত্ব তখনও থাকে। এইরূপ অবস্থায় এক স্থানেই স্বপ্রকাশিত জ্যোতিরূপে, আত্মার ও বুদ্ধিরূপে প্রথমবিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতি উভয়েই বিদ্যমান থাকিয়া, পৃথক ভাবেই থাকে। সাংখ্যযোগে এই পর্য্যন্তই মনুষ্যের অনুভূতি হয়। ইহার পরে জ্যোতি ও বুদ্ধি উভয়েরই সত্ত্বালোপে যে অবস্থা হয় তাহা এই গ্রন্থেরই শেষে আছে।

এই প্রকৃতির স্বরূপ দেখাইবার জন্য বাল্মীকি এই অষ্টচক্রা

মঞ্জুষার অবতারণা করিয়াছেন। এই প্রকৃতি অতি মহৎ। তাহার বৃহত্ত্ব দেখাইবার জন্যই এই অতি দীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চাশ শত বা পঞ্চ সহস্রলোক কর্তৃক যে ইহা বাহিত হইয়াছিল, তাহাই দেখান হইয়াছে। এই মঞ্জুষার এক এক পার্শ্বে দুইদিকে সমান দুইভাগে পঁচিশ শত লোক ছিল। প্রকৃতির স্থূল বিকারগুলি সবই পঞ্চ-সংখ্যক—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। তাই এই পাঁচেরই গুণবৃদ্ধিতে ২৫ পঁচিশ দেখাইবার জন্য তাহারও দ্বিগুণ পঞ্চাশত শব্দ দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অন্য সংখ্যা যাহার দ্বিভাগ হয় তাহাই বা দিলেন না কেন অথবা পঞ্চসহস্র দিলেন না কেন? তাহার কারণ আমরা দেখাইতেছি পঞ্চবিংশ দিলে শ্লোকটী এইরূপ হইত "নৃণাংশতানি পঞ্চবিংশ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।" এইরূপ হইলে অক্ষর বৃদ্ধি হওয়াতে ছন্দভঙ্গ হইত। কাজেই "নৃণাংশতানি পঞ্চাশদ্ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।" আর প্রকৃতই যদি সেই ধনু সহ মঞ্জুষা, দুই শ্রেণীতে ২৫০০ শত লোক দ্বারা বাহিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে সেই ধনুর দৈর্ঘ্য কত বড় হয় তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এই ২৫০০ লোক যদি এক হস্ত পরিমিত দূরেও দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে তাহারা ২৫০০ হস্ত অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল। সুতরাং এই অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘধনু উত্তোলন বা তাহাতে টঙ্কার দেওয়া মনুষ্য রামের পক্ষে কিরূপ সম্ভব, তাহা ধীর ও স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ইহা এক বিষ্ণু অবতার রামের বিরাট বিষ্ণুর কায়া পরিগ্রহেই হইতে পারে। কিন্তু এখানে বাল্মীকি, পবন নন্দন হনুমানের পর্ব্বতাকার গ্রহণের ন্যায়, রামেরও সেইরূপ বিরাটাকার ধারণের কথার উল্লেখ করেন নাই। রাম যদি মনুষ্য-রূপে আত্ম বিস্মৃত বিষ্ণুই হন তাহা হইলে এখানেও তিনি আত্মবিস্মৃত

মানবই ছিলেন। কেননা লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময়, রাম ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন তিনি নিজকে দশরথপুত্র মনুষ্য রাম বলিয়াই জানেন এবং তাঁহার আর কোন দ্বিতীয় সত্তা আছে তাহা তিনি জানেন না। তখন ব্রহ্মাই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি বিষ্ণুই, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তৎকাল পর্য্যন্ত তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা মনুষ্য সাধ্য শক্তিতে করাই প্রতিপন্ন হয়। কেবল এই রূপই যদি তাঁহার বর্ণনার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে "নৃণাং সহস্রাণি পঞ্চব্যায়তানাং মহাত্মনাং।" এইরূপ বলিলে ছন্দভঙ্গ হইত না আর তাঁহার প্রথামত লোকেও বুঝিত ইহা পাঁচজন লোকই। পাঁচজন লোক সেই লৌহচক্র সমন্বিত মঞ্জূষার দুইদিকে চারিজন আর মধ্যস্থলে একজন তাহা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। পঞ্চাশৎ শতর অর্থও পঞ্চসহস্র। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার 'নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ব্যায়তানাম্' বলাতে উপরোল্লিখিত সেই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ মর্ম্ম ভিন্ন আর ইহার অন্য কি মর্ম্ম হইতে পারে তাহা আমাদের বোধের অগম্য। বিচার ও যুক্তিদ্বারা এই ধনুর্ভঙ্গের দুই অর্থ হয় ঃ—

(১) তাৎকালিক মনুষ্য যত দীর্ঘই হউন, রাম, তাঁহার নিজ হস্তের সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত ছিলেন। সুতরাং সেই ধনুও তাৎকালিক মনুষ্য সাধারণের ব্যবহারোপযোগী অপেক্ষা বেশী দীর্ঘ ছিল, তাই সাধারণ ক্ষমতাশালী লোকে তাহাতে টঙ্কার দিতে পারে নাই। রাম সাধারণ রাজাদের অপেক্ষা বৃহৎকায়, আজানুলম্বিত বাহু ও অমিত-শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে যে, অতি বৃহৎকায় মনুষ্য ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কোন ক্রমপ্রস্তর—অবস্থাপ্রাপ্ত কঙ্কাল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনেক বৃহৎকায় জন্তুর কঙ্কালাদির নিদর্শন পাইয়াছেন। সুতরাং মনুষ্য রামই এই

অতিমনুষ্য দেবরাতের ব্যবহৃত ধনুতে টঙ্কার দিয়া সেই দেবরাতেরই ন্যায় তাঁহার বীর্য্যবত্তা দেখাইলেন।

(২) এক মনুষ্যই যে সাধনাবলে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ বুঝিতে পারিয়া, প্রকৃতিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া, আত্মজ্যোতি দর্শনে নিজ পুরুষ জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং দেবতা গন্ধর্ব্বেরা এবং সাধারণ মনুষ্য তাহা পারে না, তাহাও ইহা দ্বারা প্রদর্শিত হইল। দেবতা, গন্ধর্ব্বেরা কাল্পনিক সৃষ্টি। এই দুইরূপ অর্থের মধ্যে প্রথমটী বিদ্বান্ বিচারশক্তিসম্পন্ন লোকের, এবং দ্বিতীয়টী বিবেকী সাধকের পক্ষে গ্রহণোপযোগী করিয়া তাঁহার ভঙ্গিমাময় রচনাতে বর্ণন করিয়াছেন। আর সাধারণ সরল অন্ধবিশ্বাসী লোকের পক্ষে তিনি, রামের বিষ্ণু অবতার প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রুতিমধুর বর্ণনারও ত্রুটি করেন নাই।

তাই এই ধনু মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের* পর দেবতাদিগকে প্রদান করিলে, তাঁহারা আবার তাহা দেবরাতকে দিলেন। এই অসামান্য অদ্ভুত ধনু প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পরিমিতস্থানব্যাপী। এই ধনুতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি কেহই জ্যারোপণ করিতে পারে না, মনুষ্য তো নগণ্য। এই ধনুর টঙ্কারে, সভাস্থ সহস্র সহস্র লোক মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ইত্যাদি। সুতরাং মহাদেব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ধনু এক তাঁহারই সমকক্ষ দেবতা বিষ্ণু ভিন্ন আর কে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন? তাই রাম যখন এই ধনু শুধু ব্যবহারই নয় তাহা ভাঙ্গিয়াও ফেলিলেন তখন তিনি বিষ্ণু না হইয়াই যান না।

---

* এই দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে আমি ঋগ্‌বেদ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিবরণের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছি, ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

রাজর্ষি জনক সাংখ্যযোগসিদ্ধ সাধক ছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের সাধনার ও তপস্যার ফলে তাঁহার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সেই সভাতে শতানন্দ মুনির মুখে বিশ্বামিত্র চরিত বর্ণনাকালে শুনিয়াছিলেন। শতানন্দ কেবল বিশ্বামিত্রের যোগৈশ্বর্য্য লাভ ও বিভূতি প্রদর্শনের কথাই বলিয়াছিলেন। তাই জনক যখন বুঝিলেন যে বিশ্বামিত্রের ন্যায় ঋষিরাও আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, এবং ইহা তাঁহাদের বংশের রাজর্ষিদেরই উপলব্ধির বিষয় ছিল, তখন যেন একটু গর্ব্বের সহিতই বলিলেন-যে অন্য কোন মনুষ্য এই কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। আর তখন তিনি তাঁহারই স্ববংশীয় ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত সুকুমারমতি ব্রহ্মচর্য্যবলমণ্ডিত দশরথনন্দন রামকে সেই সাংখ্যযোগের উপদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাম-পরশুরাম-দ্বন্দ্ব

মিথিলাপুরীতে চারিপুত্রের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রাজা দশরথ যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখন ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডলধারী, ভয়ঙ্করাকার ভার্গব জামদগ্ন্য পরশুরাম, স্কন্ধে পরশু এবং হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভঃ ধনু ও একটী ভীষণ শর ধারণ করিয়া, তাঁহাদের পথরোধ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা অতিশয় ভীত হইলেন এবং বশিষ্ঠাদি ঋষি তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তখন পরশুরাম রামকে কহিলেন "বীর দশরথনন্দন রাম! তোমার অদ্ভুত বীর্য্যের কথা এবং ধনুর্ভঙ্গের কথা আমি শুনিয়াছি। সেইরূপে সেই ধনুর্ভঙ্গ করা অদ্ভুত ও অচিন্ত্য ব্যাপারও, সুতরাং আমি তাহা শুনিয়া আর একটী ধনু লইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি এই মদীয় পিতা জমদগ্নির নিকট লব্ধ ভীষণাকার মহাধনু আকর্ষণপূর্ব্বক ইহাতে শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন করাও। তুমি এই ধনু আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমি তোমার বল জ্ঞাত হইয়া, তোমার সহিত বীরগণের প্রশংসনীয় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেও, পুনরায় তিনি রামকে বলিলেন:—"বিশ্বকর্ম্মা, প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বলোকাভিপূজিত, শত্রুদমন সামর্থ্য-সমন্বিত দৃঢ় উৎকৃষ্ট দুইটী দিব্য ধনু নির্ম্মাণ করেন। সুরগণ তন্মধ্যে একটী ধনু ত্রিপুর নিধনার্থ যুদ্ধোদ্যত ত্র্যম্বক মহাদেবকে

দিয়াছিলেন। সেই ধনু, যাহা ত্রিপুর বধ করিয়াছিল, তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছ। এই দুর্দ্ধর্ষ বৈষ্ণব ধনু তাঁহারা বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণব ধনু পরপুর বিজয়ী এবং শৈব ধনুর তুল্যই সারবৎ। দেবতারা তখন মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবলের সম্বন্ধে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে পরাজয়ের জন্য রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ করেন। তখন বিষ্ণুর হুঙ্কারে মহাদেব স্তব্ধ হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার সেই ভীম পরাক্রম ধনুটীও শিথিল হইয়া যায়। পরে দেবতারা ঋষিগণের সহিত যাইয়া সেই দুই সুরোত্তমকে প্রার্থনা করিয়া শান্ত করেন, এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে সেই শৈব ধনু স্খলিত হইতে দেখিয়া বিষ্ণুকে সমধিক বলবান বোধ করেন। মহাদেব এইরূপে প্রসন্ন হইয়া বাণের সহিত সেই ধনু, বৈদেহ রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন এবং বিষ্ণুও সেই বৈষ্ণব ধনু ন্যাস স্বরূপ ভার্গব ঋচিককে দেন। ঋচিক সেই ধনু স্বীয় পুত্র জমদগ্নিকে দেন। ইহাই সেই বৈষ্ণব ধনু। সেই জমদগ্নি আমার পিতা। আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনবরত তপস্যানিরত থাকেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বধ করে। আমি সেই অসঙ্গত পিতৃবধ শ্রবণে তাহার প্রতিশোধ লইতে অনেকবার ক্ষত্রিয়জাতি উৎসন্ন করিয়াছি; এমন কি, সদ্যোজাত ও গর্ভস্থ শিশু পর্য্যন্ত বধ করিয়াছি। এইরূপে আমি সমগ্র ভূমণ্ডল অধিকার করিয়াছিলাম। তৎপরে যজ্ঞ করিয়া কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণা স্বরূপ প্রদানকরতঃ মাহেন্দ্র পর্ব্বতে তপোবল সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছি। তুমি সেই হরধনুভঙ্গ করিয়াছ শুনিয়া দ্রুতপদে এখানে আসিয়াছি। ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে তুমি এই বৈষ্ণব

ধনু গ্রহণ করিয়া ইহাতে এই পরপুর-বিনাশ-সমর্থ বাণ যোজনা কর। যদি তাহা করিতে পার, আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।"

ইহা শুনিয়া রাম তাঁহাকে কহিলেন "তুমি পিতার নিকট অঋণী হইবার জন্য যে কাজ করিয়াছ তাহা শুনিয়াছি। আমাকে যে হীনবীর্য্য ক্ষাত্রধর্ম্ম-অসক্ত মনে করিতেছ তাহা অসহ্য। এক্ষণে তুমি আমার তেজ ও পরাক্রম দেখ।" রাম, তখন পরশুরামের হস্ত হইতে, সেই বৈষ্ণব ধনু ও শর অল্প বলেই গ্রহণ করিয়া, তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শর সন্ধান করতঃ সক্রোধে জামদগ্ন্য রামকে কহিলেন—রাম! একে তো তুমি ব্রাহ্মণ, তাহে আমার গুরু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র, সুতরাং আমার পূজনীয়, এজন্য তোমার প্রাণবিনাশকর শর ত্যাগ করিতে পারিলাম না; সেইজন্য তোমার গতিশক্তি কিম্বা তোমার স্বকর্ম্মার্জ্জিত লোক সকল বিনাশ করি, কেননা এই পরপুর বিজয়ীশর কখনও ব্যর্থ হয় না।" তখন রাম পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া তাঁহাকে জড়ের ন্যায় পরিণত করিলেন। তখন পরশুরাম কহিলেন, "আমি কশ্যপকে পৃথিবী দান করতঃ, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ পৃথিবীতে রাত্রি যাপন করি না। আমাকে দ্রুত সেই মাহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইতে হইবে; সুতরাং আপনি আমার বল হরণ না করিয়া আমার তপস্যালব্ধ ফল হরণ করুন। অতএব আপনি ঐ শর ত্যাগ করুন।" রাম তাহাই করিলেন। তখন তিনিও রামকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনিই স্বয়ং বিষ্ণু তাহা বুঝিয়াছি"; এবং দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

এই উপাখ্যানে আমরা প্রথম দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলাম, বাল্মীকি রামের বিষ্ণুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে পরশুরামও এক অবতার এরূপ পুরাণে কথিত আছে। একই সময়ে দুই অবতারের আবির্ভাব সম্ভব হইলেও, তাঁহারা উভয়েই যখন

করিয়াছিলেন, যাহা বিষ্ণু ছাড়া আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিত না। কিন্তু

"ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্ম্মণা॥
অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে।...
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্দ্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ॥

বিশ্বকর্ম্মা দুইটী ধনু নির্ম্মাণ করিয়া একটী ত্র্যম্বককে দিয়াছিলেন যাহা রাম ভঙ্গ করিলেন, আর এই ধনু বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন। তাহা হইলে বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গ নির্ম্মিত আর শৈব ধনু বংশ নির্ম্মিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ ঋচিকের বৈষ্ণব ধনু শৃঙ্গ নির্ম্মিত আর ক্ষত্রিয় দেবরাতের শৈবধনু বংশ নির্ম্মিত। বাঁশের তিন গাঁইট, পাঁচ গাঁইট বা সাত গাঁইটে নির্ম্মিত একটা ধনুদণ্ড ২৪ আঙ্গুল হস্তের ৪ হাত পরিমাণ দীর্ঘ হইত। আর দুইটী শৃঙ্গ জোড়া দিয়া একটী শার্ঙ্গ ধনু নির্ম্মিত হইত। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যেখানে ভার্গব ঋচিক ও বিশ্বামিত্র বাস করিতেন সেখানে বৃহৎ বংশ জন্মে না বলিয়া তাঁহারা মহিষের শৃঙ্গ দ্বারা ধনু নির্ম্মাণ করিতেন। আর সেই আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত মিথিলা নগরী তখন অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী থাকাতে, সমুদ্রতীরস্থ বৃহৎ বংশ তথায় অপ্রতুল ছিল না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, তাঁহারা নিজেদের এবং ক্ষত্রিয়দের যাগযজ্ঞ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, আর তাঁহাদের রক্ষণাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়েরাই করিতেন। ঋচিকের সময় হইতে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করাতে এই ঋচিক ব্রাহ্মণই প্রথমে এই শার্ঙ্গধনু আবিষ্কার করেন বা ব্যবহার করেন। আর তাঁহার পুত্র জমদগ্নি পিতার নিকট তাহা শিখিয়া নিজ পুত্র পরশুরামকে সেই ধনু দিয়াছিলেন।

পরশুরামের প্রধান অস্ত্র ছিল কুঠার। তিনি নিজেও দীর্ঘকায়, মহাবলশালী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই কুঠারও অতি বৃহৎ ছিল। এই কুঠার দ্বারাই তিনি ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলেন। আমরা এখনও যেমন দেখিতে পাই, বৃহৎ লাঠি, হস্তে দ্রুত ও কৌশলে ঘুরাইতে পারিলে, তরবারি, শূল বা অন্যকোন অস্ত্র সেই অস্ত্রধারীর অঙ্গে আঘাত করিতে পারে না, তেমনি পরশুরাম সেই ক্ষত্রিয়দের ধনু নিক্ষিপ্তশরে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত না হওয়াতে এইরূপ ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাৎকালিক সেই কুঠারকে এখন টাঙ্গী বলে। তিনি নিজকে, ক্ষত্রিয় সমাজে যতবড়ই বলবান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলবান্ মনে করিতেন। তাই এই পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা বলবান্ কেহ নাই মনে করিয়াই যেন পৃথিবী তাঁহার এবং কশ্যপ ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণদেরই করতলগত মনে করিতেন। ইহাই তাঁহার কশ্যপকে পৃথিবী দানের তাৎপর্য্য। এখন যখন তিনি শুনিলেন পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত মহাবলশালী দেবরাতের বৃহৎ বংশ নির্ম্মিত ধনু রাম আয়ত্ত করিয়া ভগ্ন করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে হইল ক্ষত্রিয় রাজবংশে আবার একজন মহাবলশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি এত বড় বৃহৎ ধনু আয়ত্ত করিবার শক্তি ধরেন। সুতরাং আবার ক্ষত্রিয় জাতির উত্থানে ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য লোপ হইবার আশঙ্কায় তিনি এই দশরথ নন্দনের পরাক্রমের পরীক্ষা লইতে আসিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল রাম বংশনির্ম্মিত ধনু আয়ত্ত করিতে পারিলেও এই শার্ঙ্গধনু তদপেক্ষা দুর্নমনীয় হওয়াতে ইহাতে শর যোজনা করিতে সমর্থ হইবে না। ইহা তাঁহাদের বংশীয় দীর্ঘকায় ও মহাবলশালী তাঁহার পিতামহ ঋচিক ও তাঁহারই ব্যবহারোপযোগী। বিশ্বামিত্র ঋষি রামকে অনেক দুর্লভঅস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তিনি ঋচিকের (তাঁহার ভগ্নীপতির) নিকট, তাঁহার যৌবনে রাজত্বকালে এই শার্ঙ্গধনু ব্যবহার করিতে নিশ্চয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, কেননা বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন বিশ্বামিত্রের ন্যায় সর্ব্ব অস্ত্রে ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী তখন আর্য্যাবর্ত্তে কেহই ছিল না। সুতরাং রাম তাঁহার নিকটেই এই শার্ঙ্গধনু ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাই যখন পরশুরাম গর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে সেই বৃহৎ শার্ঙ্গধনুতে শর যোজনা করিতে বলিলেন তখন তিনি তাহা অনায়াসে সাধন করিয়া পরশুরামকে দেখাইলেন তিনি কত শক্তি ধরেন। বৃদ্ধ পরশুরাম বহুকাল তপস্যানিরত থাকাতে আর সেই ধনু ব্যবহার করেন নাই, তাই বুঝিতে পারিলেন রাম তাঁহা অপেক্ষা অধিক শক্তিধারী। যেন তিনি রামের নিকট হীনবীর্য্যই প্রতিপন্ন হইলেন। ইহাই পরশুরামের শক্তিহরণের তাৎপর্য্য। এই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। কেননা আমরা ভাগবতে দেখিয়াছি ভৃগুঋষি, মহাদেব শিবের নিন্দা করিয়া, দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুকেই যজ্ঞেশ্বর বলিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং বংশপরম্পরায় এই ভার্গব পরশুরামও বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষদের মুখে শ্রুত হইয়াছিলেন যে একমাত্র বিষ্ণুই এই শার্ঙ্গ-ধনু ব্যবহার করিতেন, এবং এই শার্ঙ্গধনু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, বিষ্ণুর নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং অন্য মানবের আয়ত্ত-অসাধ্য এই শার্ঙ্গধনু যখন রাম আয়ত্ত করিয়াছেন, তখন রামই বিষ্ণুর অবতার অথবা বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী। তাই তিনি রামকে বিষ্ণু বলিয়া অভিনন্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তথাকথিত ব্যাসদেবরচিত ভাগবতে * বর্ণিত আছে যে—

* ভাগবত যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না।

ভৃগু ঋষি বিষ্ণু উপাসক ছিলেন এবং তিনি আবার বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাতও করিয়াছিলেন এরূপ কোনও পুরাণেও উল্লিখিত আছে "ভৃগুপদলাঞ্ছিত বক্ষ" রূপে বিষ্ণুর বর্ণনা আছে। এই বৈদিক ভৃগু ঋষিই প্রথমে অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং পরে বিষ্ণুরূপ সগুণ

তাহার কারণ আমরা যাহা বুঝিতে পারি তাহা এইরূপ—এই ভাগবত প্রথমে ব্যাসপুত্র শুকদেব ব্রহ্মশাপে মৃত্যুভয়ে ভীত রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। মহাভারতে, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে মৃত্যু অপেক্ষায় যে কয়দিন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা ব্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—কিরূপে ছদ্মবেশী তক্ষক, কাশ্যপ ব্রাহ্মণ যখন মন্ত্রবলে, তাহা দ্বারা দষ্ট ও দগ্ধ বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন দেখিয়া, তাহার কার্য্য বিফল হইবে মনে করিয়া, তাঁহাকে (কাশ্যপকে) ধনরত্ন দানে, রাজসমীপে যাইতে প্রতিনিবৃত্ত করতঃ, সূক্ষ্মকীটরূপে ফলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই ব্রাহ্মণদত্ত ফল ভক্ষণোদ্যত রাজা, তদ্দ্বারা দষ্ট হইয়াছিল, তাহাও বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানার্থ তাঁহারই পুত্র শুকদেব যে তাঁহাকে, (রাজাকে) তাঁহারই রচিত ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এত বড় একটা প্রয়োজনীয় ঘটনার কোনও উল্লেখ, সেই ব্যাসদেবেরই রচিত মহাভারতের কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না ইহা আশ্চর্য্য নয় কি? তারপর সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তির কারণ হইতেছে শুকদেবের জন্ম ও প্রয়াণ—যাহা ব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মমুখে যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করাইয়াছেন। তাহাতে ঘৃতাচি অপ্সরাদর্শনে কামমোহিত ব্রহ্মচারী উর্দ্ধরেতা ব্যাসের বীর্য্য তাঁহার হস্তস্থিত অরণিতে পতিত ও তাহার ধর্ষণে মথিত হইয়া, কিরূপে রক্তমাংসধারী জটাজুট-কমণ্ডলুধারী শুকের জন্ম হইয়াছিল, এবং সেই শুকই রাজর্ষি জনকের নিকট আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া সর্ব্বগত ও ব্রহ্মপদে লীন হইলে, পুত্রশোকাতুর পিতাকে পিনাকী শঙ্কর প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি (ব্যাস) ইচ্ছা করিলেই পুত্রের ছায়া দর্শন করিতে পারিবেন, এইরূপ বিশদ বর্ণনা আছে। সুতরাং ইহাই প্রশ্ন হয় যে সেই বিদেহ কৈবল্যপ্রাপ্ত শুক কিরূপে প্রায় ৬০ বৎসর পরে পরীক্ষিতের সভায় পুনরায় স্বদেহে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন?

ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন—যখন বৈদিক ঋষি, পুরুষ সূক্তে ব্রহ্মের বিশ্বরূপে বিবর্ত্তন বর্ণনা করিলেন "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥" তারপর সেই বৈদিক ঋষিই পরমাত্মভূত হইয়া বলিলেন "অহং রুদ্রেভির্বস্থভিচরাম্যহম্ ইত্যাদি।" আবার আমরা দেখিতে পাই তৈত্তেরীয় উপনিষদে এই ভৃগুই পিতা বরুণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন "অধীহিভগবো ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন। তখন বরুণ বলিলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।"

অর্থ:—যাঁহা হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশ সময়েও যাহাতে বিলীন হয়, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তাহাই ব্রহ্ম। তখন ভৃগু তপস্যা করিলেন। পুনঃ পুনঃ দশবার তপস্যা করিয়া যখন তাঁহার আত্মজ্ঞান উপজিত হইল তখন বলিলেন

"অহমন্নং। অহমন্নাদো। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা। পূর্ব্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ভায়ি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাম্ ॥"

অর্থ:—আমিই অন্ন এবং আমি অন্নাদ বা অন্নভোক্তা। আমিই প্রথমোৎপন্ন স্থূল সূক্ষ্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমিই অমৃতত্বের নাভিস্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্ব নামক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ আমিই সমস্ত জগদাকারে অভিব্যক্ত আছি। বহুকাল তপস্যা ও সাধনার পর ভৃগু ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। এই নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ বিষ্ণুরূপে বা বিশ্বরূপে প্রকাশিত। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইলে তখন সগুণ ব্রহ্ম অন্তর্হিত হয়, বা তাহার যেন কোন মূল্যই তখন থাকে না। তাই

শাশ্বতঃ নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া ভৃগু ঋষি সগুণ ব্রহ্ম বিষ্ণুর বক্ষে যেন পদাঘাত করিয়াই তাহার অসারতা বা নশ্বরতা প্রতিপন্ন করিলেন। এখন তাঁহারই বংশীয় পরশুরাম সেই সগুণ বিষ্ণুর উপলব্ধি পর্য্যন্তই করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বৈষ্ণব ধনুই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি হরের বা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম যৌবনে তিনি রজঃ ও তমো গুণাত্মক প্রকৃতির বশীভূত হইয়া বহুকাল নিষ্ঠুর হত্যাকার্য্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তারপর তিনি তাঁহার পাপ-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, ও পরলোকে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠলাভের জন্য তপস্যার্থ মাহেন্দ্রপর্ব্বতে প্রস্থান করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার উপাস্য বিষ্ণুরই তপস্যা করিতেছিলেন। মাহেন্দ্রপর্ব্বত কোন স্থানে স্থিত ছিল, তাহার স্থিরনিশ্চয় করা যায় না। তবে তাহা মিথিলার নিকটবর্ত্তীই ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং সেই মাহেন্দ্রপর্ব্বতে বাসকালে তিনি জনক রাজর্ষিদের বংশীয় দেবরাতের, মহর্ষি কপিলশিষ্য পঞ্চশিখের নিকট আত্মজ্ঞান লাভের, প্রতীক হরধনু সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীর বিষয় যে অবগত ছিলেন না এমন বোধ হয় না, কেন না বিষ্ণুউপাসক বিশ্বামিত্র আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত বিষ্ণুর সিদ্ধাশ্রমে, বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশতঃই, যখন বাস করিয়া তপস্যা করিতেন, তখন তিনিও এই জনকগৃহে রক্ষিত সুনাভ ধনুর কথা জানিতেন বলিয়াই রামকে তাহা দর্শনার্থ মিথিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরশুরামের পূর্ব্বপুরুষ ভৃগু আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও বংশপরম্পরায় তাহা, তাঁহাদের বংশে উপদিষ্ট ও রক্ষিত হয় নাই, কেননা ঋচিক, দেবতাদিগের নিকট ঐ বিষ্ণুর ধনুই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাই সযত্নে রক্ষা করিয়া উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান

করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সগুণব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর জ্ঞানই তাঁহার পরবর্ত্তী ভার্গবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা পরশুরাম কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঐ শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে, দেবগণ কর্ত্তৃক প্ররোচিত ব্রহ্মা দ্বারা সঙ্ঘটিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের বৃত্তান্তেই অবগত হওয়া যায়। দেবতাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়—ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, তাই যেন ব্রহ্মই ব্রহ্মারূপে তাঁহাদের মনের সন্দেহ, উভয়ের এই দ্বন্দ্বরূপে দেখাইলেন। দেবতাদের অনুভূতির সীমা ঐ সগুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি পর্য্যন্ত। ত্রিকালহারী, ত্রিলোকহারী, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপে আত্মার দেহে-স্থিতির-ত্রিপুরহারী হরের বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি তাঁহাদের হইল না। কেনোপনিষদে দেখান হইয়াছে দেবতারা যক্ষরূপী ব্রহ্মাকে চিনিতে পারেন নাই। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম ত্রিপুরহারী দেবাদিদেব, মহাদেব হর তাঁহাদের দৃষ্টিতে সগুণ ব্রহ্ম বিষ্ণুর নিকট যেন পরাজিত হইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। * পরশুরামও তপস্যাদ্বারা ঐ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন, যখন পরশুরাম শুনিলেন আর একজন ক্ষত্রিয়-রাজবংশসম্ভূত যুবক দেবরাত-জনকবংশে রক্ষিত এই ধনুর্ভঙ্গরূপ সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তখন যেন তাঁহার নিজের হীনতাই, তাঁহার মর্ম্মে কশাঘাত করিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষত্রিয় কুমার রামের উৎকর্ষতা পরীক্ষার জন্যই চালিত করিল। তিনি চিরকাল তাঁহার পরশুতেই আনন্দ উপলব্ধি করিতেন, 'রমতে,' তাই তাঁহার নাম পরশুরাম। প্রকৃত আত্মাতে রমণ উপলব্ধি করিয়া আত্মারাম অবস্থার প্রতীকই রাম। বিষ্ণুই, মধুকৈটভ, মুর, হিরণ্যাক্ষ, হরিণ্যকশিপু ইত্যাদি অনেক

---

* ইন্দ্র পর্য্যায়ক্রমে ৯৬ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণের পর ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ পাইয়াছিলেন। উপনিষদে এই সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে।

ক্ষত বা অনিষ্টকারী দৈত্যবধ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি ক্ষৎ+ত্রা +ড=ক্ষত্রিয়েরই প্রতীক। তাই বিষ্ণুর যত মনুষ্যকৃত প্রতিপন্ন মনুষ্যরূপে অবতার হইয়াছে তাহা এই ক্ষত্রিয়বংশেই হইয়াছে—যথা—রাম, বলরাম বা কৃষ্ণ, বুদ্ধ। পরশুরামও ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয় পুত্র, এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব পুরুষ ভৃগুঋষি, বরুণের পুত্রবশাৎ, তাঁহার কোন ব্রাহ্মণ বংশ হইতে উৎপত্তির কথাও স্বীকৃত হয় না। আর এই বিষ্ণুঅবতারগুলি, কেহই সেই আদি বিষ্ণুর পদানুসরণ করিয়া দৈত্য রাক্ষস বধে ন্যূন ছিলেন না। কেবল একমাত্র তথাগত (তথা=নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আগত) বুদ্ধই আবার তাঁহার সেই তথাস্থানে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দশরথ পুত্র রামও সেই তথা পথে বা অয়ণে যাইবার অধিকার লাভ করিয়া প্রকৃতই রামে পরিণতিপ্রাপ্ত হইবেন, তাহারই বীজ যে তাহাতে অঙ্কুরিত হইয়াছে ইহা প্রণিধান করিবার শক্তি, পরশুরামের দৃষ্টিতে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার চক্ষুর কুজ্ঝটিকা রূপ আবরণ উন্মোচিত করিয়া দিল। তাই তিনি বলিলেন "তুমিই অনাদিকারণ নারায়ণ হইতে বিষ্ণুরূপে উদ্ভূত হইয়া মধুকৈটভ বধ করিয়াছিলে।"

"অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্।
ন চেয়ং মম কাকুস্থ ব্রীড়া ভবিতু মর্হতি।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ॥"

এখন সেই ত্রৈলোক্যনাথ তোমা কর্ত্তৃক আমি যে বিমুখীকৃত হইলাম তাহাতে আমার কোন লজ্জার কারণ নাই। আমি এতকাল তপস্যা করিয়া যে অসার ফল লাভ করিয়াছি, তাহা তুমি আমার মন হইতে হরণ করিয়া আমাকে তোমার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে দাও। তাহা লাভ করিতে আমার অত্যধিক বলের প্রয়োজন

হইবে। সুতরাং আমার সেই বল যাহাতে নষ্ট না হয় তুমি তাহাই কর।" এই বলিয়া পরশুরাম রামকে প্রদক্ষিণ করতঃ পূজা করিয়া, আত্মগতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

"রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ॥"

প্রথমে যখন পরশুরাম রামের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন যেন তিনি তমো গুণেরই মূর্ত্তিমান প্রতীক হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার সেই ভীষণ আকৃতির বর্ণনা আছে এবং তমরূপ অন্ধকার দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছিল "তমসা সংবৃতঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বে নাবেদিষুর্দ্দিশঃ॥" আবার সেই পরশুরামই যখন রামের উপলব্ধিতে সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন তখন "ততো বিতিমিরা সর্ব্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা।" সমস্ত দিক অন্ধকার হীন হইয়া আলোকোদ্ভাসিত হইল। আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ ভৃগুঋষির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরশুরাম আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারই নির্ম্মূলীকৃত ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব দাশরথি রামের নিকট হইতেই তাহা তিনি প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম লাভ করিলেই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদ হইতে পারিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ব্রাহ্মণবংশীয়ই হউক বা ক্ষত্রিয়বংশীয়ই হউক, তাহাকে সাধনা দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের নিকট আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উপনিষদের অনেক আখ্যায়িকাতেই আছে। অজাতশত্রু গার্গ্যকে, জনক শুককে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর তাহারও বহুপূর্ব্বে বাল্মীকিও, তাঁহার রামায়ণে এই পরশুরাম উপাখ্যানে তাহা দেখাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভরদ্বাজের অতিথি সৎকার

সীতা লাভ করিয়া, রাম পিতার সহিত অযোধ্যাতে রাজ্যশাসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। তখন রাজা দশরথ প্রায় ৭২ বয়সে বার্দ্ধক্য বশতঃ, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করিলেন। তাঁহার মহিষী কৈকেয়ী তাহার কুটিলমতি দাসী মন্থরার প্ররোচনায়, দশরথের নিকট, তাঁহার (দশরথের) পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত বরদ্বয় পূর্ণ করিয়া, রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাম, সেই পিতৃসত্য পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনবাসের জন্য জটাবল্কল পরিধান করতঃ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি সমস্ত ধন সম্পদ নির্বিশেষে দান করিয়া গেলেন। তাঁহারা সেই রাত্রি গুহকের বনে বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় ফলমূলাহারে যাপন করিয়া তৎপর দিন গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় একদিন বাস করিয়া ভরদ্বাজ ঋষির নির্দ্দেশ অনুসারে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই চিত্রকূটে তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিজেদের পরিচয় ও বনে আগমনের কারণ সমস্তই বলিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে ভরত পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ পিতৃশ্রাদ্ধান্তে

রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া, রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, সমস্ত অযোধ্যার পৌরজন ও হস্তী অশ্বাদি সমন্বিত বৃহৎ সৈন্য কটক লইয়া, তদনুসরণে ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি আশ্রমের বহুদূরে সকলকে রাখিয়া কেবল বশিষ্ঠের সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভরদ্বাজ ঋষির পদবন্দনা করিলেন। তখন ঋষি ভরতকে বলিলেন "তোমার ভ্রাতা রাম চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। তুমি কল্য সেই স্থানে গমন করিও, অদ্য মন্ত্রিগণ সহ আমার আশ্রমে থাক।" তখন ভরত কহিলেন "পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি বনে যাহা সম্ভব হয়, তদ্বারা তো আপনি অতিথি সংকার করিয়াছেন।" "আমাকে বনবাসী ও দরিদ্র এবং তজ্জন্য সকলের যথাযথ অতিথি সংকারে অসমর্থ মনে করিয়াই ভরত এইরূপ বলিলেন' ইহাই মনে ভাবিয়া তিনি ভরতকে বলিলেন, "তুমি অল্পতেই সন্তুষ্ট হও, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি তোমার সমস্ত বাহিনীকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে এইস্থানে আনয়ন কর"। তখন মহর্ষির আদেশ অবহেলা করিতে না পারিয়া ভরত তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন।

তখন ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নি-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন "আমি অতিথি সংকারার্থ ইচ্ছা করিয়া, সৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সে সমুদয় সম্যক্ বিহিত হউক্। আমি অতিথি কামনা করিয়া ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এই লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, তাহাতে আমার সম্যক সিদ্ধি লাভ হউক। পৃথিবীতে ও আকাশে যে সকল নদী আছে, তাহারা সকলে অদ্য এস্থানে আগমন করুক। কতকগুলি নদী মৈরেয় মদ্য, কতকগুলি সুনিষ্পাদিত সুরা, অপর

নদী সকল ইক্ষাকুরস সহ শীতল জল ক্ষরণ করুক। কুবেরের উদ্যান তাহার দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সম্পন্ন পত্র ও দিব্যরমণীগণ রূপ ফল স্বরূপ বৃক্ষাদি দ্বারা শোভিত হইয়া এখানে আসুক। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত অপ্‌সরাগণকে এখানে আহ্বান করিতেছি। ভগবান্‌ সোমদেব আমার এই আশ্রমে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি উত্তম অন্ন প্রস্তুত করুন, এবং বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-জাত মাল্য, সুপেয় সুরা ও নানা প্রকার মাংস বিধান করুন।" সমাধি ও অপ্রতিম তেজ সম্পন্ন মুনি, এইরূপে সকলকে তথায় আহ্বান করিলেন এবং তিনি ধ্যান করিতে লাগিলেন।"

"এবং সমাধিনা যুক্ত স্তেজসাপ্রতিমেন চ।
শিক্ষাস্বর সমাযুক্তং সুব্রতাশ্চাব্রবীন্মুনিঃ ॥
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ ॥"

তখন সেই সকল দেবতারা সেই আশ্রমে আসিলেন, এবং যেরূপ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপে বর্ণনা এইরূপ—পায়স সরোবরে ডুবিয়া আকণ্ঠভোজন, সুপেয় পানীয় ও মদ্যপানে উন্মত্ত হওন, গন্ধর্ব্বাদির নৃত্যগীতশ্রবণ, স্বর্ণরৌপ্য নির্ম্মিত অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, অপ্‌সরা কর্ত্তৃক পাদ সেবন, স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রে সুখাদ্য নানাবিধ আহার ভোজন, গন্ধ সরোবরে অবগাহন, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর সুখাদ্য তৃণভোজন। এইরূপ উপভোগ করিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতে নিজেদের মধ্যে পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল কে কিরূপ উপভোগ করিয়াছিল, যদিও তখন সেই আশ্রমে তাহার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় নাই।

এই রহস্য সমন্বিত অত্যদ্ভুত ঘটনা কিরূপে সঙ্ঘটিত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে হয় যে ইহা যেন একটি

ইন্দ্রজালের ব্যাপার। ইন্দ্রজাল বা ভোজবিদ্যা দ্বারা অনেক যাদুকর এইরূপ অনেক অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখায় তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমন কি একজন সৈন্যদল সংশ্লিষ্ট উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারী মেজর (major) অনেক দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে অবস্থান কালে একবার, কোন সময়ে, যে রজ্জুদ্বারা শূন্যে আরোহণ ব্যাপার তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান কেহ বলিয়া দিলে, একটি বৃহৎ পুরস্কার দিবেন। তাহার বিবরণ এইরূপ—যাদুকর একগাছি রজ্জুর একপ্রান্ত হস্তে ধরিয়া অপর প্রান্ত উপরে নিক্ষেপ করিলে, তাহা ঠিক সরল ভাবে শূন্যে যেন কাষ্ঠ বা বংশ দণ্ডের ন্যায় স্থির থাকে, আর তাহাই অবলম্বন করিয়া একটী বালক শূন্যে আরোহণ করিয়া অদৃশ্য হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই বালকের রক্তাক্ত কর্ত্তিত ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শূন্য হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া, দর্শকদিগকে রোমাঞ্চিত করে। পরে যাদুকর যখন তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে, তখন সেই বালকই অক্ষত দেহে সেই স্তম্ভিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতেই, যেন কোথা হইতে আবির্ভূত হয়। ইহাই ইন্দ্রজাল বলিয়া কথিত হয়। ভরদ্বাজ ঋষির এই আতিথ্য সংকার যদি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারই হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত সৈন্যদলের দৃষ্টিশক্তি মাত্রই ক্ষণমোহে অভিভূত হইত এবং তাহারা বলিতে পারিত না যে তাহারা তৃপ্তির সহিত ভোজন ও অন্যান্য উপভোগাদিও করিয়াছিল—কেননা ইন্দ্রজালে আপাতদৃশ্যে উৎপন্ন পদার্থের কোন যথার্থ অস্তিত্ব না থাকাতে তাহা ভক্ষিত বা ভুক্তিত হইতে পারে না।

তাহা হইলে ইহা কি যোগ বিভূতি প্রদর্শন অনেকেই এইরূপ যোগ বিভূতি, হঠযোগিদের দ্বারা প্রদর্শিত হইতে দেখিয়াছেন।

দুই এক জন বহুপূজিত গুরু স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ আনন্দনামধারী ব্যক্তিও প্রিয়শিষ্যদিগকে, তাহাদের ইচ্ছামত পুষ্পের ঘ্রাণ যেন সৃজন করিয়াই এবং তুলাকে হীরকাকারে পরিণত করিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাও সংবাদপত্রের সাহায্যে এবং লোকমুখে অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহারা যোগী নামে বিখ্যাত হইলেও তাঁহাদের যোগসিদ্ধি ঐ পর্য্যন্তই হইয়াছে বোধ হয়, কেননা তাঁহাদের সুরম্য অট্টালিকারাজি শোভিত আশ্রমে নানারূপ উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও ভোগরাগাদি দ্বারা পূজিত হইতে দেখা যায়। তাহাতেই বোধ হয় তাঁহাদের শিষ্যেরাও সেই সেই উপাস্য ইষ্টদেবতার আরাধনা সম্বন্ধেই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দীক্ষিত হন। পাতঞ্জলী যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ইহা (যোগ বিভূতিসিদ্ধি) যোগের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য স্বরূপসিদ্ধি বা সমাধি লাভের প্রধান অন্তরায়। যোগিশ্রেষ্ঠ তিব্বতী বাবা বলিতেন যাহারা এইরূপ যোগ বিভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাঁহারা কস্মিন্‌কালেও স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ভরদ্বাজ ঋষি যদি এইরূপ যোগ বিভূতি প্রদর্শন করিয়া আতিথ্য সৎকার সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, এবং সমাধির স্বাদও প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু বাল্মীকি বলিয়াছেন "এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাপ্রতিমেন" অর্থাৎ সমাধিযুক্ত তেজে অপ্রতিম ছিলেন। এই ভরদ্বাজ, যদি বাল্মীকির ভূমিকা লিখিত তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজ হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শিষ্যের সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে যে বিশেষ অবগত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন ভরদ্বাজ অগ্নি গৃহে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পূর্ব্ববর্ণিতরূপে আতিথ্য সাধন করিলেন।

বৈদিক ঋষিরা প্রথমে অগ্নির উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। সেই

আদিম মনুষ্যসমাজের মধ্যে কিরূপে এই অগ্নির পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার ক্রম পরিবর্ত্তনের সহিত তপস্যাও পরিবর্ত্তিত হইয়া শেষে অনেক আত্মজ্ঞানী ঋষির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার একটা ধারাবাহিক সূত্রের অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য, তাহার আহারের জন্য পাইল বৃক্ষের ফলমূলাদি, পানের জন্য নদীর জল এবং আশ্রয়ের জন্য তরুছায়া আর শয্যার জন্য তৃণগুল্মাচ্ছাদিত ভূমিতল। ক্রমে দৈববশাৎ দেখিতে পাইল কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে একটী নূতন পদার্থ আবির্ভূত হইয়া, তাহার উজ্জ্বল আভাতে অন্ধকার নাশ করে এবং তাহার তাপে শৈত্যও দূর করে; আবার তাহাই কোন বৃক্ষে সংযুক্ত হইলে তাহার ফলেরও রূপান্তরবশতঃ তাহা অপক্ক অবস্থায় তিক্ত ও কষায় বিধায় অভক্ষ্য হইলেও, এই রূপান্তরিত অবস্থায় সুস্বাদু ও ভক্ষ্য হয়। এই পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাহারা রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিল এবং এই দীপ্ত অজ্ঞাত পদার্থের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার উপাসনাও করিতে লাগিল। আবার যখন তাহারা দেখিতে পাইল আরও একটী বহু উর্দ্ধে শূন্যে উদ্ভূত দীপ্তশিখা দিগ্‌বিভাসিত করিয়া কোন বৃক্ষের উপর পতিত হইয়া তাহা দগ্ধ করতঃ, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ভূমিতলে উৎপন্ন বিভাশালী পদার্থের ন্যায়ই কার্য্য করে, তখন তাহারা ইহার অবস্থান দিবে বা আকাশে নির্দ্ধারণ করিয়া ইহাকে দেবতা আখ্যায় অভিহিত করিল। এই মনুষ্যসমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মেধাশক্তিসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী ভৃগু, অঙ্গিরাদি ঋষিরাই প্রথমে ইহা পর্য্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারাই এই অগ্নি উপাসনার প্রবর্ত্তক। এ যুগেও এইরূপ অনেক ঋষি এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের ফলেই অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন। মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষদের

মধ্যে তখনও বিবাহপ্রথা প্রচলিত না হওয়াতে এই সমস্ত ঋষিদের পিতার নির্দ্ধারণ না হওয়াবশতঃ কেহ ব্রহ্মার মানসপুত্র, কেহ বরুণের পুত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভৃগু, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য বরুণের পুত্র, আবার বাল্মীকি ঋষিও নিজকে প্রচেতার দশম পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভৃগু কিরূপে বরুণবীর্য্যে জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কোনও বিশেষ উল্লেখ কোথাও না পাইলেও, অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম যে উর্ব্বসীর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বরুণ ও মিত্রের বীর্য্য কুম্ভে পতিত হইয়া, তাহা হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পুরাণের উপাখ্যানরূপে রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। মিত্র বরুণাদি কাল্পনিক দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে (৪।১০) "অহর্বৈ মিত্রো রাত্রির্ব্বরুণ" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিতে অহঃ মিত্র কেননা দিবাভাগে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয় এই জন্য দিবা মিত্র; পক্ষান্তরে রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত আবৃত থাকাতে দৃষ্টির অভাবে তাহা সিদ্ধ হয় না; তাই বৃ ধাতু আবরণ অর্থে সাধিত বরুণ অর্থে রাত্রি। ভৃগু প্রভৃতি ঋষির জন্ম সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া যেন তাহা অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এই ভৃগু ঋষিই প্রথমে অন্ধকাররূপ আবরণে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অগ্নি উপাসক, তৎপরে তাহার কিঞ্চিৎ অপসরণে দিবিরও উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠদৃষ্টি-সম্পন্ন বিষ্ণু উপাসক, আবার সেই পিতা বরুণ কর্ত্তৃকই যেন সেই অজ্ঞান আবরণ উন্মোচনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মা উপাসক আত্মজ্ঞানী সত্যদর্শী মহর্ষি—আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শকরূপে উপনিষদে উক্ত হইয়াছেন।

এখন এই উপাসনার ক্রম অভ্যুত্থান বৈদিক ঋষি সমাজে কিরূপে সংগঠিত হইয়াছিল—কিরূপে অগ্নির জ্ঞান হইতে তাঁহারা আত্মজ্ঞান

লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটা আনুমানিক প্রণালী চিন্তা করিলে তাহার ধারা এরূপও হইতে পারে। অগ্নির দাহ করিবার এবং তেজ দ্বারা উত্তাপ প্রদানের শক্তি সকলেরই প্রত্যক্ষ। একটী স্ফুলিঙ্গাকার অগ্নি বর্দ্ধমান হইয়া কত বড় একটী দেহ ও তৎসহিত ৪।৫ মণ কাষ্ঠ দাহন করিলে তাহার চিহ্নস্বরূপ পড়িয়া থাকে কিঞ্চিৎ ভস্ম। ইহার সহিতই যদি আমরা তুলনা করিয়া দেখি, যে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাশি রাশি আহার্য্য পদার্থ আমাদের জঠরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পরিণতি দিনমধ্যে একবার সময়বিশেষে মলত্যাগ, (চিকিৎসকেরা বলেন যাহার মল অল্প ও নাতিকঠিনাকারে নিয়মিত প্রাতঃকালে পরিত্যক্ত হয়, তাহার অগ্নি স্বাভাবিক গুণশালী ও প্রকৃতিস্থ) আবার সেইরূপই যে পরিমাণ পানীয় গৃহীত হয়, তাহারও পরিণতি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ মূত্র ত্যাগ, তাহা হইলে ইহাই অনুমিত হয় যে আমাদের জঠরে অগ্নির ন্যায়ই কোন শক্তি আছে যাহা দ্বারা এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, নতুবা বাল্যাবধি বার্দ্ধক্য ও মরণ পর্য্যন্ত এই গৃহীত আহার্য্য ও পানীয় একস্থানে রাশীকৃত হইয়া সঞ্চিত হইলে তাহা যথাক্রমে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়াকারে বা সরোবরাকারে পরিণত হইত। আবার সেই অগ্নি সদৃশ পদার্থ যতক্ষণ আহার্য্য পাইয়া প্রজ্জলিত থাকে, ততক্ষণ তাহারই ন্যায় এই বিশাল দেহ আনখাগ্র তাহার তাপ রক্ষা করে। আর তাহার অন্তর্ধানেই দেহ শবে পরিণত হয়।

অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বলে "পেট জ্ব'লে গেল"। সুতরাং বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সেই জ্বালা সমভাবেই অনুভূত হয়। অগ্নিতে কোন অঙ্গ দগ্ধ হইলে লোকে বলে জ্ব'লে গেল। এই অগ্নির গুণকার্য্য আমরা, দৃষ্ট অগ্নি

হইতেই উপলব্ধি করিয়া তাহাকে 'জলা' বলি। অভ্যন্তরের সেই পদার্থ যাহার গুণে এই 'জলা'রূপ অনুভূতি হয়, তাহা দেখিতে না পাইলেও, একইরূপ পদার্থের একইরূপ গুণ হয়, ইহাই স্থির করিয়া আমরা কি বলিতে পারি না যে পেটেও তাহ'লে অগ্নি আছে? আর সেই অগ্নিই, পার্থিব অগ্নি যেরূপ সমস্ত পদার্থকে ভস্মাকারে পরিণত করে, সেইরূপ তাহাতে প্রদত্ত আহার্য্যরূপ পদার্থকে মলাকারে পরিণত করে এবং নিজ তাপ সমস্ত দেহে বিকীর্ণ করিয়া তাহার তাপ সমভাবে রক্ষা করে। পাথিব অগ্নি অতি আয়াসে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে একবার উৎপন্ন হইলে, তাহাকে সমভাবে ইন্ধন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রাখিবার জন্যই তখন গৃহে গৃহে নিত্য যজ্ঞ আচরিত হইত এবং যে গৃহে সেই অগ্নি রক্ষিত হইত তাহাকেই অগ্নিগৃহ বলা হইত। বৈদিক ঋষিদের যখন এই বাহ্য অগ্নির দৃষ্টান্তে অভ্যন্তরের অগ্নিরও উপলব্ধি হইল তখন তাঁহারা তাহাতেই তাঁহাদের মনরূপ ইন্ধন প্রদান করিয়া মন দ্বারাই তাহার তেজ ও দীপ্তি অনুভব করিলেন—যেন সেই ইন্ধনরূপ মনই অগ্নি সংস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হইল। এক কথায় তাঁহাদের দেহাভ্যন্তরের অগ্নি-দৃষ্টি হইল। তখন তাঁহারা ধ্যানস্থ হইয়া, প্রথমে পাথিব অগ্নির ন্যায়ই, তাহারও হিরণ্য আভা দেখিলেন। পার্থিব অগ্নি কোন দাহ্যপদার্থ সংযুক্ত হইলেই, তাহা হিরণ্যাভরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বিদ্যুৎরূপে ঈষৎ লাল-আভা শুভ্রজ্যোতিশালী। মন সূক্ষ্ম পদার্থ বিধায় তাহা দাহ্য নহে। সুতরাং সূক্ষ্ম মনে সেই বিদ্যুতেরই সূক্ষ্ম শুভ্র জ্যোতি প্রতিভাত হওয়াতে, তাঁহারা এই সূক্ষ্ম শুভ্র জ্যোতিই, ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করতঃ মনকে সূক্ষ্মাকারে পরিণত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া, দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রকৃত অগ্নির স্বরূপ সেই

বিদ্যুৎবর্ণ এবং তাহা ক্ষণে ক্ষণে আভা প্রদান করিয়া যেন নির্ব্বাপিত হইয়াই অদৃশ্য হয়। তাঁহারা এই অগ্নিকে দেহের সংযোগচ্যুত করিবার জন্য সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রিয় সংযোগে মন দ্বারাই দেহজ্ঞান সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার বন্ধ করিয়া মনকে তৎস্থানচ্যুত করিতে পারিলেই দেহজ্ঞান-শূন্যতার অবস্থা উপজিত হয়। আর সেই অবস্থা আসিবার সময়ই সেই হিরণ্য বা লালবর্ণজ্যোতিই দেখিতে পাওয়া যায়। লালবর্ণজ্যোতিই প্রত্যক্ষ অগ্নির জ্যোতি, তাই তাঁহারা স্থির করিলেন দেহাভ্যন্তরেই অগ্নিরূপজ্যোতি আছে, কেননা ইহা বাহির হইতে প্রাপ্ত নহে। চক্ষু বন্ধ সুতরাং ইহা বাহির হইতে আইসে নাই। তারপর আরও সাধনায় অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সেই অগ্নির লাল জ্যোতিতেই ক্রমে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ লালআভজ্যোতি দেখিলেন তাহা বিদ্যুতের ন্যায়ই সময়ে প্রকাশ সময়ে অপ্রকাশ হইয়া থাকে। ক্রমে সাধনায় অগ্রসর হইয়া একাগ্রতা সিদ্ধি হইলে এই ক্ষণদৃশ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিই স্থির সৌদামিনীরূপে পরিণত হয়। তিব্বতী বাবা এই স্থির সৌদামিনীর কথাই বলিতেন। তখন আর কিছুরই অনুভূতি থাকে না—যেন দেহখানিই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া তাহার আকারাদি অদৃশ্য হয়। আর ইহাই আত্মার জ্যোতি। তখন সাধক উপলব্ধি করে—আমিই আত্মময় আর ইহা আমারই জ্যোতি। তারপর যখন সেই জ্যোতি দেহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া যেন তাহাকে জ্বালাইয়া, সর্ব্বব্যাপ্ত হয়, তখন সাধক উপলব্ধি করেন আমারই জ্যোতিতে বিশ্ববিভাসিত, যেন আমিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা-বিশ্বকর্ম্মা। সেই জ্যোতি দর্শনকারী মনও তাহার এই ক্ষুদ্র দেহরূপ পঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপ্ত হয় এবং তাহারও নিজের বিশ্বসৃষ্টিরূপ শক্তির অনুভব হয়। তখন

সেই বিশ্বব্যাপ্ত মনই বিশ্বকর্ম্মা হয়, দেবতা হয়, নদী হয়, স্থাবর জঙ্গম হয় এবং তাহার আদেশেই যেন এই সমস্ত তাহার সকাশে উপস্থিত হয়। আর সেই সমষ্টি মনই ব্যষ্টি হইয়া প্রত্যেক প্রাণীদেহে প্রবিষ্ট হইয়াও ভূমা অবস্থাতে থাকে যেমন মোটরের কেন্দ্রীভূত সমষ্টি শক্তি ব্যষ্টি হইয়া চক্র ও যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজশক্তি অব্যাহত রাখে। সেই মটরের শক্তি অপহৃত বা ব্যাহত হইলে সেই সমস্ত চক্র ও যন্ত্রও হৃতশক্তি হয়। যেমন সমষ্টি জলের উৎসপ্রস্রবণ হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু উৎসারিত হইয়া সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান সিঞ্চিত করে, তেমনি এই সমষ্টি মন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি মন উৎসৃষ্ট হইয়া সমস্ত দেহের সমস্ত মনকে অভিভূত করিয়া, সেই সমষ্টিমনে যাহা কামনা করে তাহাই সেই সমস্ত মনে সঞ্চালিত করে। সেই সমষ্টিমনে যে কামনা সিদ্ধ হয় তাহাই সমস্ত দেহস্থ মনেও যেন সিদ্ধ হয়। তারপর এই মনের লয়েই সমাধি—যেন মনেরই সমাধি সাধিত হয়। তখন সমস্ত শূন্যাকার। সৃষ্টিই যেন তখন সেই শূন্যে লীন হইয়াছে। পুনরায় সেই সমাধি হইতে ব্যুত্থিত যোগি ক্রম অবতরণে সেই সর্ব্বব্যাপ্ত শুভ্রজ্যোতি দর্শন করিতে করিতে ক্ষুদ্র জ্যোতি দর্শন করিয়া, তাহা অগ্নিরূপে দর্শনকরতঃ পুনরায় ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লিপ্ত হইয়া জাগরণ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। তখন আর সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অসাধারণ দর্শনের কোন নিদর্শন থাকে না।

এখন "সমাধিযুক্ত অপ্রতিমতেজ সম্পন্ন যোগী ভরদ্বাজ যদি ধ্যানস্থ হইয়া নিজ দেহস্থ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া তৎপরে উপরে বর্ণিত প্রণালীতে কার্য্য করেন এবং সমষ্টি মনের প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি মন প্রত্যেক সৈনিকের দেহে সঞ্চালিত করিয়া নিজের কল্পিত কামনা সিদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত সৈন্যদের মনেও সেইরূপ ভোগ

কামনা সিদ্ধ না হইবার কোন হেতু নাই। নিজের মনে চিন্তিত বিষয় অন্যমনে সংক্রামিত করিবার দৃষ্টান্ত আধুনিককালেও বিরল নহে। সুতরাং ইহা যোগ বিভূতি নহে। ইহা আত্মজ্ঞ সমাধিজ্ঞানসম্পন্ন যোগির আত্মার প্রসার মাত্র। আর এই স্বানুভূতি বাল্মীকির নিজস্ব ছিল, এবং তাহাই তিনি রূপকাকারে এই রহস্যান্বিত অদ্ভুত কাহিনীতে বর্ণনা করিলেন। ইহারই অনুকরণে, ব্যাসদেব মহাভারতে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার পারণ বর্ণনা করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণকে আত্মার স্থানে স্থিত করিলেই তাহার সমন্বয় হয়। দ্রৌপদীর আত্মা তখন কৃষ্ণময় হইয়াছিল আর সেই কৃষ্ণময় আত্মাই সেই সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইয়াছিল—যেন কৃষ্ণই তাহা করিলেন। এখন এই অগ্নি, যে জঠরেই আছে তাহার জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় লোকের দেহের তাপ অপেক্ষা মুখাভ্যন্তরে তাপ বেশী। তাপমান থারমমিটার যন্ত্রেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া কণ্ঠনালী বাহিয়া, তাহার অন্তে যে একটী আধার আছে, তাহাতেই আহার্য্য পদার্থ গ্রাসিত হইয়া স্থিত হয়, এবং তথাতে তাহা ভস্মের আকারে আরও চূর্ণিত হইয়া বালুকাকারে পরিণত হয়, তাই বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে যে অশ্বমেধের অশ্বের উদরে জীর্ণ যে ঔদধ্যং তাহাই সিকতা অর্থাৎ বালিরাশি। ভরদ্বাজ ঋষির আতিথ্য সংকার যে এইরূপই হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কি কষ্ট-সাধ্য বলিয়া এখনও বোধ হইতে পারে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাম কর্ত্তৃক জাবালি ভৎর্সনা

ভরত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়া, রামকে অনেক কাকুতি মিনতি করতঃ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রার্থনা করিলে, রাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন তিনি পিতার সত্যরক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাস গ্রহণে যে দৃঢ় পণ করিয়াছেন তাহাই পালন করা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তখন দ্বিজবর জাবালি "জাবালি ব্রাহ্মণোত্তম" রামকে এই কথা বলিলেন "ভাল রাম! তুমি সুবুদ্ধি ও তপস্বী, অতএব সামান্য মানুষের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য পালন বিষয়ক এইরূপ নিরর্থক বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে। দেখ! এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি কি পাইয়া থাকে? জীব একাকীই জন্ম লয়, আর একাকীই বিনষ্ট হয়; অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে বাতুল জ্ঞান কর; বস্তুতঃ কেহই কারও নয়। যেমন লোক গ্রামান্তরে যাইয়া কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরের দিন সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তেমনি পিতা, মাতা গৃহ ও ধনসম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাস মাত্র। এজন্য সাধুরা বিষয়ে আসক্ত হন না। নরোত্তম! পৈত্রিক রাজ্য ছাড়িয়া দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ বিষম কুপথে বাস করা তোমার উচিত হয় না। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাতে রাজপদে অভিষিক্ত হও, বিরহিণীর ন্যায়

একবেণীধরা নগরী তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। দশরথ তোমার কেহই নহেন, রাজা স্বতন্ত্র, তুমিও স্বতন্ত্র ব্যক্তি; অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবনের বীজ অর্থাৎ নিমিত কারণ মাত্র। ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে মনুষ্যের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গিয়াছেন, তোমাকেও সেই স্থানে যাইতে হইবে। সুতরাং তোমার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? ভূতসকলের স্বভাবই এইরূপ। কিন্তু তুমি পুরুষার্থ ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা: প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে উৎসুক হয় আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, অন্যের জন্য শোক করিনা, কেননা তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া পরলোকে অভিলষিত ধর্ম্মফলও পায় না। কারণ ফলভোক্তারই সত্তা নাই। অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করাতে কেবল নিজ ভোগসাধন অন্নাদিরই বিনাশ হয়, কেননা মৃতব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে যায়, তবে প্রবাসস্থব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক। কৈ এরূপ করিলে তাহা পথিকের পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ কর, তপস্যাকর এবং সন্ন্যাস গ্রহণ কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায় স্বরূপ বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থ সম্পাদন কারণ ও পামরগণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। মহামতি! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছু নাই, তুমি নিজ বুদ্ধি বলে ইহা অবগত হও। যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানগ্রাহ্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর। প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের

সর্ব্বলোকসম্মত বুদ্ধিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তুমি রাজ্যশাসন কর”।

রাম কহিলেন “আপনার উপদেশানুসারে আমি সত্য প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাহীন হইলে পিতৃবাক্য রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্ত হইব? মুনিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন্, পরলোকে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। লোকে সত্যই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য-পদ বাচ্য। ধর্ম্ম সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া সকল, যে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই বেদই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায়, ঈশ্বর হইতে বেদ আবির্ভূত হইয়াছে। আপনি আমাকে রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজের হিতসাধন করিতে যে উপদেশ দিলেন ইহা আমার নিকট অন্যায্য বোধ হইতেছে। আমি ফলমুল ও পুষ্পদ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক তাহাই ভোজন করিয়া পঞ্চইন্দ্রিয়েরও সন্তোষ বিধান করতঃ শ্রদ্ধাবান ও কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ হইয়া, পিতার সত্য পালন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্ম ভূমিতে জন্মলাভ করিয়া কল্যাণকর কর্ম্ম অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। কারণ অগ্নি, বায়ু ও সোম এই দেবতাত্রয় কর্ম্মের ফলভাগী অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মানুসারে ঐ তিন দেবলোকই পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্রতপস্যা করিয়াই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য, ধর্ম্ম, চান্দ্রায়নাদি তপস্যা, সর্ব্বজীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব, দ্বিজ ও অতিথি সৎকারকেই সাধুগণ স্বর্গের পথ বলিয়া থাকেন। আমার এই কথা অনুসারে অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ অনুকূল তত্ত্ব অবলম্বন

করিয়া যথাবিধি ধর্ম্ম আচরণ করিয়া বেদবাক্য প্রতিপালন করতঃ, অভিপ্রেত লোকাদি প্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি এইমাত্র যে বিষম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মপথের বিরুদ্ধে নাস্তিকের মত কথা বলিলেন তাহার জন্য আমি, আমার পিতা যে আপনাকে যজ্ঞ-কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমার পিতার সেই কৃত কার্য্যের নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধ তথাগত নাস্তিক ও আপনিও সেইরূপ দণ্ডার্হ জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধি পরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা রাজার কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তি অধার্ম্মিক নাস্তিক ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপও করে না। আমি সত্য প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত না হইয়া পিতার সত্যস্বরূপ নির্দ্দেশ পালন করিয়া, আমি ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।” মহাতেজা রাম সক্রোধে এইরূপ বলিতে থাকিলে, দ্বিজবর জাবালি তখন আস্তিক্য যুক্ত সুপথ্য সত্যবাক্য বলিলেন “আমি নাস্তিকদের কথা বলিতেছি না আমি নিজেও নাস্তিক নহি। নাস্তিক বলিয়াও কিছু নাই “ন চ নাস্তি কিঞ্চন’। সময়ক্রমে আমি আস্তিক হইলাম। সময় বশতঃ কখন নাস্তিক ও হই। যে সময় নাস্তিকের ন্যায় কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশঃ গত হইয়াছে। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্যই আমি এইরূপ কথা বলিয়াছিলাম।”

পরে রামকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন “রাম! জাবালি নাস্তিক নহেন। ইনিও লোকালোকে গতাগতির বিষয় সম্যক অবগত আছেন। কেবল তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসেই তিনি ঐসব কথা বলিয়াছেন।” বশিষ্ঠ তখন বলিলেন “কারণোপধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যত্বাদি গুণযুক্ত

শাশ্বত ও অব্যয় ব্রহ্মা সমদ্ভুত হন্; ব্রহ্মা হইতে মরীচি। মরীচি পুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র মনু এবং মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু প্রথমে অযোধ্যার রাজা হন্। আর সেই ইক্ষ্বাকু বংশেই তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। এই বংশে অগ্রজ সন্তানই রাজা হন্। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাভিষিক্ত হয় না। সুতরাং তোমার এক্ষণে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি পিতার ন্যায়, বহু রাজ্যশালী এই পৃথিবী পালন কর। পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে, আচার্য্য, পিতা ও মাতা এই তিনজন তাহার গুরু হন্। পিতা পুরুষকে জন্ম দেন, আচার্য্য তাহাকে জ্ঞান দান করেন। এজন্য তিনি গুরুপদ বাচ্য। আমি তোমার পিতারও সেই আচার্য্য। অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে কদাচ সদ্‌গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। রাম কহিলেন "পিতামাতা নিয়ত সন্তানের জন্য তাহার জন্মাবধি তাহাকে লালন পালন করিয়া যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিদান কখনই সম্ভব নহে। সেই রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা, তিনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাঁহার সে বাক্য মিথ্যা হইবে না।"

জাবালি ব্রাহ্মণোত্তম, দশরথের যজ্ঞের ঋত্বিক। তাঁহার কর্ত্তৃক এই নাস্তিকোচিত বাক্য যেন চার্ব্বাকমুখ নিঃসৃত নাস্তিক্যেরই উদ্গীরণ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং বুঝা যায় তখন বা তৎপূর্ব্ব হইতেই চার্ব্বাক দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ তখন কোথা হইতে দেখা দিলেন? বুদ্ধদেব তো, তাহার প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার তথাকথিত শূন্যবাদও নির্ব্বাণমুক্তির বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে নাস্তিক ছিলেন না তাহা পাঠক মনীষী পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ

"বুদ্ধের নাস্তিকতা" শীর্ষক গ্রন্থে বেশ দেখিতে পাইবেন। আমাদেরও সেই মত। বুদ্ধের শূন্যই উপনিষদের ব্রহ্ম "যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্য ব্রহ্ম ব্রহ্মবাদিনাং" ইহা উপনিষদেই আছে। আমরা এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে শূন্যাকারেই উল্লেখ. করিয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষিও তাহা হইলে শূন্যবাদী, কেন না তিনি বলিয়াছেন "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" আকাশও শূন্য। সুতরাং আকাশ যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছে, সেই জন্মদাতা আত্মাও শূন্য। আবার বৈদিক ঋষিও জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"অহং সুবেপিতরমস্য মূর্দ্ধন্।" আমি এই পিতরং রূপ আকাশের প্রসবয়িতা ও তাহারও শীর্ষোপরি। একটা কিছু না থাকিলে তাহা হইতে আর একটা কিছু জন্মিতে পারে না। বীজ না থাকিলে তাহা হইতে অঙ্কুর হয় না। "অসতো সদজায়তঃ"। যদি একটা কিছু ছিলই, তাহা হইলে তাহা শূন্যাকারেই ছিল। শূন্যরূপ আকাশ হইতে পর পর বায়ু, জল ও পৃথিবী হইল। সুতরাং আকাশ শূন্য হইলেও একটা বস্তু। আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কাজেই তাহার সত্ত্বাও উপলব্ধি করিতে পারি না। গণিতেও বলে শুধু শূন্যের পর যাহা থাকে তাহার মূল্যও শূন্য। কিন্তু শূন্য আকাশ হইতে যাহা হইয়াছে তাহার মূল্য আছে। এই আকাশ ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে। কাজেই আপাত-দৃশ্য শূন্য। আকাশকে নীলবর্ণ কটাহাকারে দৃষ্ট হয়। তাহা আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমরাও সেই শূন্যের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি না, তাই বলি শূন্য আকাশ—সত্ত্বাহীন। বুদ্ধ ও জাবালি এই শূন্যের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং জাবালির উপদেশকে নাস্তিকতা অভিহিত করিয়া, তাঁহাকে চার্ব্বাকের পর্য্যায়ে ফেলিয়া, আবার তাহার সহিত বুদ্ধেরও নাস্তিকতা উল্লেখ করিয়া একটা সমভাবের সমাবেশ করা

হইয়াছে। তাই বোধ হয় ইহা পরবর্ত্তী, বৌদ্ধধর্ম্মের উৎসন্ন করিয়া, নির্ব্বাপিত প্রায় তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কঙ্কালসার বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির পুনঃ প্রচলন জন্য, মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরূপপাষণ্ডদলনকারী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক, বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত এইস্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আর তাহাই মূল বাল্মীকি রামায়ণে সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহা যে বাল্মীকিরই উক্তি তাহাই প্রমাণিত করা হইতেছে।

জাবালি কি প্রকৃতই নাস্তিক ছিলেন ? তিনি নিজেই বলিয়াছেন তিনি যখন নাস্তিক ছিলেন, সেই সময় ক্রমশঃ অতিবাহিত হইয়া এখন ধীরে আস্তিকতার কালই আসিতেছে। তিনিও প্রয়োজন বোধে কখনও নাস্তিক আবার কখনও আস্তিক সাজেন।

"নিন্দাম্যহং কর্ম্মকৃতং পিতুস্তদ্
যংত্বামগৃহ্ণাদ্বিষমস্থ বুদ্ধিম্।
বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্ম্মপথাদপেতম্॥
যথা হি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি॥
...উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঞ্চ
সত্যং বচঃ সান্ত্বনয়ঞ্চ বিপ্রঃ॥

ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবম্
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ॥
স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈ—
র্যথা ময়া নাস্তিক বাগুদীরিতা।
নিবর্ত্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
প্রসাদনার্থঞ্চ ময়ৈতদীরিতম্॥"

অর্থাৎ তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে দশরথের যজ্ঞভূমিতে ঋত্বিকরূপে ব্রতী হইয়া যজ্ঞফলে বিশ্বাসী, সুতরাং আস্তিক রূপে সমাদৃত। তখনকার রাজারা প্রায় অধিকাংশই অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া স্বর্গলাভ প্রয়াসী ছিলেন। বেদেও কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই প্রকারই আছে। জ্ঞানকাণ্ডে সাধনা ও তপস্যা দ্বারা নিশ্রেয়সঃ বা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, আর কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদির ফলে অগ্নি, বরুণ ও সোমের লোক বা স্বর্গলাভ।

জ্ঞানকাণ্ডে সমস্ত সাংসারিক সুখভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া, অধিকাংশ অবস্থায় লোকালয় বা জনপদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে বাস করিয়া সাধনাই মুখ্যপন্থা। তাই তাহাকে আরণ্যক উপনিষদের জ্ঞান কহে। এই তত্ত্বজ্ঞান, রাজ্যভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়া অর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং রাজারা এই জ্ঞান মার্গের আচরণ করিতে অধিকারী হইতে পারিতেন না। তাই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম মার্গে প্রবৃত্ত করাইয়া, স্বর্গাদিলাভের প্রলোভনে, এই যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রচলন করিয়াছিলেন। জাবালি ঋষি ব্রাহ্মণোত্তম অর্থাৎ একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জবালা নাম্নী কোন ব্রাহ্মণেতর নারীর গর্ভে অজ্ঞাত পিতৃ ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃনামেই জাবালি নামে পরিচিত। তিনিই পরে ব্রাহ্মণোত্তমগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণপদে উন্নীত হইয়া সত্যকাম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই, তিনি জাতিগত ব্রাহ্মণ্যপদ প্রাপ্ত না হইয়াও প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হওয়াতেই, সমস্ত ব্রাহ্মণোত্তমগণ সহিত রাজা দশরথের গৃহে ঋত্বিকপদে বৃত হইয়া, বশিষ্ঠাদি কর্ত্তৃকও সমাদৃত হইতেন। তাঁহার নাস্তিক্য, তাহা হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানই প্রমাণিত হয়। এই আত্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষদিগকেও সাধারণতঃ নাস্তিকই বলা হয়। তাই বেদান্তভাষ্যকারী আচার্য্য শঙ্করও গুপ্তনাস্তিক বা প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা, অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবিদ্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, তাঁহার পত্নীকে অমৃতপ্রাপ্তির উপায় বলিতে যাইয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই, জাবালির উক্তির সহিত তুলনার জন্য, অনধীত পাঠকবর্গের বিদিতার্থ, সংক্ষেপে সরল ভাষায় উল্লেখ করিতেছি। ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে।

যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি রাজর্ষি জনককে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীদ্বয় মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে তাঁহার ধন-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে, মৈত্রেয়ী বলিলেন "এই ধন-সম্পত্তি তো ধ্বংসশীল, ইহা হইতে কি অমৃত পাইব? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয় কথাই বলিয়াছ। ইহা তো সামান্য, তুমি সমস্ত পৃথিবীর বিভব পাইলেও অমৃতের সন্ধান পাইবে না যেহেতু এই পৃথিবীটাও বিনাশশীল। তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, "আমি এই তুচ্ছ ধনসম্পত্তি লইয়া কি করিব, আমাকে সেই অমৃতের সন্ধান দিন।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অরে মৈত্রেয়ী! পতির কামের (প্রীতির) জন্য পতি কখনই পত্নীর প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্য পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকে। পতি যে পত্নীকে ভালবাসে সে নিজের স্বার্থের জন্যই—তাহার বংশরক্ষা করিতে হইবে, সেই সন্তানকে লালন-পালন করিতে হইবে, গার্হস্থ্য সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদন করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইবে, আর জরাবস্থায় সেবাও চাই—এই সমস্ত কামনা সিদ্ধির জন্য। পক্ষান্তরে পত্নী স্বামীকে ভালবাসে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য—তাহার স্বামী তাহার অন্ন বস্ত্রদাতা ভয়ত্রাতা ও ইন্দ্রিয় ভোগের সহায়। পিতা তাহাকে বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন, তিনি নিজ সম্পত্তি নিঃশেষে পুত্রগণকে দিয়া তাহাকে তাহাতেও বঞ্চিত করিয়াছেন; তাহার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? তাই স্বামীর প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, তাহার একমাত্র আশ্রয় স্থানই স্বামীপদতল। পিতা পুত্রকে ভালবাসে, পুত্র পিতাকে ভালবাসে এইরূপেই নিজ নিজ কামনা সিদ্ধির জন্য। দরিদ্র পিতা, সন্তানকে মানুষের মত করিবার জন্য, নিজে আধপেটা খাইয়াও তাহার চেষ্টা

করে—ভবিষ্যতে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে ভরণপোষণ করিবে। আর বিত্তশালী পিতা বা পেনসনভোগী পিতা অতি দীর্ঘজীবী হইলে সন্তানের নিকট সেবা পাইবার জন্য এবং নিজের বংশগৌরব রক্ষার জন্য, পুত্র পৌত্রের জন্য, বিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখেন। পেনসন ভোগী পিতার না কতই আদর! পুত্রও পিতার নিকট কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করে; বিত্তশালী পিতার দীর্ঘপরমায়ু হইলে, তাহার মৃত্যুকামনাও করে। মাতাও পুত্রের লালন পালন করে—পুত্রের নিকট ভবিষ্যৎ প্রতিদান প্রাপ্তির কামনায়। নিয়মিত রাজস্ব প্রাপ্ত হইলেই, প্রজা প্রিয় হয়, রাজাও প্রজারঞ্জক হয়। রাজাও প্রজার হিতার্থ অর্থব্যয় করিলে 'রামরাজা' হয়। প্রবাসের ভোগসুখ বিলাসে প্রমত্ত রাজা তাহার প্রজার প্রিয় হন কি? নিজের প্রীতি ও মঙ্গল সাধনের জন্যই দেবতার পূজা করা হয়, আবার সেই দেবতাই যখন বারমাসে তের পার্ব্বণে পূজাভোগাদি খাইয়াও, একটী প্রিয় পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, তখন অকৃতজ্ঞ বোধে পরিত্যক্ত হন। দেবতাও যদি সত্য পূজা ভোগ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন, তাহা হইলে সেই মামুলি সেবা পাইবার আকাঙ্ক্ষাতেই, তাঁহার পূজককে প্রিয় মনে করেন। বস্তুতঃ পক্ষে "অপরের জন্য কাঁদে হেন জন আছে কি ধরায়?" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জাবালি ঋষি ও যাজ্ঞবাল্ক্য একই রূপ উক্তি করিয়াছেন। জীব যে একলা নিঃসম্বল আসে আবার একলা নিঃসম্বল যায়, ইহা তো লোকের সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। দুদিনের জন্য আসিয়া লীলাখেলা বইতো নয়? তাই কবি অমৃতলাল বলিয়াছেন "হেসে নাও দুদিন বইতো নয়, কে জানে কবে কার সন্ধ্যা হয়"; গিরিশচন্দ্র গাহিলেন

"মন আমার দিন কাটা'লি, মূল খোয়ালি' ভাল ব্যাসাদ ক'র্‌লি ভবে।
একলা এ'লে একলা যা'বে, মুখচেয়ে কার আছ ত'বে।
কে তুমি? বলছ কারে! দেখ্‌ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে
তোর ভাঙ্গ্‌বে মেলা, ভবের খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে॥"

শাস্ত্রে বলে যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনে পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ হয়। কে কবে মৃত্যুর পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্মৃতি পুনর্জন্মে অব্যাহত রাখিয়া সেই অবস্থার কথা বলিতে পারিয়াছে? বড় জোর শুনিতে পাওয়া যায় কোন কোন শিশু তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা কিছু স্মরণ রাখিয়া তাহা বলিতে পারে। তাহার মৃত্যু হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের মধ্যভাগে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহার কথা কেহই বলিতে পারে না। যদি উপনিষদের মতে, জীব জলৌকার (জোঁকের) মত একই সময়ে একদেহ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দেহ আশ্রয় করে তাহা হইলে আর মধ্যবর্ত্তী কোন কাল থাকে না এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্য দ্বারা পিতৃপিণ্ডদানেরও কোনও সার্থকতা থাকেনা। অধুনাতন উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃবৃত্তি প্রাপ্ত বা দারিদ্র্য হইতে স্বীয় পৌরুষবলে উপার্জ্জিত ধনে বিত্তশালী ব্যক্তিরা, যে মহা আড়ম্বরে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন তাহার অধিকাংশই নিজদের ধনগর্ব্ব প্রকাশের বা যশাকাঙ্ক্ষা প্রকাশেরই প্রতীক নহে কি? কেহ হয়তো তাহাদের এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃও তাহা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বিশ্বাসীরাই এই শ্রাদ্ধাদিকার্য্য বিনা আড়ম্বরেই অনুষ্ঠান করেন। তাই বোধ হয় ইহাই অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজন বোধে, আবার সেই উপনিষদকারই বলিয়াছেন এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে কোন কোন জীবাত্মা তাহার লিঙ্গশরীর সহ প্রেত বা সূক্ষ্ম শরীরে থাকে এবং যতদিন তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মাকর্ম্মের

ভোগের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থান না প্রাপ্ত হয়, ততদিন স্থূল দেহ ধারণ করে না। লোকের সদাচরণে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য এই উক্তি বিশেষ সহায়, অন্যথা সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইলে সমাজবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জনসমাজ ধ্বংসের পথে যাইবার সম্ভব। যদি এই উক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ দেহে মন থাকাতেই ঐ জাতিস্মরগুলি তাহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছিল। যদি মনই ছিল, তাহা হইলে কেন তাহারা এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থার কথা বলিতে পারে না? লিঙ্গদেহে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই আঠার ১৮ তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে থাকে ইহাই সাংখ্যমত। যদি লিঙ্গদেহ পিতৃ, বরুণ, চন্দ্র লোকাদি বা স্বর্গাদি স্থানে যথাযথ ভোগ করিয়াও ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মাকর্ম্মের ফলানুযায়ী, শাস্ত্রকারদের মতে, পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করে, তাহা হইলে জাতিস্মরদের সে স্মৃতিও অব্যাহত থাকিত। কিন্তু এরূপ কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? সুতরাং প্রমাণাভাবে শাস্ত্রকারদের সহিত এ বিষয়ে অনেকেই একমত না হইতে পারে। হয় জীব লিঙ্গদেহে শূন্যেই, কিছুকাল তাহার আশ্রয়স্থান নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে, অথবা সে লিঙ্গদেহ বর্জ্জিত হইয়া মুক্ত হয়। তাই সেই শূন্য অবস্থায় মনের কিছু দৃষ্ট না হওয়ায় সে স্থানের অবস্থারও কোন স্মৃতি থাকে না। লিঙ্গদেহ বর্জ্জিত হইতে হইলে তাহার মনে যে কামনার বা ভোগের সংস্কার বা বস্ত্রের ছাপের ন্যায় দাগ বা গন্ধ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হওয়ার ন্যায় ভাব থাকে তাহাও পরিত্যক্ত হওয়া চাই। দাগশূন্য শুভ্রবস্ত্র বা গন্ধশূন্য বিশুদ্ধ বস্ত্র, অনেক ধোপের পরই হয়। সেই রূপ এই মনকেও শুদ্ধ করিতে হইলে বা তাহাকে সমস্ত কামনা বাসনার ছাপ, দাগ বা গন্ধভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে, তাহাকে অনেক ধোপ

খাওয়াইতে হয় এবং তাহা নিজেই করিতে হয়। সেই আচরণ সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা কৃত হয়। উপযুক্ত গুরু, সেই ধৌত করার উপাদান বা মালমসল্লা ও তাহার প্রণালীর উপদেশ দিতে পারেন। রজকের ন্যায় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমটা নিজকেই করিতে হয়। এইরূপ অনেক 'আছড়ানে' ধোপ খাইলে সেই বস্ত্রের লিপ্ত ছাপ বা দাগ বা গন্ধ ভাব রূপ অক্লিন্ন পদার্থ হইতে মনও মুক্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব হয় এবং মনও লয় হয়। কেননা মন, নির্ম্মল নিশ্চল স্থির সমুদ্রের ন্যায় পরমাত্মায়, তাহাতে (সমুদ্রে) বাত্যা বিতাড়িত ক্ষুব্ধ তরঙ্গের উত্থানের ন্যায়, চঞ্চলতারূপে উত্থিত হয়। এই বাত্যাই পরমাত্মার কল্পনা বা কামনা বা ঈক্ষণ। সেই কামনা প্রসূত মন দ্বারাই পরমাত্মার বিভুরূপে প্রকাশ। আবার সেই কামনারূপ বাত্যার অভাবেই তরঙ্গের ন্যায়ই সেই মনও পরমাত্মায় লীন হইয়া অদৃশ্য হয়, ও তাহার সহিত একাকার হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জীবের এই দুই পরিণাম। হয় তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ, অথবা তাহারই মত একবারে সমুদ্রজলে বিলীন হইবার পর পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য মিলন বা তাহাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হওন। মনের এই বিনাশপ্রাপ্তিকেই নির্ব্বাণ কহে। আর এই অবস্থাই জীবের মুক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় মন না থাকাতে তাহার স্মৃতিও থাকে না। সুতরাং সে অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিলেও সে অবস্থার কথা বলিবার অসামর্থ্য হেতুই তাহা অবর্ণনীয়। মৃত্যুর পরের অবস্থার কথা, মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া যে মৃত্যুতে স্থিতি হয়, সেই মৃত্যুই বলিতে পারে। যমই এই মৃত্যুর প্রতীক। তাই কঠোপনিষদে আছে যমের দ্বারস্থ হইয়াই নচিকেতা মৃত্যু বা যমকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মৃত্যুর পর জীবের কি অবস্থা হয়। মৃত্যুরূপী যম তাঁহাকে বলিলেন—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি।" নিজ নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন কোন দেহী শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শুক্রশোণিত সংযোগে উৎপন্ন হয়। অপর কোন কোন দেহী স্থানু অর্থাৎ বৃক্ষ পাষাণাদি দেহ লাভ করে। তারপরে বলিলেন অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপোর্বভুব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

এই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশপূর্ব্বক বিভিন্ন দাহ্যপদার্থ সংযোগে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন। এইরূপে বায়ুর সহিত উপমাদির পর বলিলেন—

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্নলিপ্যতে চ চাক্ষুষৈ বাহ্য দোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ॥"

অর্থাৎ যেমন একই সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুসম্বন্ধীয় বাহ্য পদার্থের দোষে লিপ্ত হন্ না, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোক দুঃখে লিপ্ত হন্ না, কারণ তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও বাহ্য অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গ। শেষে বলিলেন—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা য করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

বশী (সর্ব্বনিয়ন্তা) ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ যিনি এক হইয়াও স্বীয় একটী রূপকে দেব, তির্য্যক ও মনুষ্যাদি ভেদে বহু প্রকার করিয়া থাকেন। নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল বিবেকিগণ সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ লাভ হয়, অপরের হয় না।

আমরা বৃহজ্জাবাল্যোপনিষদে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাই। ভূষণ্ডঃ নামক কাক কালাগ্নিরুদ্রকে ভস্মস্নানবিধি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "অগ্নির্যথৈকো...এবং ভস্ম সর্ব্বরূপান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।" ইহা সেই কঠোপনিষদের শ্লোকটী সম্যক্ উদ্ধৃত, কেবল একস্তথা স্থানে ভস্ম বলা হইয়াছে। এই ভস্মের রূপই ইহাতে নানাপ্রকারে দেখান হইয়াছে। ইহার প্রথম ব্রাহ্মণে ঋগ্‌বেদের সেই প্রসিদ্ধ সূক্তের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে,

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়োম্নীষো ॥"

অর্থাৎ ইহার মনে যে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাই আরম্ভে কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিম্বা শক্তি) হইয়াছে। জ্ঞানীরা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ইহাই অসতের মধ্যে অর্থাৎ মূল পরব্রহ্মের মধ্যে সৎএর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতের প্রথম সম্বন্ধ। এখন যদি ইহা জাবালির বাক্যই হয়, তাহা হইলে প্রায় ৪০০ বৎসর পর কঠ ঋষিকর্ত্তৃক রচিত এই শ্লোক এস্থানে জাবালি বাক্যরূপে স্থান পাইল কিরূপে? কঠঋষি মহাভারতের কালে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা মহাভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জাবালিও যাহা বলিয়াছিলেন কঠও তাহাই বলিয়াছেন। উভয়েই আত্মজ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং উভয়ের বাক্য যে একরূপ হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? এরূপ অবস্থায় জাবালি কিরূপে নাস্তিক প্রতিপন্ন হইলেন? বিবেকচক্ষুতে দেখিলে জাবালির কথাগুলি আত্মজ্ঞানীরই উক্তি। সুতরাং রাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি পিতৃসত্যপালনে ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনই শ্রেষ্ঠ ইহাই

বলিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই বলেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোহহং"। তিনি আত্মজ্ঞ। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে নিজেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। যখন আত্মারূপী অহং বলিয়াছেন, তখনই আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই বাক্যবাদী আস্তিক নহেন কোন বিচারে? এই আত্মারূপী আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বলাতে ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রভেদ এই তিনি দ্বৈতবাদীর ন্যায় নিজকে দাস ভাবিয়া 'তিনিই ইহা করিতেছেন,' 'তাঁহারই ইচ্ছায় ইহা হইতেছে' বলিয়া দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই সমস্ত আত্মজ্ঞানী ঋষিদিগকে নাস্তিক বলিলে "অহং রুদ্রের্ভিবসুভিশ্চরাম্যহরুতবিশ্বদেবৈঃ ইত্যাদি" বাক্য বক্তা ঋগ্ বেদের ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উপনিষদকার ঋষিদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। তাহা হইলে বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ সমস্তকে মিথ্যা বলিয়া দেব দেবতা বিশ্বাসী ও তাহাদের পূজা উপাসনা প্রবর্ত্তক এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান প্রচারক পৌরাণিক ঋষিদের বাক্যই একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় উক্ত আত্মজ্ঞানী ঋষির বাক্য, বেদে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে বেদবাক্যও মিথ্যা হয়, সুতরাং বেদবাক্যানুসারী শ্রুতিগ্রন্থগুলিও অসার প্রতিপন্ন হয়। ইহার বিচার সুধী পাঠকদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা বিচারের উপরই নির্ভর করে। আবার জাবালিই বলিয়াছেন "আমি নাস্তিক ছিলাম, আবার সময় বিশেষে আস্তিকও হই"। অর্থাৎ জ্ঞানী সমাজে আমি আত্মবিশ্বাসী আস্তিকরূপে নাস্তিক, আর দশরথের ন্যায় যজ্ঞফল বিশ্বাসীর যজ্ঞে ব্রতী হইয়া আমি এখন তথাকথিত আস্তিকও হইয়াছি। কাজেই তৎপুত্র তোমার নিকটে আবার আমার আস্তিক্য স্বীকার করিতেছি। সেই আত্মজ্ঞানের সত্যযুগ এখন তিরোহিত হইয়া এখন যাগযজ্ঞাদির

প্রসার ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে (যাহার ধারাবাহিক বিবরণ মহাভারতে জনমেজয়ের যজ্ঞ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়) অর্থাৎ সেই আদিজ্ঞানী কপিল ঋষির ও বৈদিক ঋষিদের আত্মজ্ঞানসম্ভূত জ্ঞানরাশি তখন প্রজ্জ্বলিত থাকাতে তাহা মুনি সমাজের অনেকেরই আত্মজ্ঞান লাভের কারণ হইয়াছিল। এখন তাহা নির্ব্বাপিত প্রায় হওয়াতে, তাঁহাদেরই বংশধরেরা সেই পরমশ্রেয়সঃ জ্ঞান হারাইয়া রাজপ্রসাদলাভার্থ রাজাদের যজ্ঞে যজ্ঞানুষ্ঠানের ঋত্বিকরূপে পরাধীন হইয়া তাঁহাদেরই তুষ্টি সাধন করিতেছেন। কাজেই এখন যে কাল ক্রমে আসিতেছে তাহাতে আত্মজ্ঞানের নিদর্শনও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। তাই তিনি বলিলেন সে নাস্তিকতার কাল গিয়াছে, এখন আস্তিকতারই প্রাদুর্ভাব বেশি হইয়াছে। তিনি নাস্তিক হইলে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে আস্তিক ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিতেন না।

ব্রাহ্মণোত্তম আত্মজ্ঞানী জাবালির মুখে এই কথা বলাইবার বাল্মীকির একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রথমে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক দীক্ষিত রামকে মনসংযম শিক্ষা দেওয়াইয়া, তাঁহার দ্বারাই, সেই কপিলোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, রাজর্ষি জনকের নিকট উপদিষ্ট করাইলেন। আত্মজ্যোতিদর্শন একবার হইলেই আত্মজ্ঞান চিরকাল সমভাবে অটুট থাকেনা। একজন লোককে বহুবৎসর পূর্ব্বে দেখিলেই যে তাহার স্মৃতি মনে চিরন্তন জাগ্রত থাকে ইহা কোথায়ও দেখা যায়না। তাহাকে যদি মধ্যে মধ্যে দেখা যায় তাহা হইলে তাহার স্মৃতি জাগরুক থাকে এবং তাহার রূপের ক্রম পরিবর্ত্তনেও তাহার ব্যত্যয় হয়না। এইজন্য নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে অনেককে এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভাওয়ালের সন্ন্যাসী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সুতরাং এই বিদ্যুদাকারে দৃষ্ট আত্মজ্যোতি দর্শনেই যে

আত্মজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে লাভ হয় তাহা নহে। সমভাবে দীর্ঘকাল কঠোর অভ্যাস করিলেই তাহা স্থির সৌদামিনী হয়। তিব্বতী বাবা ইহাই বলিতেন, এবং আরও বলিতেন "ভারবাহী কুলির ন্যায় যত মোট বহন করিতে পারিবে ততবেশি উপার্জ্জনও সঞ্চয় হইবে"। আর এই সৌদামিনী স্থিরা হইলেই আত্মানুভূতিও স্থির হয়। দ্বাদশবর্ষ অযোধ্যা রাজপ্রাসাদে জানকী রামের সহচরী ছিলেন, কিন্তু আত্মজ্যোতিরূপা বৈদেহী সীতাও কি তাঁহার মানসনয়নে তদ্রূপ বিদ্যমানা ছিলেন? যদি প্রকৃত সেই বৈদেহী তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরুক থাকিত তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বনবাস যাত্রাকালে তিনিই অগ্রে তাঁহাকে বলিতেন "তুমিই আমার চিরসঙ্গিনী, রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিনা।" কিন্তু যখন রাম একাকী যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন সীতাই তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। আর যদি আত্মজ্ঞানলাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে তিনি বলিতেন তাঁহার এখন সাধনার প্রয়োজন। যতদিন পিতা তাঁহাকে নয়নান্তরাল করিতে পারেন নাই, ততদিন তাঁহার সেকার্য্য সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় নাই, এখন পিতার এই সত্য পালনরূপ বনবাসে, সে সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথের বাধা দূর হইল। জাবালির সেই সারগর্ভ উপদেশে যদি রাম উপরোক্তরূপ বলিয়া স্বেচ্ছায়ত্যক্ত রাজপদ গ্রহণে স্বীকৃত না হইতেন তাহা হইলে আত্মজ্ঞানী রামের পক্ষে শোভন হইত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি কুপিত হইয়া বলিলেন পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ কৈকেয়ীকে দত্ত তাঁহার (পিতার) প্রতিশ্রুতি পালনের সাহায্যের জন্য, ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন উদ্দেশ্যে তিনি বনে আগমন করিয়াছেন। তিনি ফলমূল পুষ্পদ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক

তাহাই ভোজন করিয়া পঞ্চইন্দ্রিয়েরও সন্তোষ বিধান করতঃ শ্রদ্ধাবান ও কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ হইয়া পিতার সত্যপালন পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞাদি দ্বারা যে দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় (ইহাতে যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন) তিনি তাহাই শ্রেয়স্কর মনে করেন। আত্মজ্ঞানী ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং স্বর্গাদি কাম্য ভোগ উপেক্ষা করিয়াই তবে আত্মজ্ঞানলাভে সিদ্ধ হন। তাই দেখা যাইতেছে রাম জাবালি কৃত উক্ত আত্মজ্ঞান সমন্বিত বাক্যশ্রবণে তাহার সার মর্ম্ম অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তাহার বাহিক ছদ্মবেশ রূপ আবরণটাই দেখিতে পাইলেন। রামের যে আত্মদর্শন ক্ষণস্থায়ী এবং দৃঢ় হয় নাই তাহাপরে বাল্মীকি দেখাইয়াছেন। আবার বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে ইক্ষ্বাকুকুলোচিত রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। এই সত্য পালনের মর্য্যাদাও তিনি সমভাবে তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহাও পরে দেখা যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিরাধ রাক্ষস বধ

বিফলমনোরথে ভরতের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের পর রাম কিছু কাল চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিলেন। একদিন সেই স্থানস্থ আশ্রম বাসী মুনিদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন "আমরা এই বনে বাস করিতেছি। এখন এখানে তোমার আসার পর হইতে অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব বাড়িয়াছে। খর ও দূষণ নামে রাবণ ভ্রাতা দুই রাক্ষস, তাহাদের অনুচরগণ সহ এই আশ্রমস্থ তাপসদিগকে বড়ই নিপীড়ন করিতেছে। এই বন মধ্যে যে কোন ধর্ম্মাচারী তপস্বী অশুচি অথবা অসাবধান থাকেন, তাহারা তাঁহাকে ভক্ষণ করে। সেই অসাধু নিশাচরগণ পুরোবর্ত্তী মৃদুস্বভাব মুনিগণকে পীড়ন করিবার জন্য সতত প্রস্তুত রহিয়াছে; আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাত-সারে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া প্রীতিপ্রকাশ করিতেছে। তাই আমরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি তুমি এই পথদ্বারাই দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে। পরে রাম তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দণ্ডকারণ্য নামে মহাবনে প্রবেশ করিলে, সেই বনস্থিত আশ্রমস্থ ঋষিরা তাঁহাকে বলিলেন "রঘুনন্দন! আপনি নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা, আমরা আপনার রাজ্যেই বাস

করিতেছি সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা সতত ইন্দ্রিয় সকল ও ক্রোধদমন করিয়া তপস্যাচরণে ব্যাপৃত থাকি। আমরা সেইজন্য সম্পূর্ণরূপে দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় আত্মরক্ষায় অপটু; এই কারণে আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" তৎপরদিন তাঁহারা ক্রমশঃ গভীর বনে প্রবেশ করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক ভীষণ দর্শন বিকটাকার মহাকায় রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই রাক্ষস মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া বলিল, "আমার নাম বিরাধ। আমি ঋষিদের মাংস ভক্ষণ করিয়া এই বনে অবাধে ভ্রমণ করিয়া থাকি। তুইজন তাপসের একটি রমণীর সহিত এরূপ বাস অসঙ্গত হওয়ায়, তোদের সংশ্রবে আসিয়া মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে। এই পরমাসুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে। তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে নিহত করিয়া তোদের রক্ত পান করিব।" তখন সে সীতাকে তাহার ক্রোড়ে স্থাপিত করিলে, সীতা ভয়ব্যাকুলিতা হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাম তদবস্থ সীতাকে দেখিয়া বলিলেন "লক্ষ্মণ! কৈকেয়ী দেবী ভরতের জন্য রাজ্য লাভ করিয়া তৃপ্ত না হইয়া, আমাকে বনে প্রেরণ করিয়া নিগৃহীত করিবার যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল। সীতার অঙ্গেও পরপুরুষের হস্ত স্পর্শ হইল, আর আমার নিগ্রহের কি বাকি রহিল?" তখন লক্ষ্মণ কহিলেন "আপনি কেন অধীর হইতেছেন; আমার ন্যায় ভৃত্য আপনার সতত সহায় থাকিতে আপনি অধীর হইতেছেন কেন? আমি এখনই এই রাক্ষসকে বধ করিতেছি"। তাঁহাদিগকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া সেই রাক্ষস কহিল, "আমি তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছি যে আমি অস্ত্রদ্বারা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য হইব, অতএব তোরা যুদ্ধের চেষ্টা না করিয়াই এই

প্রমদাকে ছাড়িয়া পলায়ন কর্।" রাম তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে জর্জ্জরিত করিলে, সে অবাধে তাহার গাত্রকম্পন করতঃ, সেই সমস্ত শর গাত্র হইতে নিক্ষেপ করিল এবং সীতাকে ভূমিতলে রাখিয়া, তাহাদের দুই ভ্রাতাকে ধৃত করিয়া স্কন্ধোপরি স্থাপন করতঃ, ভীষণ বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন "লক্ষ্মণ! এই রাক্ষস আমাদিগকে লইয়া এই পথ দিয়া গমন করুক। এই রাক্ষস আমাদিগকে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইখানেই লইয়া যাউক, কারণ যে পথ দিয়া এ যাইতেছে, তাহা আমাদিগেরও গন্তব্যপথ।" তখন তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সীতা, বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতঃ বলিলেন "রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি ঐ দুই ভ্রাতাকে ছাড়িয়া আমাকে হরণ কর।" তখন সীতার সেই বিলাপ শুনিয়া তাঁহারা সেই রাক্ষসকে বধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা দুইজনে সেই রাক্ষসের দুই বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং রাক্ষস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলে, তাহাকে মুষ্টি ও পদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাহার মৃত্যু না হওয়াতে, তাঁহারা গর্ত্ত করিয়া তাহাকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। তখন সেই রাক্ষস তাঁহাদিগকে বলিল "আমি তুম্বরু নামক গন্ধর্ব্ব, কুবেরের অনুচর ছিলাম। কোন সময়ে রম্ভার প্রতি আসক্তিবশতঃ, তাঁহার নিকট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, তিনি আমাকে শাপ দিয়া বলিলেন 'তুই রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি এবং যখন রাম তোকে বধ করিবে, তখন তুই পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবি।" আপনার কৃপায় আমি উদ্ধার পাইলাম। আপনি এই স্থান হইতে অর্দ্ধযোজন দূরে মহাতেজস্বী শরভঙ্গ নামক তপস্বীকে দেখিতে

পাইবেন। তিনি আপনার মঙ্গলবিধান করিবেন”। তখন তাঁহারা সেই বিশালকায় রাক্ষসকে উত্তোলন করিয়া সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন।

এই বিরাধ রাক্ষসের তাৎপর্য্য কি? বিরাধ যখন সীতাকে তাহার ক্রোড়স্থ করিল, তখন রাম হীনবীর্য্য কাপুরুষের ন্যায়ই, বিরাধের ভীষণদর্শন মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া, সীতার উদ্ধারের কোন প্রযত্ন বা চেষ্টা না করিয়া নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতেছিলেন, এবং কৈকেয়ীর অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতা সৌমিত্রি, সু-মিত্রের ন্যায়ই তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে এই বিশালকায় রাক্ষসকে তিনি স্বীয় বীর্য্যদ্বারাই বধ করিয়া সীতাকে মুক্ত করিবেন। এই প্রথম লক্ষ্মণের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া গেল। এই লক্ষ্মণই রামের পৌরুষস্বরূপ—তাহার মূর্ত্তপ্রতীক্, এবং তিনি যে তাহাই, তাহা পর পর ঘটনাবলীতে বাল্মীকি স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। তাই লক্ষ্মণ সুমিত্রানন্দন সৌমিত্র—সু বা পরম বন্ধুরই প্রতীক্। লোকের পৌরুষই তাহাদের সুমিত্র। যখন দুর্দ্দিন প্রাপ্ত হইলে আত্মীয় বন্ধু স্বজন সকলেই পরিত্যাগ করে, তখন লোকের এই সুমিত্র পৌরুষের সাহায্যেই পুনরভ্যুত্থান হয়। লক্ষ্মণ রামের বাহ্যপ্রাণ সদৃশ। বাহ্যপ্রাণ অর্থে-যে প্রাণের সাহায্যে বাহ্যিক দেহ তাহার কার্য্য করে অর্থাৎ দেহের শক্তি। আর অন্তঃপ্রাণ অর্থে সেই শক্তির আধার আত্মা—যাহা হইতে এই শক্তি নিঃসৃত ও প্রকাশিত হয়। যাহা প্রকাশিত হইলে লোকে প্রকৃত পুরুষের যোগ্য কর্ম্ম করে, তাহাই তাহার পৌরুষ। আত্মার শক্তি পৌরুষ রূপেই প্রকাশিত হয়। পুরুষ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই শক্তির নাম পৌরুষ। যতক্ষণ পুরুষ দেহে থাকে ততক্ষণ তাহার শক্তিরূপ পৌরুষও

বিদ্যমান থাকে। মনের অবস্থার সহিত এই পৌরুষের প্রকাশের সম্বন্ধ আছে। তাই দুর্ব্বল বা মলিন মন দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে কখন কখন এই পৌরুষ তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। জীবের আত্মরক্ষাই সতত মুখ্য লক্ষ্য। তাই লোকে নিজকেই, আসন্ন বিপদ বা মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করে। গৃহে অগ্নি সংযোগ হইলে, ভূমিকম্প হইলে, জলে ডুবিলে, জীব সর্ব্বাগ্রে নিজেকেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। নিজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে, যেন তাহার অজ্ঞাত-সারেই কাহারও কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াই, উপস্থিত হইলে, তখন তাহার মমত্বের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ "আমার পুত্র কলত্রের" কথা মনে হয়। এবং সে নিজেকে বাঁচাইয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করে। যাঁহার সাহায্যে বা যাহার প্রেরণায় সেই জীব নিজকে প্রথম বাঁচাইতে চেষ্টা করে—তাহা পুরুষেরই অর্থাৎ দেহস্থিত আত্মারই কার্য্য এবং প্রেরণা। সুতরাং এই পৌরুষ, সূর্য্যের ভাতির ন্যায় আত্মারই ভাতি। তাই বলা হয় "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"; "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" আবার বিশ্বামিত্র ঋষিও এই আত্মানং এর রক্ষার্থই ঘোর দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারক্লিষ্ট হইয়া, চণ্ডালের গৃহে কুক্কুরের মাংস অপহরণ করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই রামের দেহস্থ পুরুষই তাঁহার ভাতি বা পৌরুষ প্রকাশ করিয়া যেন লক্ষ্মণরূপেই রামকে সীতা বা তাঁহার জ্যোতিকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতে প্রেরণা দিলেন। অস্ত্র যুদ্ধে বিমুখ হইয়া বিরাধের করতলগত হইলে, আবার লক্ষ্মণ প্রদর্শিত পথেই তাহার বাহুদ্বয়ভঙ্গ করিয়া তাঁহারা মুক্ত হইলেন। এখানে বিরাধস্কন্ধে স্থাপিত ও বাহিত হইয়া রাম কি বলিয়াছিলেন তাহা দ্রষ্টব্য। তিনি বলিলেন :—

"বহত্বয়-মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ।
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ।
অয়মেব হি নঃ পন্থাঃ যেন যাতি নিশাচরঃ।"

আমরা যে পথে বনে প্রবেশ করিব, রাক্ষস সেই পথেই আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং যথা ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া যাউক। ইহাতে যেন তাঁহাদের সাহায্যই হইবে এইরূপ অভিপ্রায়। সীতা যে পরিত্যক্তা হইয়া অসহায়া বনমধ্যে পড়িয়া রহিল তাহা তাঁহার মনেই হইল না। এখানে তিনি সীতার (আত্মজ্যোতির) কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সত্য রক্ষার্থ বনগমনরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনার্থ ই যে তাঁহার শ্রেয় ও মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই প্রকাশ করিলেন। তখন পরিত্যক্তা সীতা, রাক্ষসকে, ভ্রাতৃদ্বয়কে মোচন করিয়া তাঁহাকেই লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। এই পরিত্যক্তা সীতার করুণ অনুনয় ও তাঁহার স্বেচ্ছায় আত্মদানের কথা শুনিয়াই যেন রামের হৃতজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন তাঁহার সীতার কথা মনে হইল। যেন রামের হৃদয়স্থ পুরুষই তাঁহার জ্যোতিরূপ সীতার মুখে বলাইলেন যে, যে সীতারূপ আত্মাপ্রকাশক জ্যোতির দ্বারা তাঁহাকে সে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যাহা তাহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় ছিল জানিয়াও এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যখন তাহার বনগমনরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনই তাহার শ্রেয়ঃ মনে করিল, তখন সীতার রাক্ষস কবলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দেহস্থ পুরুষ, দেহীকে সততই তাঁহার দেহস্থ বুদ্ধি দ্বারা তাহার শ্রেয়ঃ অশ্রেয়পথ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। বিবেকবিচারসম্পন্ন দেহী তাহার শ্রেয়ঃ পথই অনুসরণ করে। এখানেও রামের বিবেকবুদ্ধি পুনরুদ্দীপিত হওয়াতে পুরুষ পুনরায় তাঁহার পৌরুষ স্থাপিত করিলেন এবং সেই

উদ্দীপ্ত পৌরুষরূপ লক্ষ্মণই যেন রাক্ষসের হস্তভঙ্গ করিয়া তাঁহার সাধনার স্খলন হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

তাহা হইলে বিরাধ রাক্ষসের স্বরূপ কি? বিরাধ=বি+রাধ। রাধ ধাতু হইতে আরাধনা। বেদেও ইহার এইরূপ অর্থেই রাধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বি অর্থে শূন্য বা নাই অর্থাৎ কোন বিষয় হইতে চ্যুত হওয়া যেমন বিদেহ অর্থে দেহশূন্য, বিফল=ফলশূন্য ইত্যাদি। তেমনি আরাধনাশূন্য অবস্থা বিরাধ। যে বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে আরাধনা হইতে চ্যুতি হয়, তাহাই বিরাধ আর তাহারই মূর্ত্তপ্রতীক এই বিরাধ রাক্ষস। আরাধনার একটী লক্ষ্য থাকে—একটী আরাধ্য থাকে যাহার প্রাপ্তির জন্য আরাধনা করা হয়। এখানে রামের আরাধ্য তাঁহার আত্মা এবং তাহার জ্যোতিরূপ সীতার প্রকাশই সতত মনশ্চক্ষে রক্ষা করাই এই আরাধনার ধারা। আর এই আরাধনার ধারাই বৈষ্ণবদের রাধানামে—তাহার মূর্ত্তপ্রতীক। এই আরাধনার ধারাকে যে শক্তি হরণ করে—সেই বিরুদ্ধ শক্তিই তাহার শত্রু বিরাধ। তাই বিরাধ রাক্ষস সীতারূপ সেই রামের আরাধনার সাধন-সহায় জ্যোতিটীকে হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বৈষ্ণবের রাধা Positive phase আর বিরাধ তাহার Negative phase—অর্থাৎ একটী অগ্রসর হইবার সহায় আর একটী তাহার বাধা। বাল্মীকি দেখাইলেন যতদিন লক্ষ্মণরূপ পৌরুষ রামের অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকিবে ততদিন কোন বিরাধশক্তিই তাঁহাকে তাঁহার সাধনা হইতে চ্যুত করিতে পারিবে না। কখন কখন পদস্খলনের আশঙ্কা হইলেও বা তাহা আসন্ন হইলেও সাধক তাহা নিজ পৌরুষ সাহায্যে পুনস্থাপন করিতে পারে। নির্ব্বাপিত-প্রায়-পৌরুষ রাম অস্ত্রদ্বারা বিরাধকে বধ তো করিতেই পারেন নাই বরং তাহার কবলস্থ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন;

আবার উদ্দীপিতপৌরুষ রাম সেই বিরাধকে ভূপাতিত করিয়া তাহার দেহ উত্তোলন করতঃ তাহাকে গর্ত্তে প্রোথিত করিয়াছিলেন। বিরাধ রাক্ষস কেন? রাক্ষস সমস্ত জীবজন্তু গ্রাস করে। রক্ষ ধাতুর অর্থে রক্ষণ করা। কোন পদার্থ মুখে গ্রাস করিয়া তাহা রক্ষা করা হয় যেমন চোর মুখে গ্রাস করিয়া তাহার চুরির মাল রক্ষা করে। বানর পকেট হইতে টাকা পয়সা লইয়া মুখে গ্রাস করিয়া রক্ষা করে ইহা আমার প্রত্যক্ষ। তাই গ্রাস বা রক্ষণ একইবিধক্রিয়া। গ্রাস বা রক্ষণের মূর্ত্তপ্রতীক রাক্ষস। রামায়ণের রাক্ষসগণ সেইভাবেই বা sense-এই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই বিরাধরূপী বিরুদ্ধ শক্তি রামের সাধনার লক্ষ্য সীতাকে যেন গ্রাসই করিয়াছিল।

যখন রাম অত্রিঋষির আশ্রম হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন তখন মুনিরা বলিয়াছিলেন—

"রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপানি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ॥
উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ধর্ম্মচারিণম্।
অদন্ত্যস্মিন মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব॥"

রাঘব! এই বনপ্রদেশে রাক্ষসগণ অতিশয় উপদ্রব করে। নরমাংস-ভক্ষক নানারূপ রাক্ষসগণ এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। এই বন মধ্যে যে সকল ধর্ম্মাচারী তাপস অশুচি বা প্রমত্ত থাকেন, তাহারা তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। ইহাতে ইহাই বুঝায় যে, যে সকল শিক্ষা-নবিশ (novice) তাপস মনশুদ্ধি করিতে পারে না বা ভোগে প্রমত্ত থাকে তাহাদিগকেই এই সকল রাক্ষস ভক্ষণ করে। এখানেও দেখা যাইতেছে এই সকল মনের বলশূন্য তাপসদের সাধনাই, এই সকল বিরুদ্ধ শক্তিরূপ রাক্ষস যেন গ্রাস করিয়াই তাহাদিগকে সাধনমার্গ হইতে

স্খলিত করে। তাপসদিগের পক্ষে ইহা মৃত্যুরই তুল্য। এখানেও এই বিরাধশক্তি রাক্ষসাকারেই তাহার ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া রামের সাধনা গ্রাস করিতে বা তাঁহার পদস্খলন করাইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। বুদ্ধদেব ও সাধক ধ্রুবও এই ভীতি প্রদর্শন রূপ ব্যাঘাতকে জয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিরাধ উপাখ্যানের ইহাই তাৎপর্য্য।

দশম পরিচ্ছেদ

রামের রাক্ষস বধ প্রতিজ্ঞায় সীতার উক্তি

অতঃপর তাঁহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যাইলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া তাঁহার নিজতপস্যা প্রভাবে লব্ধ অক্ষয় সুখপ্রদ স্বর্গলোকও ব্রহ্মলোক গ্রহণ করিতে বলায়, রাম বলিলেন তিনি নিজ তপ প্রভাবে সেই সকল লোক উপার্জ্জন করিবেন। তারপর তাঁহারা শরভঙ্গ ঋষির নির্দ্দেশ মত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন সেখানে সমস্ত মুনিগণ উপস্থিত হইয়া রামকে কহিলেন "মুনিরা ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক রাজা তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। আপনি উপস্থিত থাকিতেও, রক্ষাকর্ত্তা থাকিতেও সেই মহান্ বাণপ্রস্থাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ অনাথের ন্যায় রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। রাম! আমরা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তখন রাম কহিলেন "আপনারা আমাকে অনুরোধ না করিয়া বরং আদেশ করুন। কেবল পিতার আদেশ পালনের জন্য আমাকে যখন বনে আসিতে হইয়াছে তখন আপনাদিগের প্রতি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়ন আমি অবশ্যই দমন করিব। আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্যই এইবনে প্রবেশ করিয়াছি; আমার এই বনপ্রবেশ আপনাদিগেরও স্বার্থ সাধক হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আমার বনবাস অতিশয় ফলজনক হইবে।

"তস্য মেঽয়ংবনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফল।
তপস্বিনাং রণে শত্রুন্ হন্তু মিচ্ছামি রাক্ষসান্।
পশ্যন্তু বীর্য্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ॥

আমি আপনাদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে নিধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আপনারা আমার এবং আমার ভ্রাতার বলবীর্য্য দেখুন।" রাম এইরূপে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া তাঁহাদিগের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যাইলেন। তৎপরদিন প্রাতে রাম সেই মুনিদের সহিত দণ্ডকারণ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন সীতাদেবী ভ্রাতৃদ্বয়কে দুইটী উত্তম তূণ, ধনু ও বিমল খড়্গ দিলে, তাঁহারা তাহা ধারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে যখন রাম সুতীক্ষ্ণ মুনির আজ্ঞানুসারে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাইতেছিলেন তখন সীতা তাঁহাকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন, স্বামিন্! অতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ; কিন্তু যদি কামজন্য ব্যসনে পরাঙ্মুখ হও, তবে আর তোমার কোন অধর্ম্ম হয় না। "নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং বাসনাং কামজাদিহ।" ইহলোকে কামজন্য তিন প্রকার ব্যসন হইয়া থাকে; প্রথম মিথ্যা কথা, দ্বিতীয় পরস্ত্রীগমন, তৃতীয় বিনা শত্রুতায় প্রাণীহিংসা। প্রথম ব্যসন উৎকট দোষাবহ সত্য কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও উৎকট। রঘুনন্দন! কোন কারণেই তুমি মিথ্যা কথা বল নাই, এবং ভবিষ্যতেও বলিবে না। অধর্ম্মজনক পরদারগমনও তোমার নাই; পূর্ব্বেও তাহা হয় নাই, এবং পরেও হইবেনা। তুমি নিয়তই নিজ পত্নীর প্রতি আসক্ত; তোমার মনেও পরকলত্র বিষয়ক অভিলাষ নাই। তুমি জিতেন্দ্রিয় এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু শত্রুতা ব্যতিরেকে মোহবশতঃ পর-প্রাণ হিংসারূপ অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন এক্ষণে তোমার উপস্থিত

হইয়াছে। বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যস্থিত ঋষিদিগের রক্ষার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বধ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই কারণেই ধনুর্ব্বাণ হস্তে তথায় যাইতেছ। সেইজন্য তোমার প্রতিজ্ঞা পালন রূপ ব্রত জানিয়া তোমার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চিন্তা করিয়া আমি চিন্তাকুল হইয়াছি। তোমার দণ্ডকারণ্যে যাওয়া আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। কারণ ভ্রাতার সহিত তথাতে যাইয়া যদি তুমি সমস্ত বনচরদিগকে দেখিয়া বাণ ক্ষয় কর, তাহা হইলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যেমন তৃণ কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু অগ্নির নিকটস্থ হইয়া তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করে, তেমনই ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষত্রিয়দিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। তাই পণ্ডিতেরা, শস্ত্র সংযোগ, অগ্নি সংযোগের ন্যায় বিকার হেতু বলিয়া থাকেন। আমি তোমাকে মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। তুমি কোন কারণে বিনা শত্রুতায় ধনু ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যস্থ রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না, কেননা কাহাকেও বিনা অপরাধে বধ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ক্ষাত্রধর্ম্ম পরায়ণ বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়গণের আর্ত্তদিগকে রক্ষার জন্যই ধনু ধারণ করিয়া বনে বিচরণ করা উচিত। কোথায় শস্ত্র আর কোথায় বন, কোথায় ক্ষাত্রধর্ম্ম আর কোথায় তপস্যা? অতএব আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় পরস্পরবিরোধী হইয়াছে। সুতরাং তপোবনানুষ্ঠানের ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। নিয়ত শস্ত্র ব্যবহার করিলে, সকলেরই নীচ ব্যক্তিদের বুদ্ধির ন্যায় ধর্ম্মবিরোধিনী বুদ্ধি জন্মে। অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষাত্রধর্ম্ম-প্রতিপালন করিও। তুমি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছ, এক্ষণে যদি মুনিদিগের পালনীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলে আমার শ্বশুরেরও শ্বশ্রূর অক্ষয় আনন্দ হয়। সুদক্ষ মানবেরা

অতিশয় যত্ন সহকারে নানারূপ নিয়ম দ্বারা শরীর কর্ষণ করিয়া ধর্ম্ম লাভ করেন, কারণ শারীরিক সুখদায়ক উপায় দ্বারা সুখহেতু ধর্ম্মলাভ করা যায় না। অতএব তুমি সর্ব্বদা পবিত্রচিত্তে তপোবনানুষ্ঠানের ধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোক সম্বন্ধে তাবৎ বিষয়ই জান। ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা উপযুক্ত হয় তুমি অবিলম্বে তাহাই কর।"

"অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে।
—ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্ম্মস্তু পূজ্যতাম্।
—পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্ম্মং চরিষ্যসি॥
—আত্মানং নিয়মৈ স্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈ ধর্ম্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্॥
নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্ম্মং তপোবনে।"

রাম সীতার সেই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এই দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ রাক্ষসদিগের কর্ত্তৃক নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়াছেন জন্যই, আর্ত্ত হইয়াই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহারা তপ প্রভাবে নিজেরাই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘকাল সঞ্চিত তপস্যার ক্ষয় করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই, কেননা একেতো তপস্যার অনুষ্ঠানই অতি কঠোর; তাহার উপর তাহাতে অনেকানেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্যই রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আসিলেও তাঁহারা তাহাদিগকে অভিশাপ দেন না। তাই আমাকে বলিয়াছেন 'তুমিই আমাদের রক্ষক; আমরা তোমারই শক্তি প্রভাবে অরণ্যে অবস্থান করিয়া থাকি। তুমি এ বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর'। তাঁহাদের ঐ কথা শুনিয়া আমি তাঁহাদিগকে সম্যকপ্রকারে রক্ষা করিব

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আর তুমি বলিয়াছ আর্ত্তদিগকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। প্রতিজ্ঞা পালনই আমার ধর্ম্ম। আমি তোমাকে, লক্ষ্ণকে, অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না।" রামের এই কথা শুনিয়া সীতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

ঠিক উপযুক্ত সময়ে সীতার এই উক্তি, যেন রামের প্রতি তাঁহার সতর্কীকরণ উদ্দেশ্যেই উক্ত হইয়াছিল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইব রাম সীতার এই উক্তির কিরূপ মর্য্যাদা রাখিয়াছিলেন। পরে যে ঘটনাবলী সঙ্ঘটিত হইবে তাহার বীজ যে এইখানেই রোপিত হইল তাহাই বাল্মীকি আভাসে এখানে বলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রামের অগস্ত্যাশ্রম দর্শন

অতঃপর তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে অনেক মুনি ঋষিদের আশ্রমে বাস করিয়া প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তথাতে কিছুকাল বাসের পর রাম মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য এই দণ্ডকারণ্যের কোন স্থানে বাস করেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তাঁহাকে দর্শন করেন। তখন সুতীক্ষ্ণ ঋষি অগস্ত্য ঋষির অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় সমস্ত রামকে বলিয়া তাঁহার আশ্রমের স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এই আশ্রম হইতে দক্ষিণাভিমুখে চারি যোজন পথ অতিবাহিত করিলে অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রম, এবং তাহারও এক যোজন দক্ষিণে অগস্ত্য ঋষির আশ্রম'। রাম তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে রাম লক্ষণকে বলিলেন তিনি সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকট শুনিয়াছেন যে অগস্ত্য ঋষি মানবগণের হিত কামনায় যমতুল্য অসুরকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া, এই দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন। "একদা এই প্রদেশে 'বাতাপি' 'ইল্বল' নামে ব্রাহ্মণঘাতী অতিক্রুর মহাসুর দুই ভ্রাতা ছিল। সেই নির্দ্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করতঃ শ্রাদ্ধের ছলে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত, পরে সে মেষরূপধারী ভ্রাতাকে যথাবিহিত সংস্কৃত করিয়া শ্রাদ্ধবিহিত বিধান

ক্রমে, ব্রাহ্মণদিগকে তাহার মাংস আহার করাইত। পরে সেই সকল ব্রাহ্মণগণ আহার করিয়া উঠিলে সেই ইল্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে 'বাতাপে! তুমি বাহির হও' ইহা বলিত। তাহার আহ্বান শুনিয়া মেঘের ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিয়া বাতাপি, ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বাহির হইত। সেই কামরূপী মাংসভোজী অসুরেরা এইরূপে নিয়তই বহু ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট করিত। তৎপরে দেবতাগণ মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধ ব্যাপার মনে করিয়া সেই মহাদৈত্যকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে ইল্বল তাঁহার হাতে জল দিয়া ভ্রাতাকে 'নির্গত হও' বলিয়াছিল। ইল্বল ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'আমি মেষরূপধারী তোর ভ্রাতাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গিয়াছে, তাহার আর বাহির হইবার শক্তি কোথায়?' তখন ইল্বল তাঁহাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, জ্বলন্ততেজা মুনি অগ্নিতুল্য নেত্রে দৃষ্টি করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তিনি এই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই দক্ষিণ দিক সেই ভগবান অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে ক্রূরমতি রাক্ষসদিগের অধর্ষণীয় ও বাসযোগ্য হইয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সূর্য্যের পথ অবরোধ করিতে আর বর্দ্ধিত হইতেছে না। আমরা এই অগস্ত্য ঋষির আশ্রমেই বনবাসের শেষ পর্য্যন্ত বাস করিব।"

তাঁহারা ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলে, তাঁহার আদেশে তৎ সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি দিয়া উপবেশন করিতে বলিয়া তাঁহাদের কুশলাদি প্রশ্নের পর বলিলেন "পুরুষসিংহ রাম! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা ভূষিত দিব্য মহৎ

এই বৈষ্ণব ধনু, সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী অমোঘ ব্রহ্মদত্ত নামক উৎকৃষ্ট স্বর্ণ নির্ম্মিত হেমবিভূষিত শর এবং অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী তীক্ষ্ণবাণ-সমূহ পরিপূর্ণ অক্ষয় সায়ক তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু কার্ম্মুক দ্বারা যুদ্ধে, শ্রেষ্ঠ অসুরদিগকে বধ করিয়া দীপ্তিমতী লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন। তুমিও জয়ের নিমিত্ত এই অস্ত্রগুলি গ্রহণ কর।"

"ইদং দিব্যং মহাচাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
অমোঘং সূর্য্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্ত শরোত্তমঃ।
দত্তো মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ॥
সম্পূর্ণৌ নিশ্চিতৈর্বাণৈ র্জলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোশোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ॥"

মহাতেজস্বী অগস্ত্য সেই সকল অস্ত্র রামকে প্রদান করিয়া কহিলেন "রাম! তোমার এই সীতা বনেও তোমার সঙ্গিনী হইয়া অতিশয় দুঃসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে ইহার চিত্ত প্রসন্ন থাকে তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। নারীগণ বিদ্যুতের চপলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং বায়ুর দ্রুতগামীতার অনুকরণ করে, কিন্তু তোমার এই পত্নীতে সে সকল দোষ নাই। ইনি দেবতাগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা ও প্রশংসনীয়া। এই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইল, কেননা তুমি বিদেহনন্দিনী ও সুমিত্রানন্দনসহ এখানে বসতি করিবে।"

অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম॥"

রাম কহিলেন "আপনি আমাদিগের গুরু। আপনি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, আমরা তথাতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিব।"

অগস্ত্য বলিলেন, "এই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত প্রদেশ আছে, তথাতে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর। কিন্তু তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে জন্য স্থানান্তরে বাস করিতে চাহিতেছ, আমি ধ্যানে তোমার সেই মনোগতভাবও জানিতে পারিয়াছি। তজ্জন্যই বলিতেছি যে তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। গোদাবরীর নিকটস্থ সেই প্রদেশ এখান হইতে অধিকদূর নহে।" পরে রাম সেই মুনির অনুমতি পাইয়া পঞ্চবটী নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

অগস্ত্যঋষির কতকগুলি অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্যের বিষয় সুতীক্ষ্ণ ঋষি রামকে বলিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় এই দেশীয় হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছেন। অন্ততঃ অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বত যখন ক্রমে মস্তক উন্নত করিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে প্রণত অবস্থায় 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাহার উত্থান বন্ধ করতঃ সূর্য্যের চলাচলের পথ বাধাশূন্য করিয়া দিয়াছিলেন ইহা প্রায় সকল হিন্দুই জানেন, এবং তাহাদের কতকাংশ ইহা যে বিশ্বাস না করেন তাহাও বলা যায় না। কিন্তু এই রূপকে-বর্ণিত বিবরণের অন্তরালে কি প্রচ্ছন্ন রহস্য নিহিত আছে তাহা হয়তো অনেকেরই অবগতি নাই। প্রথমে বাতাপি ও ইল্বল শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থে কি বুঝায়? বাত+অপি —বাত অর্থে বায়ু, বাতাস এবং অপি অর্থে সমুচ্চয়। বাতাপি= বায়ু সমুচ্চয়। ইল+বলচ্=ইল্বল। ইল ধাতু গত্যর্থে—ইল—গমনে। ইল্বল=যাহা বলের সহিত গমন করে। এই বাতাপি মেষরূপ ধারণ করিলে শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন, আবার তাহাই ইল্বলের আহ্বানে তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইত। যদি

তাহা প্রকৃতিজ প্রাণী মেষ হইত, তাহা হইলে খণ্ডিত ও অগ্নিসংযোগে পক্ক হইয়া পুনরায় জঠরানলেও রূপান্তরিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ শরীর গ্রহণকরতঃ নির্গত হইতে পারিত না এবং ইল্বলের আহ্বানও শুনিতে পাইত না। তাহা হইলে ইহা অন্য কিছু। আবার মেষ শব্দ মিষ ধাতু হইতে সাধিত। মিষ = স্পর্দ্ধা। সুতরাং ইহার অর্থ এইরূপ :— সমস্ত বাহিরের বায়ু স্পর্দ্ধা সহকারে সজোরে সংগ্রহ করিয়া নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরে টানিয়া লইলে তাহাই আবার বলের সহিত বাহিরে আসে। এই বায়ু অভ্যন্তরে কিছুকাল রাখিলে দেহের কম্পন করিয়া ইহা বাহির হয়। এইরূপে বায়ু অভ্যন্তরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সময়ে সময়ে চেতনা লোপও হইতে পারে। তাহাই মৃত্যু সদৃশ। অন্য ব্রাহ্মণদের এইরূপ দশা হইলেও অগস্ত্য ঋষি তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং অগস্ত্য ঋষির ও সেই সকল বিনাশপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের শক্তির পার্থক্য ছিল। তাহা কিরূপ ?

অগস্ত্য ঋষি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন এবং তাৎকালিক সমস্ত ঋষিদের শীর্ষোপরি ছিলেন, তাহা বাল্মীকিই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অগস্ত্যঋষি তাহা হইলে যোগসিদ্ধ ছিলেন। যোগসিদ্ধ না হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয় না। এই যোগের প্রণালী কিরূপ ? প্রথমে প্রাণায়ামে বাহির হইতে সমস্ত বায়ু (বাতাপি) নিশ্বাসের দ্বারা অভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া তাহাকেই রুদ্ধ করিয়া স্থির করিতে হয়। তখন কুম্ভক হয়, যেন বাতাপিকে জীর্ণ করাই হইল। কুম্ভকে স্থিতির সময় অজ্ঞাতসারে মৃদু মৃদু শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়া দেহের কার্য্য চলে। কিন্তু এই কুম্ভক সাধন করিতে হইলে মনকে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে হয়। নতুবা মন যদি কেবল বায়ুর চলাচলই লক্ষ্য রাখিয়া তাহাই রোধ করিবার চেষ্টা করে,

তাহা হইলে প্রকৃতির বিরুদ্ধ কার্য্য জন্য তাহা সাধন করিতে পারে না, বরং তাহার ফলে একটা শ্বাসরোধ জন্য অস্বস্তি ও কষ্ট উপস্থিত হয়, আর তখনই সেই রুদ্ধ বায়ু সজোরে বাহির হয়। ইহাই ইল্বল। যেমন মনুষ্য যখন দৌড়াইতে থাকে ততক্ষণ অনেকটা বায়ু রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তারপর থামিয়াই জোরে শ্বাস ত্যাগ করে বা হাঁপায়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় বা শুনিতে পাওয়া যায় যাহারা গুরু উপদেশ বা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসরণ না করিয়া যোগসাধনার্থ প্রাণায়াম করে, তাহারা অনেকসময় কঠিন পীড়াক্রান্ত হয়, এবং পরিণামে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। ধ্যেয় বিষয়ে মনের একাগ্রতা সাধন করিতে পারিলে, মন যখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে লিপ্ত হইতে পারে না তখনই এই বাতাপিরূপ নিশ্বসিত বায়ু ইল্বল হইয়া বেগে বাহির হইতে পারে না। তারপর পরিমিত বা অল্পাহারও যোগের একটী অঙ্গ। উদরপূর্ত্তি করিয়া শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যে সকল ব্রাহ্মণ মেষের মাংস 'আকণ্ঠ ভোজন' করতঃ যোগ সাধনের জন্য প্রাণায়াম করিতে চেষ্টা করিত, তাহাদেরই বাহির হইতে সংগৃহীত সমুচ্চয় বায়ুরূপ বাতাপি অভ্যন্তরে যাইয়া তাহাদের 'হাসফাস'রূপ একটা শ্বাসরোধ জন্য অস্বস্তি ও কষ্ট উৎপন্ন করিত। তখন প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে সবেগে সশব্দে ইল্বলরূপে বাহির করিয়া তাহারা স্বস্তিবোধ করিত। তাহাদের প্রাণায়াম দ্বারা যোগসিদ্ধ হইত না এবং তাহাদের সংকল্পও নাশ হইত। অভ্যস্ত যোগসিদ্ধ উপযুক্ত গুরুর উপদেশ না পাইয়া যাহারা স্বাধীনভাবে ঐরূপ আচরণ করিত, তাহারাই ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হইত। যাঁহারা যোগ অভ্যাস জন্য প্রাণায়ামে শ্বাসরোধের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। কিছুক্ষণ একটী ধ্যেয় বিষয়ে তন্ময় হইয়া থাকা সময়ে যেন আর শ্বাস চলাচল হয় না বোধহয়,

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মন তার ধ্যেয় বিষয় হইতে অন্যত্র ধাবিত হয়, তখনই একটী প্রশ্বাস নাসিকার উচ্চশব্দ দ্বারা বহির্গত হয়—যেমন নাকের ক্লেদ বাহির করিবার সময় শব্দ হয়। ইহাই ইল্বল। তাই মহাযোগী অগস্ত্য ঋষি, নবীন ব্রাহ্মণ তাপস যাহারা ঐরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া হতমনোরথে তপস্যা পরিত্যাগ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ঐরূপ বাতাপি ভক্ষণে তাহা জীর্ণ করিয়া ইল্বলরূপে তাহার বহির্গমন বন্ধ করিবার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দান করিয়া দেখাইয়াছিলেন—কিরূপে এবং কি উপায়ে মনঃসংযম করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা যোগমার্গের সোপান আরোহণ করা যায়। ইহাই বাতাপি ইল্বল বধের তাৎপর্য্য। শরভঙ্গ মুনি রামকে বলিয়াছিলেন সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যাইলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। এই সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটই রাম অগস্ত্য ঋষির অদ্ভুত কর্ম্মের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। অগস্ত্যদর্শনে যে রামের মঙ্গল হইয়াছিল তাহা রামের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল—যখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাদের গুরু"। সেই মঙ্গলটী রামের কিরূপে সাধন হইল ?

ইতিপূর্ব্বে রাম বিশ্বামিত্রের নিকট আধ্যাত্মিক ও শস্ত্র বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকেও গুরুসম্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি শরভঙ্গ ঋষিকে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "আমি নিজেই তপস্যা ও সাধনাদ্বারা আমার প্রাপ্যলোক অর্জ্জন করিব।" এখন সেই প্রাপ্য ব্রহ্মলোকের জন্য কিরূপ সাধনা করিতে হইবে তাহাই অগস্ত্য ঋষি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ঋষি তাঁহাকে হেমবজ্র বিভূষিত বৈষ্ণবধনু দিলেন। এই বৈষ্ণবধনু সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। এই বৈষ্ণবধনু অর্থে পরমাত্মাকে বিশ্বরূপে প্রণিধান। তিনি প্রকাশিত অবস্থায় যেন এই অখণ্ড অসীম

বিশ্বপ্রতীকে বিদ্যমান। তাই বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন—(ঋগ ১০।৯০ সূক্ত)—

"সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণী সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ বিরাডাখ্যঃ যঃ পুরুষঃ। তাঁহার সহস্র অর্থে অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত পদ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডগোলকরূপ বিশ্ব পরিবেষ্টন করিয়া থাকিয়াও দশঅঙ্গুলি (উপমা জন্য) বাহিরে আছেন। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ডময় হইয়াও তাহা হইতে অতিরিক্ত।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্। •
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥"

যাহা এই বর্ত্তমান জগৎ তাহা সবই পুরুষ, যাহা ছিল, যাহা হইবে তাহাও এই পুরুষই। অমৃতত্বের প্রভুও তিনি। অমৃতলাভের অধিকারী। সুতরাং যিনি সেই ব্রহ্মভূত হইতে পারেন তিনিই অমৃতত্ব পাইতে পারেন। এই বেদের পুরুষই পুরাণের ও রামায়ণের বিষ্ণু। আর বৈদিক ঋষিরা এইরূপেই প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে পরমাত্মার সগুণরূপে—তাঁহার একটা বিরাট আকারের রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহারা সাধনমার্গের আরও উচ্চ বা শেষ সোপানে আরোহণ করিয়া তখন পরমাত্মভূত হইয়া বলিলেন—

"অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥
···অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমানাভুবনানি ঘিশ্বা।" ইত্যাদি
(দেবীসূক্ত)

অর্থাৎ এই রুদ্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতাসহ সমস্ত

বিশ্বদেবতাকে আমিই ধারণ করিয়া আছি। আমি তাবৎ বিশ্বভুবনে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। যে পুরুষকে ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এখন তাহাকেই বলিলেন সে আমি অহং। সমস্ত দেহে অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত পদার্থরূপ পুরে শায়িত যে আমি বা অহংরূপ পুরুষ আছি, সেই আমারই প্রতীক এই বিশ্বভুবন। এই বিশ্বভুবনরূপ দেহ লইয়া যে অহং বা আমি বা পরমাত্মা বিরাট অবস্থায় বিদ্যমান বৈদিক পুরুষ সহস্রাক্ষ ইত্যাদি, তাঁহারই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিরূপে এই দেহ ও আত্মাসমন্বিত আমিও একটী পুরুষ। বিরাট বিশ্বরূপ দর্পণে তাঁহার যে প্রতিকৃতি প্রকাশিত ঠিক তাহারই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এই ক্ষুদ্র দেহরূপ দর্পণে প্রকাশিত। সেই বিরাট বিশ্বরূপ দর্পণ অদৃশ্য হইলেও এবং ক্ষুদ্র দেহরূপ দর্পণ অদৃশ্য হইলেও সেই একই বিরাট অহং পুরুষ বিদ্যমান থাকেন, কেননা অমৃতত্বের ঈশান বা প্রভু তিনি। এই ক্ষুদ্র দেহপুরে শয়ন করিয়া যে পুরুষ ক্ষণতরে নিজকে ক্ষুদ্র মনে করেন তিনিও একজন ক্ষুদ্র বিষ্ণু। আর এই ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া যিনি সেই বৃহৎ পুরে ওতপ্রোতভাবে শয়ন করিয়া আছেন সেই পুরুষই বিরাট বিষ্ণু। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রাণীর দেহরূপ পুরে, সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গমরূপ সর্ব্বপুরে তিনি একইভাবে ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান অহং রূপে আছেন। অহং বা আমিও যখন সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত তখন আমাতেও তিনি সেই অহংরূপেই আছেন ইহাই স্বতঃসিদ্ধ হয়। অনন্তরূপে অনন্ত আকারে এই বিশ্ব প্রকাশিত, সুতরাং অনন্ত রূপ ও অনন্ত আকারের প্রত্যেকটীতেই সেই আত্মা বা পুরুষ বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত তাই সর্ব্বজ্ঞ। এই প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে

অবকাশ বা ফাঁক আছে তাহাতেও তিনি ব্যাপ্ত, কেননা সেই পুরুষই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে ব্যক্ত। তাহা হইলে এই প্রত্যেক পদার্থের রূপ বা আকারটি নষ্ট বা অদৃশ্য হইলেও তাহার অধিকৃত স্থানটীও ফাঁকা হইল। এরূপ অবস্থায় পরস্পর পৃথক রাখিবার যে ফাঁকা স্থান, তাহার সহিত এই নূতনরূপে পরিণত ফাঁকা স্থানও এক হইয়াই অভেদ হইল। তখন সেই অদৃশ্য পদার্থের স্থিতির ফাঁকা স্থানটী কি আর নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে কোন স্থানটী তাহার অধিকৃত ছিল? কিম্বা তাহার সীমানির্দ্দেশ করিতে পারে কি? সে তখন নিজকে অসীম অবস্থাতেই দেখে। চৌবাচ্চার জলে ঘটিবাটীপূর্ণ জল, সেই ঘটিবাটী ভগ্ন হইলে বলিতে পারে কি আমি ঘটির জল, আমি বাটীর জল? শূন্য অভ্যন্তর কলসি বা ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার অভ্যন্তরে যে সীমাবদ্ধ আকাশ বা অবকাশ ছিল তাহাকে কেহ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারে কি এইটী কলসি এইটী ঘটির আকাশ বা শূন্যস্থান? আর কলসি ও ঘটের আকাশও তখন অনন্ত আকাশে মিলিয়াই যেন বলে আমি তো অনন্ত অসীম। তেমনি এই অসংখ্য দেহস্থ পুরুষ বা আত্মার যখন তাহাদের দেহরূপ কলস ও ঘটরূপ পুর, ভগ্ন হয় বা বিনাশ হয় তখন সেই ফাঁকা অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই বা শূন্যাকার হইলেই, শূন্যরূপী পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া, তাহার নিজত্ব ভুলিয়া, ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া, একটী বিরাটাকার উপলব্ধি হয়। অবশ্য আত্মার সেই শূন্যত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া চাই; তাহার মন যে ছাপ বা দাগরূপ সংস্কার বহন করে তাহারও নাশ হইয়া শুদ্ধ নির্ম্মল হওয়া চাই, তাহার বুদ্ধি, অহঙ্কারের লোপ হওয়া চাই, শুধু দেহ হইতে মুক্ত হইলেই যথেষ্ট নয়। এই সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষই তখন শূন্য হইয়া, মুক্ত হইয়া এক বিরাট শূন্যাকারে পরিণত হয়। এই শূন্যাকারে

যে সত্বা বা অস্তিত্ববিশিষ্ট সৎ অবস্থা তাহাই বেদান্তের ব্রহ্ম, তাহাই বৈদিক ঋষির পরমাত্মা।

এতক্ষণে সম্ভবতঃ আমরা বিষ্ণু ও ব্রহ্মের যে কতটুকু পারমার্থিক ভেদ তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে সমর্থ হইলাম। অগস্ত্য ঋষির এই বৈষ্ণবধনুই সেই বিরাট পুরুষের অনুভূতি প্রাপ্তির জ্ঞান। তিনি রামকে এই বিষ্ণুরূপ সগুণ ব্রহ্মের উপদেশ দিয়া তারপর তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশই ব্রহ্মদত্ত-শর যাহা ব্রহ্মের নিকট হইতেই আসিয়াছে। এই ব্রহ্ম হইতে নিক্ষিপ্ত শরই ব্রহ্মের, পুরুষ বা আত্মারূপে এক্ একটী পৃথকভাবে স্থিতি। এই ব্রহ্মদত্ত শর ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে আবার তাহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ব্রহ্মদত্ত শর যেন ব্রহ্মেরই বা পরমাত্মারই নিজ দেহ হইতে নিক্ষিপ্ত বা দত্ত একটী একটী আত্মা বা পুরুষ—পরমাত্মারই অংশ। এই বৈষ্ণব ধনুতে যোজন করিয়া লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া, সন্ধান করিয়া সেই শর পুনরায় নিক্ষেপ করিতে পারিলে, ব্রহ্মের শর ব্রহ্মের নিকটেই যায়। অর্থাৎ সেই শররূপব্রহ্মের অংশ নিজদেহস্থ পুরুষকে প্রথমে চিনিয়া বা উপলব্ধি করিয়া যখন তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভূত করা যায়, তখন সেই আত্মারূপ পুরুষেরই ব্রহ্মাকার বা পরমাত্মারূপে উপলব্ধি হয়—যেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অংশ তাহার সহিত মিশিয়াই যায়। প্রথমে ব্রহ্মকে তাহার সগুণ বিষ্ণুরূপ বা বিষ্ণুরূপে সাধনা বলে উপলব্ধি করিতে হয়, অর্থাৎ আমিই যেন এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। তারপর সেই শরের ন্যায়ই, সেই লক্ষ্যস্থান ব্রহ্মে যাইতে হয়। তখন বিশ্বও অদৃশ্য আর আমিও সেই নির্গুণ ব্রহ্ম সত্বাতেই যেন সেই শররূপেই উপনীত হইয়াছি। শর যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই গেল, আর অহংরূপ আমিও যেখান

হইতে আসিয়াছিলাম সেইখানেই আমার শাশ্বত স্থানে স্থিতি প্রাপ্ত হইলাম। এই ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্‌গুরুও, শিষ্যকে প্রদর্শন করাইতে পারেন না। শিষ্য নিজ সাধনাতেই, স্বানুভূতিতেই এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তাই অগস্ত্য ঋষি ধনু দিয়া তাহা দ্বারা শর নিক্ষেপের ভার রামের উপরেই ন্যস্ত করিলেন। 'ক্ষমতা হয় শর সন্ধানে লক্ষ্যভেদ কর।' বিষ্ণুর একটী আবাসস্থান নির্ণয়, পুরাণ কর্ত্তারা বৈকুণ্ঠে স্থির করিয়াছেন। যিনি কোন আবাসে বাস করেন তিনি সেই আবাসেরই পরিমিত অথবা তদপেক্ষা ছোট কাজেই সীমাবদ্ধ। ব্রহ্মের কোন আবাস সম্বন্ধে বেদ বা শ্রুতিতে উল্লিখিত হয় নাই। কেননা তাঁহার আবাসও তিনিই—যেহেতু তিনি অসীম ও সর্ব্বগত। অগস্ত্য ঋষি আত্মারূপে দেহপুরে স্থিত অহং উপলব্ধি করিয়া, যখন সেই অহংকেই সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেস্থিতরূপে উপলব্ধি করিলেন তখনই তিনি নিজে ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন **সোঽহং**। এই সর্ব্বভূতে যে অহংরূপী আত্মা 'স' রূপে আছেন সেই 'স' আর অহংরূপী আমিও একই। বাল্মীকি ঋষিও এইরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি অগস্ত্য ঋষির উপলব্ধি যেন নিজেরই উপলব্ধির প্রতিরূপ ভাবেই রূপকে, বর্ণন করিয়াছেন। আর বর্ত্তমান কালে যেন সেই অগস্ত্য বাল্মীকি রূপেই মহাযোগী ঋষি তিব্বতী বাবা তাহা উপলব্ধি করিয়া, গুরুগম্ভীর স্বরে ভারতকে শুনাইলেন সোঽহম্।

ইতিপূর্ব্বে রাজর্ষি জনক উপদেশে রাম দেহরূপ পুরেস্থিত পুরুষরূপ ক্ষুদ্র বিষ্ণুর উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন—সেই দেহরূপ ধনুতে টঙ্কার দিয়া সীতারূপ আত্মজ্যোতি দর্শন দ্বারা। এখন অগস্ত্যঋষি তাঁহাকে সেই ক্ষুদ্র বিষ্ণুর উপলব্ধি হইতে বিরাট বিষ্ণুরূপ বিরাট পুরুষের উপলব্ধি লাভের উপদেশ দিয়া ও পন্থা দেখাইয়া বলিলেন "এই সীতা বিদ্যুতের

ন্যায় চপলা অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় নহে।" অর্থাৎ ইনি চপলা বিদ্যুতের ন্যায় প্রথমে প্রতিভাত হইলেও সাধনা ও অভ্যাস বলে এই সীতারূপ জ্যোতি স্থিরা সৌদামিনীরূপে পরিণতা হইতে পারেন, "অতএব তুমি ইঁহাতে রত হইয়া সতত ইঁহার প্রীতি সম্পাদন করিবে। অর্থাৎ সততঃ এই আত্মহৃদি জ্যোতিরূপ সীতাকে তোমার মানস নয়নে রাখিলে ইনি যেন স্থিরাই হইবেন, তখন ইনিই তোমাকে পথ প্রদর্শন করাইয়া সেই জ্যোতি প্রকাশক পুরুষের স্থানে লইয়া যাইবেন। এক কথায় তুমি এই জ্যোতিকে স্থির করিতে পারিলে, তাহারই অনুসরণে পুরুষের উপলব্ধি করিতে পারিবে।" তাই বলিলেন :—

"অলঙ্কৃতোহয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম॥"

এখানে অগস্ত্যঋষি সীতাকে বৈদেহী বলিয়াছেন এবং লক্ষ্মণকে সুমিত্ররূপ তাঁহার পৌরুষ রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরও রাম যখন বলিলেন দণ্ডকারণ্যে আমাদের বাসের জন্য একটী ভাল স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিন, আমি সেখানে পর্ণকুটির রচনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিব," তখন ঋষি বলিলেন "তুমিই না বলিলে অবশিষ্ট সময় তুমি আমার আশ্রমে কাটাইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন আবার অন্যত্র যাইতে চাহিতেছ, ইহাতে তোমার অন্য অভিপ্রায় আছে তাহা আমি ধ্যান যোগে বুঝিতে পারিতেছি।"

"দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ॥
তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্॥
বিদিতো হ্যেষ বৃত্তান্তো মম সর্ব্বস্তবানঘ।

তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্দশরথস্যচ ॥
হৃদয়স্থঞ্চ তে ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া।
ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে ॥”

আমি ধ্যানে তোমার পিতৃসত্য পালনার্থ বনে আগমন ইত্যাদি তোমার ও দশরথের বৃত্তান্ত অবগত আছি, তোমার হৃদয়ের ছন্দও আমি জানিতে পারিয়াছি অতএব তুমি এখান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে বন আছে সেখানে যাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃসত্য পালন কর এবং মৃগমাংস আহারাদি করিয়া তৃপ্তি লাভ কর। আরও তোমার মনে যে কি আছে তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ রাম যে রাক্ষস বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিবেন তাঁহার সে মনের অভিপ্রায়ও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই যেখানে প্রচুর বধ্যমৃগ ও রাক্ষস আছে দণ্ডকারণ্যের সেই প্রদেশের, তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন রামের বনে আগমন কেবল পিতৃসত্য পালনার্থ। তাঁহার সাধনা দ্বারা আত্মোন্নতি লাভের জন্য তিনি সেখানে আসিলে তিনি তাঁহার (অগস্ত্যের) আশ্রমেই থাকিয়া তাহা সাধন করিতেন। ইহাতে রামের সাধনায় শিথিলতা পক্ষান্তরে তাঁহার ক্ষাত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন রূপ রাক্ষসবধের আকাঙ্ক্ষাই যে বলবতী হইয়াছে তাহাই বাল্মীকি দেখাইলেন। সীতার ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হওয়ার এই প্রথম সোপান।

আমরা অগস্ত্য ঋষির ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়া তাঁহার স্থান যে কত উচ্চে বাল্মীকি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা দেখাইলাম। এখন তাঁহার পর্য্যবেক্ষণশীলতা ও ভূয়োদৃষ্টির সম্বন্ধে দেখাইব। রামায়ণে ইহার সামান্য উল্লেখ আছে, যথা :—

"মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।
সন্দেশং পালয়ং স্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্দ্ধতে॥"

বিন্ধ্যাচল ক্রমে উর্দ্ধমুখে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের ভ্রমণপথ রোধ করিতেছিল। অগস্ত্য ঋষিকে দেখিয়া বিন্ধ্য মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলে তিনি আদেশ করিলেন "আমি যাবৎ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করি তাবৎ তুমি এই প্রণত অবস্থায় থাকিবে।" অগস্ত্যও দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই আর বিন্ধ্যাচলও তদবধি মস্তক উন্নত করে নাই। এইরূপ পুরাণে কথিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখিতে পাই রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে অগস্ত্য ঋষি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। হয়তো তিনি বিন্ধ্যকে এড়াইয়া অন্য পথে অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য আমরা পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদে একটী নিখিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মিলন হয়। তাহাতে তাহার সভাপতি মিঃ ওয়েষ্ট যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ।

The Presidential address (speech) of Mr. W. D. West of the Geological Survey of India discussing the origin of Earthquake in India :—"The Origin of Earthquake—The Occurrence of Earthquake in India, was a legacy of the great Earth movements that had convulsed the northern flanks of India during Tertiary and Quaternary times, when a belt of mountain including the Alps, the Himalayas was thrown up on the site of what had been previously an extensive sea. It is significant that earthquakes are mainly confined to areas of

recent or present day mountain formation, and there is no doubt that they originate when the rocks of the crust fracture as they are compressed to form the mountains. In Peninsular India mountain formation has long ceased and the Aravallee, Vindhya and Satpura mountains are in the last stages of decay and so free from earthquakes. But the Himalayas and the mountains of Beluchisthan and Burmah are of recent formation and still throbbing in the later stages of their growth. Consequently it is in the vicinity of these mountains that earthquakes are now occurring. They are in fact, almost entirely confined to the north of a line joining Bombay to Delhi and Delhi to Calcutta and this area may be termed the danger-zone of India. The rest of India south of this line is an area of comparative safety in which minor shocks occur. During the present century earthquake has been confined merely to Beluchistan, Assam and Burmah. Assam Earthquake of 1897, Kangra, 1905, North Behar, 1934, Quetta, 1935.

তিনি বলিয়াছেন পৃথিবীর মহাস্পন্দনের সময় ভারতের উত্তরাংশে একটী মহা আলোড়ন হইয়াছিল, সেই সময় ইয়োরোপস্থ আল্প পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত একটী পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর মেখলার ন্যায়, পূর্ব্বে যাহা বিশাল সমুদ্র ছিল তাহারই বক্ষ হইতে যেন উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহা পৃথিবার উত্থানের তৃতীয় ও

চতুর্থ স্তরের সময়ে সংঘটিত হয়। ইহা বেশ বুঝতে পারা যায় যে যে ভূখণ্ডে অধুনা পর্ব্বত নির্ম্মিত হইতেছে, তাহারই সমীপবর্ত্তী স্থানেই এই ভূমিকম্পের প্রকোপ বেশী এবং প্রায় সেখানেই ইহা সীমাবদ্ধ। কঠিন প্রস্তরময় পর্ব্বত নির্ম্মিত হইবার সময়, শৈল উপাদান দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত হইবার সময় ফাটিয়া যায়, এবং তাহার শক্তিতে তত্রস্থ ভূখণ্ড আন্দোলিত হইয়া কম্পিত হইয়াই ভূমিকম্প হয়। দাক্ষিণাত্যে বহুকাল হইতে পর্ব্বত নির্ম্মাণ বন্ধ হইয়াছে। আরাবল্লি, বিন্ধ্য এবং সাতপুরা গিরি সকল বরং এখন তাহাদের জরা অবস্থায় আসিয়াছে এবং সেইজন্যই ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে আর কোন ভূমিকম্পের প্রকোপ নাই। পক্ষান্তরে হিমালয়, বেলুচিস্থানের পর্ব্বতশ্রেণী এবং ব্রহ্মদেশের পর্ব্বত সকল যেন তাহাদের শেষ বর্দ্ধনাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। সেইজন্য এই পর্ব্বতগুলির নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডেই ভূমিকম্পের আবির্ভাব হইতেছে। বলিতে গেলে, যদি একটা রেখা দ্বারা বোম্বাইকে দিল্লীর সহিত ও দিল্লীকে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে এই রেখার উত্তরাংশেই ভূমিকম্পের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং এই স্থানেই ভূমিকম্পের আশঙ্কা বেশী। ইহার দক্ষিণাংশে অপেক্ষাকৃত ভূমিকম্পের কম আশঙ্কা বশতঃ নিরাপদ। আসামের ভূমিকম্প ১৮৯৭, কাঙ্ড়া উপত্যকায় ১৯০৫, উত্তর বিহারে ১৯৩৪ ও কোয়েটাতে ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিন্ধ্যগিরিতে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যে তাহার উত্থান বন্ধ হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং বহুদর্শী পর্য্যবেক্ষণক্ষম অগস্ত্য ঋষি, যিনি দাক্ষিণাত্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া খ্যাত, এই বিন্ধ্যগিরি পদব্রজেই উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই তিনি ইহা

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন যে এই বহু পুরাতন গিরিশ্রেণী তখন তাহার পতন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার নূতন নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান অভাবে তাহার উত্থান বন্ধ হইয়াছে এবং তখন তাহার ক্ষয়ের লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সেই বহুদর্শিতার বিষয় তখন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আর তাহাই রূপকাকারে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের, গুরু অগস্ত্যের আদেশে চিরপ্রণত অবস্থায়, স্থিতিরূপে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বাল্মীকিরও এইরূপ একটী পর্য্যবেক্ষণ কুশলতার উদাহরণ পরে এই রামায়ণেই আমরা দেখাইব। সর্ব্ব উচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৯০২ ফিট উচ্চ আর সূর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে কত তাহা এখন বালকেরাও জানে। সুতরাং বিন্ধ্যপর্ব্বত কর্ত্তৃক সূর্য্যের ভ্রমণপথ অবরোধ যেন বাতুলেরই উক্তি। আবার পৌরাণিক গল্প আছে অগস্ত্য ঋষি গণ্ডুষে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন। ইহার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই সম্ভব। অর্থাৎ তিনি আত্মজ্ঞানী ছিলেন। মনরূপ সমুদ্র যাহাতে কেবলই চাঞ্চল্যরূপ তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে উদ্বেলিত ও বিচলিত করে, অগস্ত্য ঋষি সেই তরঙ্গ সহিত সমুচ্চয় মনটাকেই যেন গণ্ডুষে উদরস্থ করিয়া তাহার লয় সাধন করিয়াছিলেন। মনের একবারে লয় না হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদ ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ।

রাম অগস্ত্যাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া পঞ্চবটীবনের উদ্দেশে গমন করিলেন। তাঁহারা সেই বনের সন্নিকট হইলে পথিমধ্যে ভীষণ পরাক্রমশালী বৃহৎকায় এক গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা তাকে রাক্ষস বোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' তখন সেই পক্ষী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমাকে তোমার পিতার বয়স্য জটায়ু বলিয়া জানিও।" তখন রাম তাহাকে পিতার সখা জানিয়া তাহার কুল ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই পক্ষী প্রসঙ্গক্রমে সমস্তপ্রাণীর উৎপত্তি প্রকরণ কীর্ত্তন করিয়া নিজের নাম ও কুলের পরিচয় দিল। তৎপরে রাম বনে প্রবেশ করিয়া তথায় কুটির নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একদিন রাবণভগ্নী শূর্পণখা নাম্নী রাক্ষসী সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। সেই মহোদরী, দুর্ম্মুখা, বিরূপাক্ষী, অপ্রিয়দর্শনা বৃদ্ধা রাক্ষসী সেই সুমুখ, ক্ষীণকোটি, বিশাল-নয়ন, প্রিয়দর্শন, যৌবনসম্পন্ন রামকে দেখিয়া কাম-মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে সস্ত্রীক এই রাক্ষসসেবিত দেশে আসিয়াছ কেন?" রাম তাঁহার নিজের পরিচয় ও আসিবার কারণ বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী? তোমার এই 'মনোজ্ঞ' অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি

কোন রাক্ষসী তুমি এখানে কেন আসিয়াছ যথার্থ বল।" তখন সেই কামাতুরা (মদনমর্দ্দিতা) রাক্ষসী বলিল, "আমি কামরূপিণী রাক্ষসী, রাবণের ভগ্নী, সর্ব্বভয়ঙ্করা শূর্পণখা। আমি তোমাকে প্রথম দর্শনেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া, তাহাদিগের মত না লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। আমি বীর্য্যবতী, বলপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্র যাইতে পারি। তুমি চিরকাল আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া তুমি কি করিবে? সে কদাকার এবং কুরূপা, সুতরাং তোমার যোগ্য নহে। আমিই তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা। আমি তোমার ভ্রাতা এবং এই মানুষী বিরূপা, করালা ও নতোদরী অসতী নারীকে ভক্ষণ করিব। তৎপর তুমি কামভোগী (কামী) হইয়া পর্ব্বত শিখরে ও বনে·বিচরণ করিবে। তখন রাম সহাস্যে সেই কামার্ত্তা শূর্পণখাকে কহিলেন, "ইনি (সীতা) আমার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং তোমার সপত্নী থাকা অত্যন্ত ক্লেশ-দায়ক হইবে। তৎপরিবর্ত্তে আমার এই প্রিয়দর্শন অবিবাহিত ভ্রাতা লক্ষণই তোমার উপযুক্ত পতি হইবার যোগ্য। তুমি সপত্নীশূন্যা হইয়া আমার এই ভ্রাতাকে ভজনা কর।" তখন সেই কামমোহিতা রাক্ষসী রামকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণকে তাহার স্বামী হইতে অনুরোধ করিল। তখন লক্ষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কমলবর্ণে! আমি আমার জ্যেষ্ঠের দাস, সুতরাং আমার ভার্য্যা হইয়া দাসী হইবার ইচ্ছা কেন করিতেছ? হে বিশালাক্ষি! তোমার বর্ণে মালিন্যের লেশ মাত্রও নাই।· তুমি আমার জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠা পত্নী হইয়া প্রীতা হও, তাহা হইলে, তিনি ঐ নতোদরা কুরূপা, বিকৃতকায়া ও বৃদ্ধা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। বরবর্ণিনি! কোন্ বুদ্ধিমান, শ্রেষ্ঠরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানবগর্ভজাত রমণীতে প্রণয় স্থাপন করে?" তখন সেই পরিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞা মদনাতুরা বিকৃতাকারা

রাক্ষসী পর্ণকুটির মধ্যে সীতাসহ উপবিষ্ট অধর্ষণীয় রামের নিকট যাইয়া বলিল, "তুমি এই কুরূপা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে ঘৃণা করিতেছ। আমি এক্ষণে তোমার সম্মুখেই এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব।" এই কথা বলিয়া সে সীতার প্রতি ধাবিতা হইল। তখন রাক্ষসীকে সীতার দিকে আসিতে দেখিয়া রাম লক্ষণকে বলিলেন, "নিষ্ঠুর স্বভাব অনার্য্যাদিগের সহিত কোনমতেই পরিহাস করা উচিত নহে। তুমি এই কামাতুরা রাক্ষসীকে বিকৃতরূপা কর।" তখন লক্ষণ অসি বাহির করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সেই রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই বিকৃতরূপা রাক্ষসী রুধিরাপ্লুতা দেহে গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল এবং জনস্থানে রাক্ষসগণ পরিবৃত অতি তেজস্বী ভ্রাতা খরকে তাহার এই নিগ্রহের ও লাঞ্ছনার কথা সবিস্তারে বলিল।

তখন রাক্ষসাধিপতি খর তাহার ভগিনীর সেই বিকৃতরূপ দেখিয়া ক্রোধে কম্পিত হইয়া তাহাকে বলিল, "তুমি ঈদৃশী রূপবতী, * কে তোমাকে এরূপ কুৎসিতা করিয়াছে? তুমি কামরূপিনী, ইচ্ছামত সকল স্থানে যাইতে সমর্থা। তুমি কাহাদ্বারা এরূপ নিগৃহীতা হইয়াছ তাহা আমাকে বল, আমি অবিলম্বে তাহার প্রাণবিনাশে শাস্তি বিধান করিব।" তখন শূর্পণখা অশ্রুমোচন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কথা বলিয়া তাহাকে কহিল, "তুমি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিলে, আমি তাহাদের ফেনযুক্ত রক্তপানে তৃপ্ত হইব"। তখন খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ত তুল্য মহাবলশালী চতুর্দ্দশ

---

* এখানে দেখা যাইতেছে সে অনার্য্য রাক্ষসদের দৃষ্টিতে (Standard) রূপবতীই ছিল, এবং নিজকে সেইরূপই ভাবিত, তাই আর্য্যা সীতার রূপ তাহার নিকট বিসদৃশ বোধ হওয়াতেই তাঁহার রূপের নিন্দা সে করিয়াছিল।

রাক্ষসকে আজ্ঞা করিল "জটাবল্কলধারী শস্ত্র সমন্বিত দুইজন মনুষ্য রমণীর সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে সেই কামিনীর সহিত বিনাশ করিয়া আইস।"

"ইতি তস্যাং ব্রুবাণায়াং চতুর্দ্দশ মহাবলান্।

ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসানন্তকোপমান্॥"

সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষস শূর্পণখার সহিত সেই আশ্রমের উদ্দেশে ধাবিত হইল। তখন রাম বলিলেন,

"মুহূর্ত্তং ভব সৌমিত্রে সীতায়াঃ প্রত্যনন্তরঃ।

ইমানস্যা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ॥

বাক্যমেতৎ ততঃ শ্রুত্বা রামস্য বিদিতাত্মনঃ।"

সুমিত্রানন্দন! যাবৎ আমি এই রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ না করি তাবৎ মুহূর্ত্তকাল তুমি সীতার নিকট থাক।" আত্মজ্ঞ রামের সেই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ "তাহাই হইবে" বলিলেন। তখন রাম সেই রাক্ষসগণকে বলিলেন আমরা দণ্ডকারণ্যে আসিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক ফলমূলাহার করিয়া তপস্যাচরণ করতঃ ধর্ম্মচারী হইয়া বাস করিতেছি; তোরা কেন আমাদিগের হিংসা করিতেছিস; তোরা পাপাত্মা ও ঋষিগণের অপকারী; আমি ঋষিগণের আদেশ মত তোমাদিগকে সংহার করিতে ধনুর্ধারণ করিয়া এই মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি তোদের জীবনে ভয় থাকে তবে পলায়ন কর্।" তখন সেই রাক্ষসেরা রামের প্রতি শূল নিক্ষেপ করিলে রাম ধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসকে বধ করিলেন।

খর প্রেরিত চতুর্দ্দশ রাক্ষস নিহত হইলে শূর্পণখা তাহার ভ্রাতার নিকট যাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সেই খর তখন সেনাপতি

দূষণকে তাহার অনুচর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে উদ্যোগী করিল। তখন ধূসরবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ, সেই যুদ্ধগামী সৈন্যের উপর ঘোর রবে রক্তমিশ্রিত জলবর্ষণ করিতে লাগিল; রক্তমিশ্রিত জল সহিত আকাশ আবৃত করিয়া ঘোর অন্ধকার করিল; অসময়ে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। রাহু অকালে সূর্য্যকে গ্রাস করিল; প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; বিনা বায়ুতেও মেঘের ন্যায় ধূসরবর্ণ রেণু উঠিল; এইরূপ আরও অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা হইল। তৎপরে রাম সেই খরদূষণ পরিচালিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে দেবগণ রামের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "রাম এই মহাযুদ্ধে খর দূষণ যাহাদের মধ্যে প্রধান, সেই চতুর্দ্দশ সহস্র কামরূপী রাক্ষসকে সার্দ্ধ মূহুর্ত্তে নিধন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! আত্মতত্ত্বদর্শী রামের এই কার্য্য কত মহৎ।"

"অর্দ্ধাধিক মুহূর্ত্তেন রামেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্।
খরদূষণ-মুখ্যানাং নিহতানি মহামৃধে ॥
অহোবত মহৎকর্ম্ম রামস্য বিদিতাত্মনঃ।

দেবতারা অন্তর্হিত হইলে অগস্ত্য সহিত সমস্ত ঋষিমণ্ডলী তথায় সমবেত হইয়া রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন "এই সকল পাপকর্ম্মরত রাক্ষসদিগের বধ সাধনার্থ ই মুনিগণ কৌশল করিয়া তোমাকে এ প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন। তুমি আমাদের সেই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিলে। ঋষিগণ অদ্য অবধি দণ্ডকারণ্যে নিরাপদে ধর্ম্মকার্য্য করিবেন।"

সমস্ত রাক্ষস নিধনপ্রাপ্ত হইলে একমাত্র অকম্পন কোনরূপে পলাইয়া লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে সমস্ত বিবরণ বলিল। সে রামলক্ষ্মণের অমানুষিক বীর্য্যবত্তা ও সীতার অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া

রাবণকে সেই সীতাকে হরণ করিয়া আনিবার জন্য বলিল। তখন রাবণ মারীচের নিকট যাইয়া সীতাহরণ কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলে মারীচ তাহার পূর্ব্বাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে রামের সহিত শত্রুতা করিতে নিষেধ করিল। রাবণ সেই সময়ের জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিল। ইহার পরেই শূর্পণখা লঙ্কায় রাবণের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহার দুর্দ্দশার অবস্থা দেখাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিল "তুমি এখানে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছ, আর তোমার রাজ্য জনস্থানের সমস্ত রাক্ষস রাম নামে এক মহাবীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধারী মনুষ্যের হস্তে নিহত হইয়াছে। তাহার এক পরমাসুন্দরী ভার্য্যা আছে। আমি তোমার জন্য সেই পরম-রমণীয় নারীরত্ন সংগ্রহ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল করিয়াছিলাম। প্রথমে সেই রামকে প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সেই সীতাকে ধর্ষণ করিবার ভয় দেখাইলে, তাহার ভ্রাতা অতি বীর্য্যবান লক্ষ্মণ আমার নাসিকাকর্ণচ্ছেদন করিয়া আমাকে এইরূপে বিরূপা করিয়াছে, আমার নিগ্রহের প্রতিশোধ লইবার জন্য চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ খর ও দূষণ রামকে আক্রমণ করিলে সে পদাতি হইয়াও সার্দ্ধ-মূহূর্ত্তে তাহাদিগকে সমূলে নিধন করিয়াছে।

"রক্ষসাং ভীমবীর্য্যানাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
নিহতানি শরৈ স্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাভিনা।
অর্দ্ধাধিক মুহূর্ত্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ।"

অতএব আপনি অবিলম্বে যাইয়া সেই রামকে জয় করিয়া তাহার সেই পত্নীকে লইয়া আসিয়া আপনার ক্রোড় শোভিত করুন। রাক্ষসদের নিধনে আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শূর্পণখা অনার্য্যা। সেও লঙ্কাদ্বীপের আদিম নিবাসী জাতীয়া নারী এবং সেই জাতির রাজা বা প্রধানের ভগ্নী। সুতরাং সে নিজেকে তাহাদের মাপকাঠিতে সেই জাতীয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়াই মনে করিত। তাই সে যুবক ও সৌন্দর্য্যবান আর্য্যজাতীয় রামকে দেখিয়া তাহাকে পতিরূপে পাইতে কামনা করিয়াছিল। সে প্রকৃত নিজ-মূর্ত্তিতেই গিয়াছিল, মায়াদ্বারা কোন মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করে নাই, তাহা বাল্মীকির উভয়ের রূপের তুলনামূলক বর্ণনাতেই উপলব্ধি হয়।

"সুমুখং দর্ম্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী ॥
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্দ্ধজা।
প্রিয়রূপং বিরূপা সা সুস্বনং ভৈরবস্বনা ॥
তরুণম্ দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণস্ বামভাষিনী।
ন্যায়বৃত্তম্ সুদুর্ব্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা ॥"

রাম তাহাকে উপহাসচ্ছলেই বলিয়াছিলেন "ত্বংহি তাবন্মনোজ্ঞাঙ্গী রাক্ষসী প্রতিভাসি মে।" দুই ভ্রাতার নিকটই প্রত্যাখ্যাত হইয়া সীতাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে তখন লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন। তাহার অবমাননার প্রতিশোধ লইতে চৌদ্দ জন রাক্ষস আসিলে ক্ষিপ্রহস্ত রাম চৌদ্দটী শর দ্বারা তাহাদিগকে নিধন করিলেন, কেননা তাহারা ধনুঃশর ব্যবহার করিতে জানিত না। এ পর্য্যন্ত রামের কোন অমানুষিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎপরে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস আসিলে রাম লক্ষ্মণকে কুটিরাভ্যন্তরে সীতাকে রক্ষা করিতে বলিয়া একাকীই যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে সার্দ্ধ মুহূর্ত্তে বিনাশ করিলেন। ইহা কিন্তু মনুষ্য রামের মানবীয় শক্তির দ্বারা সাধন, সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ

হয়। ইহা বিষ্ণু অবতার রামের বিষ্ণুত্ব-প্রাপ্তি অবস্থাতে সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন বক্তব্যও নাই। আর একটী লক্ষ্যের বিষয় বাল্মীকি দুই স্থানেই চতুর্দ্দশ ও চতুর্দ্দশ সহস্র একই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কোন সংখ্যাও তো বলিতে পারিতেন! যাহাদের নিকট অর্থাৎ রাম লক্ষ্মণ ও সীতার নিকট তিনি এই রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই এই নির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সংখ্যা গণনা করিবার অবসর পান নাই। রামের অস্ত্রের মধ্যে ধনুঃশরই তাঁহার প্রধান অস্ত্র ছিল। তিনি যতই ক্ষিপ্রহস্ত হউন না কেন এই চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিতে তাঁহাকে তত সংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তাহা কি মনুষ্যের পক্ষে অর্দ্ধ মুহূর্ত্তে সম্ভব হয়? সুতরাং এই চতুর্দ্দশ সংখ্যাতে অন্য কিছু রহস্য নিহিত আছে ইহাই অনুমান করিতে হইবে। আবার তাহারা খর ও দূষণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়াছিল। এই দুইটী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি হয় তাহাই দেখা যাউক।

খর বা প্রখর। খরংক্লীং (খায় অন্তরিন্দ্রিয়ায় খস্য বা তীব্রতারূপ-গুণং রাতীতি খ+রা+কঃ) তীব্রম্, তীক্ষ্ম্। খরঃ পুং = গর্দ্দভঃ। দূষণঃ (দূষয়তীতি দূষি+ল্যুঃ) ক্লীবলিঙ্গে দোষে। দুষ ধাতু হইতে সম্পন্ন—দুষ্ট বা বিকৃত হওন। তাহা হইলে এই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস দূষিত বিকৃত বা অশুদ্ধ হইয়াছিল—তাহাদের সেনাপতি দূষণ কর্ত্তৃক চালিত বা উত্তেজিত হইয়া। আবার তাহারাই তাহাদের প্রভু খর কর্ত্তৃক অতিতীক্ষ্ন বা তীব্ররূপে দুষ্ট হইয়াছিল। যেমন একাদশরুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, নবগ্রহ তেমনই এমন একটী আরও কিছু আছে যাহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ পরিমিত। এই চতুর্দ্দশ সংখ্যাতে তাহারই নির্দ্দেশ হইয়াছে। তাহা হইতেছে চতুর্দ্দশ করণ। করণ = ক্রিয়তে অনেন—

যাহা দ্বারা কার্য্য করা হয়=ক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণম্। আমাদের দেহের ক্রিয়ানিষ্পত্তিকারণও চতুর্দ্দশটী। অন্তঃ বা অভ্যন্তরে ক্রিয়া নিষ্পত্তি-কারণ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী একত্রে অন্তঃকরণ। আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটী-একুনে চতুর্দ্দশ করণ। আত্মা এই চতুর্দ্দশ করণ দ্বারাই কার্য্য করেন। যথা সর্ব্বসার উপনিষদে ঃ—"মন আদি চতুর্দ্দশ করণৈঃ পুষ্কলৈঃ আদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যথা উপলভতে তদ্ আত্মনোঃ জাগরণম্" তথা "চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্ বিশেষ বিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্ নোপলভতে তদ্ আত্মনো সুষুপ্তম্॥" অর্থাৎ যখন পুষ্টিপ্রাপ্ত মন আদি চতুর্দ্দশকরণ সহায়ে আদিত্যাদির ক্রিয়া দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া বা তাহাদের সাহায্যে শব্দাদি স্থূল বিষয় উপলব্ধ হয় তখন আত্মার জাগরণ অবস্থা। আবার তাহাদেরই উপরম হইলে বিশেষ জ্ঞানের অভাব জন্য যখন শব্দাদি বিষয় উপলব্ধি হয় না তাহাই আত্মার সুষুপ্তি অবস্থা। চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যদি চতুর্দ্দশকরণই হয় তাহা হইলে তাহা রামের কিরূপ অবস্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে তাহাই আমরা তাঁহার পূর্ব্বাপর আচরণ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। যোগসাধনে উদ্যোগী রামের পক্ষেই ইহার প্রযোজ্যতা সম্ভব। রাম অগস্ত্য ঋষির নিকট উপদেশ পাইলেন—"সীতাতে সতত রত থাকিয়া তাহাকে প্রীত করিয়া, বিদ্যুতের ন্যায় চপলস্বভাবা-নারীরূপাজ্যোতি সীতাকে স্থিরা সৌদামিনীরূপে উপলব্ধি করিবে"। রাম সেই উপদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত হইয়া সীতারূপা আত্মহৃদি-জ্যোতিকে সতত মানসনয়নে রাখিতে অভ্যাস করিতেছেন, এমন সময়ে আসিল সে তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে—তাহার নিজের দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সৌন্দর্য্যাভিমানে। শূর্পণখা কামরূপী রাক্ষসী, তাই যেন রামের মানসনয়নে কোন

'মনোজ্ঞাঙ্গী'-রমণী মূর্ত্তি উদিত হইয়া তাঁহাকে তাহার সহিত উপভোগ কামনারূপ প্রলোভন প্রদর্শনে তাঁহার মনের বিক্ষেপ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিল ; তাহাতে সিদ্ধ না হইয়া সে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তিতে ভয় দেখাইয়া তাঁহার সেই দৃষ্ট সীতাজ্যোতিকেই গ্রাস করিতে যাইতেছিল। তাই রাম তাঁহার পৌরুষ রূপ 'সৌমিত্রি'কে বলিলেন 'উহাকে নিবৃত্ত কর'।

"ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে···।"

যেন রাম নিজের পৌরুষবলেই সেই লুব্ধকারিণী মনোজ্ঞাঙ্গী মানসনয়নে ক্ষণোদিতা রমণী মূর্ত্তির বিরূপতা সাধন করিলেন, যেন আর তাহা তাঁহার মনকে আকর্ষণ না করিতে পারে। প্রলোভন ও ভীতিরূপ দুই বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধেও তিনি মনের স্থৈর্য্য অটুট রাখিতে পারিলেন। এই শূর্পণখারূপ কামরূপিণী রাক্ষসীকে তিনি তৎকালের জন্য বিরূপা করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাহাকে উপহাস ছলেই যেন তাচ্ছিল্য করিয়াই তাহা করিলেন। যেন মারীচের মতই তাহাকে তৎসময় শীতল বা ঠাণ্ডা করিয়া রাখিলেন। তিনি যদি মারীচ ও এই শূর্পণখাকে বধ করিতেন তাহা হইলে আর কোনও অনর্থই হইত না। ইহা যেন সেই সাময়িক 'রাগ ঠাণ্ডা করার ন্যায়।' তাই তাহারা চিরতরে দমিত হইল না। যেমন কোন শত্রুকে চিরতরে বধ না করিলে শুধু ঠাণ্ডা করিলে সে আবার শত্রুতা করে, যেমন বিষধর সর্প এক 'ঘা' যষ্ঠি প্রহারে সাময়িক নিবৃত্ত হইলেও পরে উপযুক্ত অবসর পাইলেই দংশন করে, তেমনি এই রিপুগুলিও শুধু শীতল হইলেই চিরতরে নিবৃত্ত হয় না, ফাঁক পাইলেই সাধককে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করে। এই শূর্পণখারূপ কামরূপীরিপু, সেই ক্ষণতরে বিকলাঙ্গ সর্পের ন্যায় নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় দংশন করিতে আসিল—সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস রূপ চতুর্দ্দশ করণকে প্রখর ও দূষণীয় করিয়া, তাহাদের বলে

বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া। প্রথমে এই চতুর্দ্দশকরণ, অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থাতেই যেন মাত্র চতুর্দ্দশ রাক্ষস রূপেই রামকে বিধ্বস্ত করিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়া নিরস্ত করিলেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে এই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু তার পরেই আসিল তাহারা চতুর্দ্দশ সহস্রের ন্যায় শক্তিশালী হইয়া, অশুদ্ধ হইয়া, দুষ্ট হইয়া, খর বা তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া রামের পুরুষকেই আক্রমণ করিতে। তাই তিনি তাঁহার পৌরুষরূপ লক্ষ্মণকে (সৌমিত্রি) সীতাতেই যেন রত রাখিয়া অর্থাৎ লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ কুটিরে থাকিয়া অবহিত হইতে বলিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রকৃতি যখন বিকারপ্রাপ্তা হয় না, তখন সে শান্ত এবং সাম্যভাবাপন্না অবস্থায়, পুরুষের সহিত যেন মৈত্রীসূত্রেই যমজ-সন্তানের ন্যায় একমাতৃক্রোড়ে অবস্থিতা থাকে। কিন্তু তাহার বিকৃতি বা তাহাতে বিকার উৎপন্ন হইলেই সে তখন পুরুষকে অভিভূত করিবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রকাশ করে। ঐ চতুর্দ্দশ করণ, প্রকৃতিরই চতুর্দ্দশ প্রকার বিকৃতি। দূষণ অর্থে বিকারপ্রাপ্তি। তাই যেন বিকারপ্রাপ্তা প্রকৃতি প্রখর ও দুষ্ট হইয়া রামের পুরুষ বা আত্মাকেই বিধ্বস্ত করিতে আক্রমণ করিল। সমস্ত প্রকৃতি বিকৃত হইয়া আলোড়িতা হইলে, যেরূপ দুর্দ্দৈব হয় ঠিক সেইরূপই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের লক্ষণ সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের আগমন সময়ে দৃষ্ট হইয়াছিল। যথা মহাভয়ঙ্কর মেঘ ঘোররবে রক্তমিশ্রিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, সূর্য্যমণ্ডলে অঙ্গারচক্র সদৃশ এক পরিবেষ হইল,

"শ্যামং রুধিরপর্য্যন্তং বভূব পরিবেষণম্।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্।"

অসময়ে সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিক অন্ধকার হইল। ভয়ঙ্কর

পশুপক্ষী সকল ভীষণ চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল। এই সমস্তই প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের লক্ষণ। এই খর দূষণ পরিচালিত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিতে রামকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, বাল্মীকি তাহা অতি দীর্ঘ বিস্তারিত যুদ্ধের বিবরণে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা সেই প্রখর দূষিত চতুর্দ্দশ করণের সহিত রামের পুরুষের যুদ্ধ বা নিজকে অব্যাহত রাখিয়া প্রকৃতি কর্ত্তৃক অভিভূত না হইবার চেষ্টা। রাম তখন আত্মহৃদিজ্যোতিতে মগ্ন। যতই তাঁহার বুদ্ধি, মন ইন্দ্রিয়াদি প্রখর ও দূষিত হইয়া তাঁহাকে সেই জ্যোতি হইতে স্খলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে ততই তিনি আত্মবলে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাই খর যেন মরিয়াও মরিতেছেনা। শেষে রাম ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ বাণে যেন ব্রহ্মের শাসনেই তাহাকে বধ করিলেন। যেন ব্রহ্মই তাঁহার দণ্ড প্রেরণ করিলেন। রাজা দণ্ডাদেশ দেন। অধীন কর্ম্মচারী তাহা কার্য্যে পরিণত করে। পরমাত্মা রূপ সার্ব্বভৌম রাজার দণ্ডাদেশে তাঁহারই অংশ আত্মারূপ কর্ম্মচারী সেই দণ্ড কার্য্যকরী করিল। এইরূপ চতুর্দ্দশকরণসহই, রামের কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই বাল্মীকি রূপকাকারে বর্ণন করিয়াছেন। আর ইহাই তাঁহার রহস্য প্রকাশ। এইরূপ তাৎপর্য্য না হইলে রামের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এই কামরূপী রাক্ষসীর নাম কেন বাল্মীকি শূর্পণখা রাখিলেন? শূর্পাইব নখা যস্যাঃ। যাহার নখ শূর্পের ন্যায় সেই শূর্পণখা= পরিমাণ করা যেমন শূর্পয়তি ধান্যং গৃহী। গৃহী ধান্য মাপ করে। যদ্বা শৃ-হিংসায়াম্ হিংসার প্রতীক শূর্প=হিন্দীতে কুলাকে শূর্প বলে =কুল্যঃ, কুলা ইতি ভাষা। তাহা হইলে কুলার ন্যায় নখ যাহার সেই শূর্পণখা। আদিম মনুষ্যেরা নখ কাটিতে জানিত না, তাহা কুলার ন্যায়

বৰ্দ্ধিত হইত। এই নখই তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। তখন বৃক্ষ ফলমূলাদি তাহাদের আহার্য্য ছিল। এই নখ দ্বারা তাহারা মাপ বা নির্ণয় করিতে পারিত কোন ফল বা মূলটী ভেদ্য বা আহারযোগ্য। যেমন লোকে নখ দ্বারা আম্র, লিচু, কাঁটাল ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নরম ফলের আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কোমলত্ব মাপ বা নির্ণয় করে। তেমনই শূর্পণখারূপ কামরূপী রাক্ষসী রামকে মাপ করিতে আসিয়াছিল তিনি কিরূপ আক্রমণে ভেদ্য। অর্থাৎ সে প্রথমে নিজকে, নিজ অনুমানানুযায়ী সুন্দরী নারী মনে করিয়া, রামের কামপ্রবৃত্তির উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিল, তাহাতে বিফল হইয়া তাহার হিংসা প্রবৃত্তিতে সীতাকে তাহা অপেক্ষা কত নিকৃষ্টা বলিল, তাহাতেও অকৃতকার্য্যা হইয়া শেষে ভয়প্রদর্শন করিয়া রামের নিকট হইতে যেন সীতারূপী জ্যোতিকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। কোনরূপ প্রয়াসেই যখন সে কৃতকার্য্য হইলনা তখন সেই প্রকৃতিজ কামরূপিণী রাক্ষসী প্রকৃতিরই সমস্ত ক্রিয়ার যন্ত্ররূপ করণগুলিকে লইয়া রামের শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিল। তারপর তাহাতেও বিফল হইয়া সে গেল তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভ্রাতা রাবণের নিকট। তাহাকে যাইয়া বলিল যে, সে রামকে মাপ বা পরিমাণ করিয়া আসিয়াছে; রাম সহজে প্রলোভন, হিংসা বা ভীতিপ্রদর্শনে ভেদ্য নহে; সুতরাং এবার তাহার (রাবণের) নিজের যাওয়াই প্রয়োজন, যেহেতু যেরূপে হউক তাহাকে (রামকে) সীতাচ্যুত করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে একস্থানে মুনিরা বলিয়াছিলেন যে রাবণ যাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাহাকে ধর্ষণ করিতে তাহার অনুচরদিগকে পাঠায়; আর যেখানে দৃঢ়ব্রত পুরুষকে সাধনাচ্যুত করিতে বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়, সেখানেই সে নিজে যায়। অর্থাৎ যে সকল তপস্বীরা

সাধনাপথে মন সংযম করিয়া দৃঢ়ব্রত হইতে পারে না, তাহারা অল্পাধিক কামনা বাসনাতেই বা প্রলোভনে অভিভূত হইয়া, সাধনা পথভ্রষ্ট হয়—তাহাদিগকেই রাবণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তাহার অনুচরগণকে পাঠায় অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তিগুলিই তাহাদের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। ইহাই শূর্পণখার স্বরূপ এবং তাহার কার্য্যেই তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার যে তাৎপর্য্য এইরূপই তাহা বাল্মীকি দেবতাদের মুখেই প্রকাশ করাইয়াছেন "রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সার্দ্ধ মুহূর্ত্তেই নিধন করিয়াছেন। আত্মদর্শী রামের এই কার্য্য কত মহৎ।" ইহা বাল্মীকির নিজেরই কথা দেবভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবতাদের পক্ষেও ইহা আশ্চর্য্য। কেননা মনুষ্য ভিন্ন এরূপ সাধনা দ্বারা আত্মদর্শনলাভ দেবতাদেরও হয় নাই। তাই ইহা তাহাদের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মারীচবধ ও সীতাহরণ

লঙ্কাধিপতি রাবণ এইরূপে শূর্পণখা কর্ত্তৃক র্ভৎসিত হইয়া সীতা হরণ করিয়া রামকে বধ করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাহার মনে মারীচের কথা স্মরণ হওয়াতে, সে অবিলম্বে তাহার অন্বেষণে প্রস্থান করিয়া মারীচের সাক্ষাৎ পাইলে সে শূর্পণখার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত বলিয়া তাহার সাহায্য চাহিল এবং মারীচকে বলিল, "তুমি রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ কর; সীতা মায়াবলে মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া, পতি রাম ও দেবর লক্ষণকে 'উহাকে ধর' বলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাহারা স্থানান্তরে গমন করিলে আমি শূন্য আশ্রমে যাইয়া বিনা বাধায় যথাসুখে সীতাকে হরণ করিব। পরে রাম সীতাহরণ জন্য কাতর হইলে, আমি কৃতকৃত্যচিত্তে সুখে তাহাকে দৃঢ়রূপে প্রহার করিব।" রামের পরাক্রম বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞ মারীচ রাবণের সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া রাবণকে অনেক হিতকথা বলিয়া একার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রাবণ ক্রোধান্বিত হইয়া যখন তাহার উপর বলপ্রকাশে উদ্যত হইল, তখন অগত্যা সে তাহাকে তাহার কথামত সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। তৎপরে তাহারা উভয়ে দণ্ডকারণ্যে রামের আশ্রমের নিকট উপনীত

হইলে, মারীচ অত্যন্ত অপূর্ব্ব দৃশ্য মৃগরূপ ধারণ করতঃ, রামের আশ্রমের অদূরে বিচরণ করিতে লাগিল এবং নানারূপ অঙ্গসঞ্চালন করিয়া, সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আশ্রমের নিকটস্থ হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই সময়ে সীতা ইতস্ততঃ কুসুমচয়ন করিতে করিতে সেই মৃগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই রজতবর্ণ রোমযুক্ত পদ্মকেশরের ন্যায় গাত্র রং বিশিষ্ট মনোহর মৃগকে তিনি সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে সেইস্থানে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সেই হরিণকে দেখিতে পাইলে, লক্ষ্মণ রামকে কহিলেন, "এমন রত্নচিত্রিত মৃগ পৃথিবীতে নাই। আমার বোধ হইতেছে ইহা সেই কামরূপী রাক্ষস মারীচ, মায়াদ্বারা এইরূপ মনোহর মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে।" সীতা লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া রামকে কহিলেন "এই হরিণ অতি সুন্দর, আমার মন হরণ করিয়াছে ; আপনি ইহাকে ধৃত করিয়া আনুন, এ আমাদের ক্রীড়ার নিমিত্ত হইবে ; যদি আপনি ইহাকে জীবিত ধরিতে পারেন, তবে বড় চমৎকার হয় ; এ আমাদের অনেক বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আমরা বনবাসান্তে অযোধ্যায় যাইলে এ আমাদিগের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিবে। যদি ইহাকে জীবিত ধরিতে না পারেন, তাহা হইলে ইহার স্বর্ণচর্ম্ম কুশাসনের উপর বিস্তীর্ণ করিয়া, আমরা উভয়ে উপবেশন করতঃ প্রীত হইব।" রাম সীতার অনুরোধক্রমে ও ঐ মৃগের সৌন্দর্য্যে প্রলোভিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "সীতার এই হরিণটী পাইবার জন্য কিরূপ বলবতী কামনা হইয়াছে তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ ; এই হরিণকে এমন সুন্দর দেহ লইয়া আজ আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এই অপরূপ মৃগ কাহার মন না লুব্ধ করিতে পারে ? আর এ যদি তোমার কথামত মারীচেরই

মায়া হয়, তাহা হইলে উহাকে আমি বধ করিব। আমি ইহাকে ধরিব বা বধ করিব। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি উহাকে ধরিয়া ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ তুমি সীতাকে রক্ষা করিবে। যেহেতু ইঁহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য।"

লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া রাম ধনুর্ব্বাণ ও অসিহস্তে সেই মৃগকে ধরিতে ধাবমান হইলে, সে ভয়প্রযুক্ত একবার অন্তর্হিত হইয়া আবার তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এইরূপে সে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট ও অদৃশ্য হইয়া রামকে আশ্রম হইতে বহুদূরে লইয়া গেল। তখন রাম সেই মৃগকর্ত্তৃক মোহিত ও ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই সেই মৃগরূপী মারীচ তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে উন্মনা করিল "স তন্মুদয়ামাস" এবং তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত দেখিয়া পুনরায় পলায়ন করিল। আবার তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া রাম তাহাকে বধ করিবার জন্য শরত্যাগ করিলে, সেই শরে আহত হইয়া, রাবণের উপদেশমত তাহার উপকারার্থ রামের স্বর অনুকরণ করিয়া "হা লক্ষ্মণ, হা সীতে" এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন রাম সীতার বিষয় চিন্তা করতঃ লক্ষ্মণের সতর্কবাণীর কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইলেন। পরে অন্য এক মৃগ হননপূর্ব্বক তাহার মাংস সংগ্রহ করিয়া জনস্থানের দিকে ত্বরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে সীতা স্বামীর কণ্ঠস্বরের ন্যায় সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ লক্ষ্মণকে শীঘ্র যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহা শুনিয়াও লক্ষ্মণ যখন রামের আদেশ স্মরণ করিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সীতা তাঁহাকে অযথোচিত তিরস্কার করিতে

লাগিলেন এবং গোদাবরীতে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। লক্ষ্মণ অনন্যোপায় হইয়া বিমর্ষমনে, সীতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, রামের উদ্দেশে মহাবনে, যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবকাশে দশানন রাবণ গৈরিক বসন পরিহিত হইয়া কমণ্ডলুহস্তে সন্ন্যাসীর বেশে সেই অরক্ষিতা সীতার সমীপে উপস্থিত হইল "অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্।" সীতা তাহাকে ব্রাহ্মণ অতিথি মনে করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ভোজনার্থ সিদ্ধ-অন্ন প্রদান করিলেন। রাবণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

"সীতা নামাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া।
উষিত্বা দ্বাদশসমা ইক্ষ্বাকুনাং নিবেশনে।······
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ॥···
মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥"

আমি রামের প্রেয়সী মহিষী সীতা; আমি মনুষ্যভোগ্য বস্তুসকল ভোগ করিয়া সফলমনোরথ হইয়া দ্বাদশবর্ষ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। পরে ত্রয়োদশবর্ষে রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য, রাজা দশরথ সমস্ত অনুষ্ঠান করিলে, কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনানুসারে, আমার পতি বনবাস গ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আমার সহিত এই বনে আসিলেন। তখন আমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ ও আমার স্বামীর পঞ্চবিংশতি বর্ষ। * আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন তাঁহারা

* এখানে রামের বয়স সম্বন্ধে বাল্মীকির পূর্ব্ববর্ণনা অনুসারে কিছু গরমিল হয়। দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন, রামের বয়স তখন পঞ্চদশ বর্ষ। সীতা বলিতেছেন

তুই ভ্রাতা বনজাত বহু খাদ্যদ্রব্য এবং অনেক রুরু, গোধা ও বরাহ বধ করিয়া প্রচুর মাংস লইয়া আসিবেন। ব্রাহ্মণ! আপনি কে এবং কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?"

তখন রাবণ তীব্রবাক্যে কহিল "দেব, অসুর ও মানুষসেবিত সমস্ত লোক যাহার ভয়ে ভীত হইয়াছে, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। আমি নানাস্থান হইতে অনেক সুন্দরী স্ত্রী আনয়ন করিয়াছি; তুমি আমার মহিষী হইয়া সকলের প্রধানা হও। সমুদ্রপরিবেষ্টিতা পর্ব্বতশিখরোপরি আমার মহানগরীতে তুমি আমার সহিত যাইয়া সমস্ত প্রকার সুখসম্ভোগে সুখী হইবে।" তখন সীতা ক্রোধে ও ভয়ে কম্পিতা হইয়া তাহাকে বলিলেন "তুই শৃগাল, আমি সিংহী; তুই আমাকে পাইবার যোগ্য নহিস; তুই আমাকে কখনই স্পর্শ করিতে পারিবি না; তুই আমাকে হরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবি না—মরিবি।" তখন রাবণ নিজের বলবীর্য্য ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়া কহিল "আমি বৈশ্রবণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই দশগ্রীব রাবণ; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ প্রভৃতি সতত আমা হইতে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করে। আমি কোন কারণে কুপিত হইয়া নরবাহন কুবেরকে পরাজিত করিলে সে তাহার সমৃদ্ধিশালী বাসস্থান লঙ্কা ত্যাগ করিয়া কৈলাসে বাস করিতেছে। আমি বাহুবলে তাহার বিমানগামী পুষ্পকরথ কাড়িয়া লইয়াছি। আমার ক্রুদ্ধ বদন দেখিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ভয়ে পলায়ন করে। সূর্য্যও আমাকে দেখিয়া ভীত হয়। তুমি আমার সহিত যাইয়া আমার অমরাবতীর ন্যায় পুরী লঙ্কাতে বাস করিলে আর মনুষ্যজাতীয়া নারীদিগকে স্মরণ

দ্বাদশ বর্ষ তাঁহারা বিবাহের পর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, সেই হিসাবে রামের বয়স এখন সপ্তবিংশতি বর্ষ হয়।

করিবে না। তোমার স্বামী সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না।" তখন সীতা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন "রাক্ষস! তুই বজ্রধর ইন্দ্রের পত্নী শচীকে ধর্ষণ করিয়াও যদি জীবিত থাকিস তথাপি রামপত্নী আমাকে ধর্ষণ করিলে, অমৃতপান করিয়াও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না।" তখন সেই পাপাত্মা রাবণ বামহস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণহস্তে তাঁহার উরুদ্বয় ধারণ করিয়া ক্রোড়মধ্যে স্থাপন করতঃ রথে উঠিলে, সেই রথ উর্দ্ধে উঠিল। রাবণ-ক্রোড়স্থ সীতা আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে করিতে বৃক্ষোপরি-উপবিষ্ট গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখিয়া বলিলেন "আর্য্য জটায়ো! এই নির্দ্দয় রাক্ষসরাজ রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনি নিবারণ করিতে পারিবেন না। রাম ও লক্ষ্মণের নিকট আমার হরণ সমাচার অবশ্য দিবেন।"

ইতিহাসের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমরা প্রথমে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের আলোচনা করিব। রাম শূর্পণখাকে অনার্য্য বলিয়াছিলেন; সুতরাং সে অনার্য্যমনুষ্যজাতীয়াই ছিল। তাই অনুমান হয় সমুদ্রবক্ষে উত্থিত কোন দ্বীপবাসী আদিম মনুষ্যজাতি বিশেষের নেতা বা রাজা এই রাবণ ছিল। তাহার আবাসস্থান ঐ দ্বীপে স্থিত এবং তাহার নাম লঙ্কা। তাৎকালিক দ্বীপজাত প্রথম আদিম মনুষ্যজাতি কদাকার ও ভীষণাকৃতি ছিল, তাহা সমুদ্রমধ্যস্থ অনেক দ্বীপবাসী আদিম অসভ্য মনুষ্যজাতির সাদৃশ্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে এখনও অনেক নরমাংস খাদক জাতির কথা উল্লিখিত আছে। এই লঙ্কাবাসী মনুষ্যজাতির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়াতে, তাহারা তথাতে প্রচুর আহার্য্য ও মাংসাদি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ক্রমে সমুদ্রপার হইয়া ভারতউপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে

ক্রমে তাহারা অগ্রসর হইয়া বহুপ্রাণী নিবসিত দণ্ডকারণ্যে জনস্থান-নামক উপনিবেশ স্থাপিত করে। ইহার নাম জনস্থান দেওয়াতেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা মনুষ্যজাতীয় প্রাণীই ছিল। এখানে তাহারা তাহাদের প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হইল—সেই বিশাল অরণ্যবাসী প্রাণীবৃন্দনিধন দ্বারা। তাহারা হয় সন্তরণে অথবা বৃক্ষকাণ্ড হইতে নির্ম্মিত ভেলা দ্বারা সমুদ্রপার হইত। কেননা সমুদ্রতীর হইতে সেই দ্বীপ পর্য্যন্ত অগভীর জলই ছিল। তাহার প্রমাণ আমরা রামায়ণের অন্যত্র পাইয়াছি।

"দক্ষিণস্যোদধে স্তীরে ত্রিকুটো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা ॥" (উঃ কাঃ ৩।২৫)

অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকুট নামে পর্ব্বত আছে। তাহার শিখরের উপর ইন্দ্রের পুরীর তুল্য পুরী লঙ্কা। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সমুদ্র তীরেস্থিত ত্রিকুট পর্ব্বত সমুদ্রের কূল হইতে খুব বেশী দূরে স্থিত ছিল না। পুরীতে সমুদ্রস্নানকারীরা দেখিয়াছেন কতদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া সমুদ্রগর্ভে যাওয়া যায় এবং অনেক সময় সমুদ্রগামী জাহাজও দূরে দৃষ্টিগোচর হয়। যদি জল অগভীর না হইত তাহা হইলে সেই সকল জাহাজ পুরী উপকূলে আসিতে পারিত। এই ত্রিকুট পর্ব্বত সমুদ্র উপকুল হইতে নিকটবর্ত্তী ছিল বলিয়াই বলা হইয়াছে "উদধেস্তীরে।" এই দণ্ডকারণ্যস্থিত জনস্থানের বাসীগণ রাবণেরই আত্মীয়বর্গ ছিল, এবং তাহারই অধীন ছিল। দণ্ডকারণ্যে শুধু ঋষি ও তপস্বীরাই বাস করিতেন। এই সকল তপস্যীরা সভ্য আর্য্যজাতি সম্ভূত এবং আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই এখানে তপস্যার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। রামায়ণে কথিত হইয়াছে মহর্ষি-অগস্ত্য দাক্ষিণাত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত-

বাসী কোনও রাজার রাজত্ব তখনও সেই দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। অগস্ত্য ঋষি তাঁহার শিষ্য তাপসদিগের সহিত এক একটী আশ্রম স্থাপন করিতে করিতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া দণ্ডকারণ্যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার শেষ আশ্রম হইতে কয়েক যোজন দূরে এই জনস্থানরূপ রাক্ষসবসতি ছিল। অগস্ত্যঋষি এস্থানের সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন এবং ইহার নাম পঞ্চবটী বলিয়া রামকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং এখানে যে রাক্ষসবসতি রূপ জনস্থান ছিল তাহাও তিনি জানিতেন, কেননা রামের রাক্ষস বধের প্রতিজ্ঞার বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি এই রাক্ষসসেবিত স্থানেরই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। যখন এই নরখাদক রাক্ষসগণ আর্য্যাবর্ত্তবাসী নিরস্ত্র তাপসগণকে দেখিতে পাইত, তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হত করিত এবং হয়তো তাহাদের মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত। যখন ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে রামলক্ষ্মণ তথাতে উপস্থিত হইলেন, তখন রাক্ষসভগ্নী শূর্পণখা নিজজাতীয় নারীদের মধ্যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে করিয়া সুপুরুষ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইতে তাহার কামনা জানাইল। সে ভাবিয়াছিল তাহার রূপে রাম মুগ্ধ হইবে, কেন না সে জানিত তাহার স্বজাতীয় মনুষ্যদের মধ্যে অনেকেই এই বরবর্ণিনী রাজভগ্নীর উপর লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। রামের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়া বিফলমনোরথে সে সীতাকে আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইল। তারপর বিরূপা হইয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য ভ্রাতাদের সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। তাহাদের সমূল বিনাশের পর সে লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে বলিল যেমন করিয়াই হউক সীতাকে হরণ করিতে হইবে, এবং রাবণকে সীতার সৌন্দর্য্যের প্রলোভন দেখাইল। প্রলুব্ধ রাবণ

তখন তাহার পোষা সুদৃশ্য মৃগটীকে লইয়া জনস্থানে গমন করতঃ তাহাকে রামের আশ্রমের নিকট ছাড়িয়া দিয়া, অন্তরালে কদলীবনে অপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত অবসর খুঁজিতেছিল। রাম লক্ষ্মণ মৃগমাংস ভক্ষণ করিতেন এবং মৃগচর্ম্মও সেই আশ্রমে ছিল, সুতরাং কোন বন্যমৃগ প্রাণভয়ে তাহাদিগের আশ্রমের দিকে আসিত না। এই পোষা পালিত মৃগটী তাহা জানিত না। পশুদেরও একটা স্বভাবজ বুদ্ধি (Instinct) আছে যাহাদ্বারা তাহারা শিকারীকে চিনিতে পারে। সেই পালিত মৃগটী রামের সেই মৃগশিকার কার্য্য কখনও দেখে নাই। তাই নির্ভয়ে অদূরে স্থিত তাহার প্রভুকেও নিকটে দেখিতে পাইয়া, মৃগসুলভ চপলতা বশতঃ ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছিল। তখন সীতার ইচ্ছা হইল এই সুন্দর মৃগটীকে জীবিত ধরিয়া পালন করিবেন এবং রামকে তাহাকে জীবিত ধরিতেই অনুরোধ করিলেন। রাম সেই মৃগের নিকটস্থ হইলে, সে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া দ্রুতপলায়নপর হইল। তাহাকে জীবিত ধরিতে হইবে, সুতরাং রামও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এইরূপে সেই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন বহু সময় অতীত হওয়াতে রাবণ বুঝিতে পারিল রামের শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভব নাই, তখন সে রামের গলার স্বর অনুকরণ করিয়া আর্ত্তস্বরে উচ্চ চীৎকার করিল। সে ইতিপূর্ব্বে সীতার সহিত রামের কথোপকথন শুনিয়াছিল। এই স্বর অনুকরণকে (Ventriloquism) বলে। ইহা অভ্যাস দ্বারা হয়। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং রাবণ যে তাহা করিতে পারিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সে সেই কদলীবনের অন্তরাল হইতে রামের স্বর অনুকরণ করিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিল।

সীতার কর্ণে তাহা যেন ঠিক রামের স্বরই বলিয়া বোধ হইল, তাই তিনি লক্ষ্মণকে তাঁহার সাহায্যার্থ যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, সীতা তাঁহাকে বলিলেন "তুমি মনে করিতেছ রাম মরিলে তুমি আমাকে উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে না আমি এখনই গোদাবরীতে প্রাণত্যাগ করিতেছি।" লক্ষ্মণ সীতার সেই বিসদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও তাঁহাকে প্রাণত্যাগে উদ্যত দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া, রামের অন্বেষণে গভীর বনে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাবণ এই শুভমুহূর্ত্ত বিবেচনা করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল। রাবণ একানন সন্ন্যাসীবেশেই সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। এই তপস্বীর বেশ সে সেই দণ্ডকারণ্যের কোন মুনিদের আশ্রম হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, কেননা তাহার উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অথবা চর্ম্মাবৃত অসভ্য বেশ দেখিলে সীতা ভয় পাইতে পারেন। সম্ভবতঃ সে সেই জাতির রাজা হওয়াতে অপেক্ষাকৃত সুদর্শন ছিল। ইহাই রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের ঐতিহাসিক বিবরণ, আর এইরূপ হইলেই রামের ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাবণ রাজার রাজধানী লঙ্কাপুরীর স্বর্ণরৌপ্যময় অট্টালিকারাজি যে আফ্রিকার আদিমজাতিদের তৃণাচ্ছাদিত কুটিরের ন্যায়ই ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কানগরীর দহনে। স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত অট্টালিকানিচয় একটা বানরের লাঙ্গুলস্থিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা বুঝিতে কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এই অট্টালিকাগুলিও আফ্রিকার (Krael)এর ন্যায়ই মৃত্তিকার দেওয়াল ও তৃণাচ্ছাদিত ছিল বলিয়াই শীঘ্র ভস্মীভূত হইয়াছিল। তারপর রাবণের পুষ্পক রথও যে মনুষ্যনির্ম্মিত দ্বিচক্রবাহী

অশ্ব বা খরচালিত যান ছিল তাহার প্রমাণও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখা যাইবে। তবে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে এই আদিমজাতির মধ্যেও তাহাদের জাতিগত সভ্যতার বিকাশ হইতেছিল কেননা তাহারা রথসদৃশ তাৎকালিক খরবাহী যান কোথায় পাইল? তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদিও ছিল তন্মধ্যে শূল ও ধনুর্ব্বাণের উল্লেখ রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যদি রাবণ এই আদিম মনুষ্যজাতীয় কোন বলশালী জাতির নেতা ছিল, তাহা হইলে বাল্মীকি কেন তাহার সম্বন্ধে এইরূপ সমস্ত উদ্‌ভট বর্ণনা করিলেন—তাহার দশটী মাথা ও গলা, বিশটী হাত, সে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যঋষির পুত্র, বিশ্রবা মুনির পুত্র, কুরূপ যক্ষ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ তাহার ভয়ে বিত্রাসিত; স্বর্ণাট্টালিকাশোভিত ইন্দ্রের অমরাপুরী হইতেও শ্রেষ্ঠ লঙ্কাপুরীতে তাহার বাসস্থান; তাহার বিমানগামী পুষ্পকরথ ইত্যাদি। অবশ্য বিষ্ণু অবতার রামের সহিত তাঁহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী করিবার জন্য এইরূপই একটী অদ্ভুত আকার-বিশিষ্ট অদ্ভুতকর্ম্মা প্রাণীর সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, নতুবা রামরূপকায়াধারী বিষ্ণুর অলৌকিক শক্তিত্বের প্রকাশ হয় না। রাবণ যখন স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ত্রিলোকবাসীকেই বিধ্বস্ত ও বিত্রাসিত করিতেছিল, তখন ত্রিবিক্রম বিষ্ণু তাঁহার চতুর্ভুজ-সমন্বিত দেহেই তাহার বিনাশ সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার দ্বিভুজ মনুষ্যরূপে অবতরণের কোন প্রয়োজন ছিল কি? ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর শিব বা রুদ্র সংহার করিয়া সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করেন—এইরূপ পুরাণে বর্ণিত আছে, এবং এইরূপ নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। রাবণ ব্রহ্মার সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হইলেও একটা কিম্ভূত কিমাকার

জীব। যতরূপ প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক সৃষ্টি আছে যেমন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ প্রাণীজগৎ, তাহার মধ্যে এরূপ বর্ণিত জীবের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই রাবণ যখন স্বর্গেও যায়, তখন বিষ্ণু তাহাকে স্বর্গেই বধ করিতে পারিতেন, তাঁহার মনুষ্য হইয়া জন্ম লইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অথবা তিনি যখন ত্রিবিক্রম হওয়াতে তিনলোকেই বিচরণ করেন, তখন যে কোন স্থানেই ইহাকে বধ করিয়া সৃষ্টির শান্তিরক্ষা করিয়া, পালন করিতে পারিতেন। কিন্তু সে ব্রহ্মার নিকট বর লইয়াছে যে মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত দেবতা ও প্রাণীর অবধ্য হইবে, কেননা মনুষ্যকে অল্পবীর্য্য বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। সুতরাং সে মনুষ্যও নহে,—কিন্তু এমন একটী পদার্থ যাহাকে বধ করা মনুষ্যেরই শক্তিসাধ্য, দেবতাগণের নহে। বিষ্ণুও দেবতারূপে তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না জানিয়াই মনুষ্যরূপে জন্ম লইলেন—এই রামরূপে; কেননা ব্রহ্মার অধিকারের উপর তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহাদের তিনজনের উপরও তা'হ'লে আর একজন কর্ত্তা আছেন—যিনি একমাত্র এই তিনজনের বিভিন্ন অধিকারের নিয়ন্তা। তিনি পুরাণের নারায়ণ—বেদের ও উপনিষদের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং আদি বৈদিক ঋষিদের ইন্দ্র। মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুরও এই নারায়ণত্ব বা ব্রহ্মত্ব পদপ্রাপ্তিলাভে ত্রিলোকের সর্ব্বময়কর্ত্তৃত্ব অধিগত না হইলে, এই ত্রিলোক বিজয়ী রাবণকে বধ করাও সম্ভবপর নহে। ব্রহ্ম বা নারায়ণের কোন আকার বা রূপ নাই। তাই শালগ্রামশিলাকে নারায়ণের প্রতীকরূপে উপাসনা করা হয়—যেহেতু শালগ্রামও গোলাকার এবং তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর একই পদার্থে পরিপূর্ণ শিলারূপ, আর ব্রহ্মও, এই দৃশ্যমান গোলাকার ব্রহ্মাণ্ড, ওতপ্রোতভাবে

যেন শিলার ন্যায়ই সর্ব্বগত হইয়া, পূরিয়া আছেন। নিরাকার ব্রহ্ম যেন দশদিক পূর্ণ করিয়া যেন তাঁহার বিংশ হস্ত দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া আছেন। কোন বৃহৎ বস্তু ধারণ করিতে হইলে তাহা দুই হস্ত দ্বারাই করিতে হয়। সুতরাং তিনি ত্রিলোক ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া ত্রিলোকবিজয়ী। পক্ষান্তরে আমরা বাল্মীকির বর্ণনা অনুসারে পাইতেছি রাবণেরও দশমুখ ও বিংশতি হস্ত এবং সেও ত্রিলোকবিজয়ী—

"যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না বীরো ভবিষ্যতি॥"

যাহার রব ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া ভয় উৎপাদন করে সেই রাবণ নামে বীর জন্মিবে। ত্রিলোক দশদিক ব্যাপ্ত তাই দশমুখে শব্দ হইলেই তাহা ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইবে। আর দশদিক জয় করিতে হইলেই বিশটী হাতের প্রয়োজন তাই রাবণের দশ মুখ ও বিংশতি হস্ত। ঋষি এই পদার্থটীর নাম দিয়াছেন রাবণ। ব্রহ্মও ত্রিলোকব্যাপী, এই রাবণও ত্রিলোকব্যাপী। কিন্তু দুই পদার্থ একই স্থানে একই সময়ে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এই রাবণ এমন একটী পদার্থ যাহার আকার নাই অথচ ত্রিলোকব্যাপ্ত। সুতরাং রাবণ কোনও নিরাকার পদার্থের স্বরূপ এবং তাহার কল্পিত মূর্ত্ত প্রতীকই রাবণ। রাবণ শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ হইতেই তাহার স্বরূপ বা প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। রাবঃ পুং (রবণমিতি। রুল ধ্বনৌ+ভাবে ঘঞ) শব্দঃ। রাবণঃ পুং—(রবণস্যাপত্যমিতি। রবণ+"শিবাদিভ্যোঽণ্।" ইতি অণ্। যদ্বা রাবয়তি ভীষয়তি সর্ব্বানিতি। রু+নিচ্+ল্যুঃ।) রবণ শব্দ অর্থে ধ্বনি—রু ধাতু হইতে সাধিত। সেই ধ্বনি বা শব্দের পুত্র রাবণ। যে শব্দে

ত্রিলোক ত্রাসিত হয় সেই রবেরই মূর্ত্তপ্রতীক রাবণ। আমরা ইহার পরে স্থানান্তরে বাল্মীকি কৃত রাবণের জন্মবৃত্তান্ত হইতেও দেখাইব যে রাবণ, শব্দ বা রবেরই প্রতীক।

বেদ ও উপনিষদের মতে ব্রহ্মের প্রথম বিবর্ত্তন হইল হিরণ্যগর্ভরূপে তাই বৈদিক ঋষি বলিলেন "হিরণ্যগর্ভসমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীমুতদ্যাম্।" হিরণ্যগর্ভই সমস্ত ভূতের পতি হইয়া সর্ব্বাগ্রে উদ্ভূত হইলেন। তিনি পৃথিব্যাদি ত্রিলোক ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ত্রিলোক ব্যাপ্ত। আর এই রব বা শব্দেরও প্রথম উৎবর্ত্তন হইল সেই হিরণ্যগর্ভ হইতেই—যেন তাহার কর্ণ হইতে শব্দ তন্মাত্র রূপে পুলস্ত্য বা মহান্ রূপে-ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়া। যেমন হিরণ্যগর্ভের ক্রম বিবর্ত্তনে মনুষ্যের উদ্ভব, তেমনি তাঁহারই শব্দরূপ বিবর্ত্তনে পুলস্ত্য হইতে তাহার পুত্র বিশ্রবা, আবার বিশ্রবা হইতে রাবণ। ব্রহ্মাই এই হিরণ্যগর্ভে মনুষ্যের বীজ ও শব্দেরও বীজ নিহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দুইএর পুনরায় সংহরণ তিনিই করিতে পারেন। হিরণ্যগর্ভ, যেন মনুষ্য ও শব্দ উভয়েরই মধ্যস্থ। তাই ব্রহ্মা রূপে বর্ণিত হিরণ্যগর্ভ মনুষ্যেরও পিতামহ ও রবেরও পিতামহ। সেইজন্য একই পিতামহ হইতে উৎপন্ন রবরূপ রাবণ, তাহার ভ্রাতারূপ মনুষ্য দ্বারা যে কখনও বধ্য হইতে পারে ইহার সম্ভাবনা না করিয়াই তাঁহার নিকট ত্রিলোকের অবধ্য হইবার বর লইবার সময় মনুষ্যের নাম উল্লেখ করে নাই। এই রামায়ণের শেষ ভাগে আমরা দেখাইব কিরূপে এই মনুষ্য ও রবের সংহরণ, ব্রহ্মকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সীতা, পুরুষের জ্যোতি বা আত্মহৃদি জ্যোতি, আর এখন দেখান হইল রাবণ

রবের প্রতীক বা রবই। সুতরাং রব জ্যোতিকে হরণ করিল। অর্থাৎ রব কর্তৃক যেন হৃত হইয়াই জ্যোতি অদৃশ্য হইল। যাঁহারা যোগ সাধনে অভ্যাস করিয়া কিছু কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে ইহার কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। গুরুদেব তিব্বতী বাবার নিকট যোগের উপদেশ প্রাপ্তির সময় তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম সেই অমূল্য বাণী, যাহার অনুসরণে সেই দুর্লভ সত্যের সন্ধান, অভ্যাস দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। তিনি যোগবলে স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিলনা। সেই বাণীটী এই "শব্দরন্তর্গতজ্যোতি জ্যোতিরন্তর্গতঃ মনঃ তন্মনং বিলয় প্রাপ্তে তদ্বিষ্ণোর্পরমং পদং।" অর্থাৎ জ্যোতি শব্দের অন্তর্গত, জ্যোতির অন্তর্গত মন, সেই মন বিলয় প্রাপ্ত হইলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। এই বাক্যটী অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাধনা দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইলেই ইহার সত্যতা প্রমাণ হয়। সুতরাং যে সাধক যোগী ইহার উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার নিকট ইহা ধ্রুব সত্য। যোগী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন সাধনা দ্বারাই সত্য বা ধর্ম্ম উপলব্ধ হয়। আমরা এখন এই সাধন প্রণালীতে যেরূপ যেরূপ স্তর আছে তাহাই পাঠকদিগের অবগতির জন্য বলিব মাত্র। আদর্শগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত সাধক প্রথমে দশানন রাবণের দশগ্রীব হইতে উত্থিত দশমুখে ব্যক্ত অর্থাৎ দশদিক হইতে আগত শব্দ যাহাতে কর্ণে শ্রুত না হয় তজ্জন্য কর্ণরন্ধ্র অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করে। এই দশ দিকই রাবণের দশমুখ। অঙ্গুলি দ্বারা নাসারন্ধ্র বন্ধকরে, যাহাতে ঘ্রাণ না পায়, চক্ষু বন্ধ করে, বাহ্য দৃশ্য হইতে মনকে প্রত্যাকর্ষণ করিবার চেষ্টায়। তৎপূর্ব্বে বাতাপি রূপ বায়ু সমুচ্চয় নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তর পূর্ণ করিয়া

যাহাতে তাহা 'ইল্বল' হইয়া বহির্গত হইতে না পারে,—তাহাকে রুদ্ধ করিতে হয়। এই সময়ে ভ্রূমধ্যে একটী জ্যোতির আবির্ভাব হয় যাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহাও একরূপ বাহ্য জ্যোতিরই প্রতিকৃতি, বদ্ধচক্ষুতে বিভাসিত হয়। বহু অভ্যাসের পর বাহিরের শব্দ কর্ণে শ্রুত না হইলেও আর একটী শব্দ যেন অভ্যন্তর হইতে কর্ণে শ্রুত হয়। এই শব্দের অনেক মাত্রা আছে। কখনও নাদের মত, কখনও মৃদুমধ্যম, কখনও অতিমৃদু কখনও বংশীয় শব্দের ন্যায় শ্রুত হয়। এই নাদকেই রাবণ কহে। এই শব্দ যেন অভ্যন্তর হইতেই উত্থিত হয় বলিয়া বোধ হয়। আমাদের শির হইতে পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেহে যে সমস্ত ধমনি ও শিরা আছে তাহাতে অনুক্ষণ রক্তপ্রবাহ চলাচল করিতেছে। হৃদয় যন্ত্র হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়, তাহাই এই সমস্ত শিরা ও ধমনির অভ্যন্তরস্থ রক্তকে চালিত করিয়া, তাহাতে যেন নদীবক্ষে বাত্যাতাড়িত তরঙ্গের ন্যায় একটা ধারাবাহিক স্রোত উৎপন্ন করে। তরঙ্গায়িত নদীতে যেমন কুল কুল শব্দ বা নাদ উত্থিত হয় তেমনি ধমনি ও শিরার অভ্যন্তরেও সেইরূপ একটী নাদ সমুত্থিত হয়। নদতে ইতি নদী, এই নাদ সেই জলে আছে বলিয়াই তাহার নাম নদী। আমরা বক্ষঃস্থলে হৃদ্‌যন্ত্রের উপর কাণ দিলে সেই আঘাতের শব্দ শুনিতে পাই। আবার কখনও শয়ন অবস্থায় কোন অঙ্গের উপর কান পড়িলে সেই অঙ্গের অভ্যন্তরস্থ শিরার রক্তচলাচলের শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। এই শব্দই কর্ণ-পটহের অভ্যন্তর দিক হইতে ধ্বনিত হইয়া যেন ভিতর হইতেই উত্থিত হইয়া শ্রুত হয়। সুতরাং বাহির হইতে আগত শব্দ রুদ্ধ-কর্ণেশ্রুত না হইলেও এই অন্তস্থল হইতে উত্থিত শব্দের হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই দুরূহ। তাই রাবণ যোগীদের ত্রাসকারী শত্রু এবং দুর্দ্দমনীয়। এই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে বশ করিয়া তাহার রব বা শব্দ বন্ধ করিতে পারিলেই, তবে মেঘমুক্ত সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায়, সীতারূপ জ্যোতি স্বপ্রকাশিত হয়। সাধকের মন যেন কর্ণ ও চক্ষুর দ্বন্দ্বের কারণ হয়। কর্ণ জয় লাভ করিলে সে মনকে বশ করে, তখন মন যেন সেই শব্দই শ্রবণ ও মনন করে ; পক্ষান্তরে চক্ষু জয় লাভ করিলে মন চক্ষুর বশীভূত হইয়া রূপ দর্শন করে। শব্দ শুনিলে চক্ষু দেখেনা, আবার চক্ষু দেখিলে কাণ শোনেনা। কোন দৃষ্ট বিষয়ে মন একাগ্র হইলে তখন কাণে কিছু শোনা যায় না। পক্ষান্তরে সঙ্গীত রসজ্ঞ যখন ভাল সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহাতেই তন্ময় হয় তখন অতি সুন্দরী গায়িকারও মোহিনী মূর্ত্তি তাহার চক্ষুর অদৃশ্য হয়। সুতরাং এই মানস চক্ষু ও মানস কর্ণের সহিত অবিরল দ্বন্দ্ব যোগিদের অভ্যাস কালীন সর্ব্বদাই হয়। তাই এই ভ্রূমধ্যস্থ জ্যোতিতেই প্রথমে মনের একাগ্রতা সাধন করিতে হয়। তারপরে মনকে সেই ভ্রূমধ্যস্থ স্থান হইতে চ্যুত করিয়া হৃদয়-দেশে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেখানে তাহার স্থিতির অভ্যাস হইলে তখন আত্মহৃদিজ্যোতি স্বপ্রকাশিত হয়। এখন এই জ্যোতি মধ্যে মধ্যে আসিতেছে, আবার শব্দও মধ্যে মধ্যে আসায়, তাহা অন্তর্হিত হইতেছে ; এরূপ অবস্থায় যখন মনে অন্য কোন চিন্তার উদয় হয়, তখন তাহাতেই আকর্ষিত হইয়া সে যেন জ্যোতি দেখিতে ভুলিয়া যায়। কেননা মনের স্বভাবই অতি চঞ্চল। তাহার সেই অন্য বিষয়ে চিন্তার সময় শব্দ বা রব তাহার কাণের দ্বারে আঘাত করে, তখন সে সেই চিন্তিত বিষয় বিস্মৃত হইয়া সেই শব্দ বা রবেই আকৃষ্ট হইয়া, তাহাই শুনিতে বা মনন করিতে থাকে। তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সীতারূপ জ্যোতি

অদৃশ্য হয়। যেন রব বা শব্দ কর্ত্তৃকই তাহা অপহৃত হয়। কেননা চোখে দেখা ও কাণে শোনা একই কালীন সম্ভব হয় না। আমরা, চক্ষু ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করিয়া বাহ্যবস্তু দর্শন রহিত করিতে পারি, কিন্তু উন্মুক্ত কর্ণদ্বার দ্বারা শব্দ কর্ণে প্রবেশ, বন্ধ করিতে পারিনা—যতক্ষণ তাহা অঙ্গুলি দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ না করি। চক্ষুর কোন বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও শব্দ শ্রবণ হয় কিন্তু তাহা কোন অজ্ঞাত স্বরূপ শব্দরূপেই থাকে।—যতক্ষণ তাহার মনন না হয়, অর্থাৎ সেই শব্দশ্রুত হইলেও মন যতক্ষণ তাহা গ্রহণ না করে ততক্ষণ সেই শব্দের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। এই অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত শব্দ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, কেননা ইহা দেহাভ্যন্তরস্থ শিরা ধমন্যাদি যতক্ষণ সচল থাকিবে ততক্ষণ সমভাবেই থাকিবে। তাই ইহা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ইত্যাদি সর্ব্বদেহধারীর দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া—অমর। দেহের বিনাশেই ইহার মৃত্যু। সুতরাং দেহের বিনাশরূপ অবস্থা সাধন করিতে পারিলে তবে এই রাবণের হস্তে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অর্থাৎ যোগ সাধনে মনকে দেহ জ্ঞান হইতে চ্যুত করিতে পারিলে এই শব্দরূপ রাবণেরও বিনাশ বা অন্তর্ধান হয়। ইহাই রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ। তাই রাবণ দুর্জ্জয়; দেব দেবতাদেরও অপরাজেয়, আর তাহার রাব যোগিদের ভীষণ ভীতি উৎপাদক সিদ্ধিলাভের প্রধান বিঘ্নকারী শত্রু, এবং সমস্ত যোগবিঘ্নকারী বিরুদ্ধশক্তিরূপ রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান ও রাজাস্থানীয়। যোগীদের সাধনার সময়ে এই রাবণের সহিত যুদ্ধ অবিরতই চলে।

এই রাবণ যে রব বা শব্দেরই প্রতীক তাহা বাল্মীকি পরে উত্তরাকাণ্ডে অগস্ত্য ঋষির মুখে তাহার জন্ম বিবরণে বিশদভাবে

বর্ণন করিয়াছেন। অগস্ত্য ঋষি যে তাৎকালিক যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা তখন সর্ব্ববাদীসম্মত ছিল। শরভঙ্গ ঋষিও সুতীক্ষ্ণ ঋষি তাহা জানিতেন বলিয়াই রামকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। এই অগস্ত্য ঋষিই বাতাপি ইল্বল ভক্ষণ করিয়া যোগ সাধন প্রণালীর উপদেশ দিতেন। তাই সেই সত্যদর্শী ঋষির মুখেই বাল্মীকি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন। অগস্ত্য বলিয়াছেন ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য, মরীচি আদি ঋষিগণ। মরীচি হইতে উত্তরকালে মানবের আদি-পুরুষ মনু জন্মেন। মনু হইতে জন্ম বলিয়া মানব। এই পুলস্ত্য ব্রহ্মার কর্ণ হইতে জাত, "স ব্রহ্মণঃ কর্ণাভ্যাং জাতঃ"। পুল শব্দের অর্থ বিপুল, মহৎ। পুলস্ত্য—বিপুল ভাবে যে থাকে। ব্রহ্মার কর্ণ হইতে জাত হইলে তাহা শব্দেরই প্রতীক্। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে (২১৩।১৬) আছে "শব্দরাগাৎ শ্রোতমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ। রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া"॥ অর্থাৎ প্রাণীর আত্মার শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কাণ, রূপ দেখিবার ইচ্ছায় চক্ষু, গন্ধ আঘ্রাণের ইচ্ছায় নাসিকা উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। তাহা হইলে সমস্ত বিশ্বের একীকৃত বিপুল শব্দের প্রতীক এই পুলস্ত্য। তারপর সেই অবিশেষ অভিন্ন শব্দ যখন বিশেষ বিশেষ শব্দরূপে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবে তখন তাহা বিভিন্নরূপে বিশেষ বিশেষ হইয়া বিশ্রবা অর্থাৎ বিশেষরূপে শ্রবণ হইবে। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাই সেই বিশেষ শব্দের প্রতীক্। সেই বিশ্রবার প্রথমা পত্নী ইড়্‌বিড়ার গর্ভে কুবেরের জন্ম, আর কৈকসা নাম্নী পত্নীর গর্ভে, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম। এই কুবেরের স্বরূপ কি? কুবের=কু কুৎসিতং বেরং শরীরমস্য। কুবেরং=কুৎসিতং

বেরং ক্ষেপণং দানাদিকং গতির্বা যস্য=ধনযক্ষ, উত্তরদিশাং পতিঃ নরবাহন। বায়ুমার্কণ্ডেয় পুরাণে "কুৎসায়াং ক্বিতি শব্দোহয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে। কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নাম্না তেনৈব সোহঙ্কিতঃ। ধনযক্ষ, নরবাহন। কুবের যক্ষ হইল কেন? যক্ষ=যক্ষতে পূজ্যত। ঋগবেদে যক্ষ শব্দের পূজা অর্থে ব্যবহার আছে। ধনযক্ষ অর্থে যে ধনের পূজা করে। যে ধনের পূজা করে তাহার অর্থগৃধ্নুতা বশতঃ শরীরের, আহারের বা বেশভূষার দিকে দৃষ্টি থাকে না জন্য তাহার শরীর কুৎসিৎ দৃষ্ট হয়। তাহার ক্ষেপণও কুৎসিৎ হয়, কেননা সেই ধন, হয় বর্ত্তমান কালে লৌহ সিন্ধুকে আর পুরাকালে মৃত্তিকানিম্নে তাহার গতি করাইয়া, তবে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কুবের শব্দে আর একটী অর্থ এইরূপ=কুম্বতি ইতি। কুব ই কি আচ্ছাদনে। কুব কি স্তৃতৌ কুম্বতি। যাহা আচ্ছাদিত থাকে। এই কুবের উত্তরদিশাধিপতি বা কৈলাস পর্ব্বতের রাজা। উত্তর দেশের পর্ব্বতের মধ্যেই ধনের আকর। যুধিষ্ঠির সেই উত্তর দেশের পর্ব্বত হইতেই রাজসূয় যজ্ঞের ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কুবের নরবাহন। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ অভিলষিত পদার্থ ধন, যাহা সে স্কন্ধে বহন করে। তাই কুবের ধনেরই প্রতীক্। খনি হইতে যখন স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু উত্তোলিত হয় তখন তাহারা মলিন আচ্ছাদন বশতঃ যক্ষের ন্যায়ই দেখিতে কুৎসিৎ। তাহাই মাজিলে ঘষিলে যখন উজ্জ্বল হয় তখন তাহার মূল্য জ্ঞান হয়। এই স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর শব্দ মধুর ও শ্রবণের তৃপ্তিকর। প্রথম খনি হইতে উত্থিত অবস্থাতে তাহা দেখিতে কুৎসিৎ হইলেও, তাহাতে আঘাত করিলে যখন টিং বা টং শব্দ হয় তখনই তাহার আদর হয়। সেই শব্দেই তাহা মূল্যবান্ ধাতু বলিয়া পরিচিত হয়। কুবের

বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণ। বিশ্রবা বিশেষরূপ শব্দের প্রতীক্। ইড়্বিড়াও ইড়্বিড়্ শব্দের প্রতীক, যেমন লোকে বলে কি ইড়্ বিড় বক্‌ছে'। সুতরাং শব্দের ঔরসে শব্দের গর্ভে যাহার উদ্ভব তাহাও শব্দ ভিন্ন আর কি হইতে পারে, তাই কুবেরও শব্দের প্রতীক অর্থাৎ ধাতুরূপ ধনের শব্দের প্রতীক। পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পরে জীব সৃষ্ট হইল। তাই পৃথিবী গর্ভে নিহিত ধাতু, বিশ্রবার প্রথমা স্ত্রী ইড়্বিড়ার গর্ভে প্রথম উৎপন্ন, কুবের রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। রাবণ ইত্যাদি তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী কৈকসার গর্ভে উদ্ভব। কৈ-শব্দে। কৈকসাও শব্দের প্রতীক।

অতঃপর রাবণের পুরী লঙ্কার স্বরূপ দেখা যাউক। লঙ্কাপুরী কেবলই স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত মণিরত্ন খচিত অট্টালিকা শ্রেণীতে শোভিত; কেননা ইহা পূর্ব্বে ধনযক্ষ কুবেরের জন্য বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে রাবণ কুবেরকে তথা হইতে দুরীভূত করিয়া তাহা অধিকার করে। কুবের কৈলাসে বাস করিত, সুতরাং তাহার রত্নের অভাব ছিলনা। কৈলাস অর্থে-কে-জলে-লসতি = সমুদ্র গর্ভজাত রত্নমণি। কৈলাস উত্তর দেশস্থ পর্ব্বত। বর্ত্তমান-কালে উত্তর মেরুর নিকটস্থ আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে প্রভূত স্বর্ণখনির আবিষ্কার হইয়াছে। লঙ্কা দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপস্থ পর্ব্বত শৃঙ্গে নির্ম্মিত পুরী। দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে কত লোক সেই দ্বীপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আর দক্ষিণ সমুদ্র গর্ভ হইতে রাশি রাশি মুক্তাও বর্ত্তমানকালে উত্তোলিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালের লঙ্কাদ্বীপস্থ পুরী যে ঐরূপ বর্ণিত বিভবে মণ্ডিত ছিল, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। এখন দেখিতে হইবে লঙ্কা ভারত

উপকূলের নিকট কোন্ স্থানে সমুদ্র মধ্যে স্থিত ছিল। লঙ্কা শব্দের অর্থ কি? লঙ্কা রমন্তে অস্যাম্। রম+বাহুলকাৎ কঃ। রস্য লত্বম্-ইত্যুজ্জলঃ অর্থাৎ উজ্জ্বল। ব্যাকরণমতে র স্থানে ল হইল, একটা ক এর যোজনা করিয়া রম ধাতু হইতে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। রম ধাতুর অর্থ তৃপ্তি বা আরাম প্রাপ্তি। যেখানে লোকে তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে "সা চ পৃথিব্যা মধ্যভাগে তিষ্ঠতি"। যথা "যল্লঙ্কোজ্জয়িনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদি দেশান্ স্পৃশন্ সূত্রং মেরুগতং বুধৈ নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভুবঃ।" জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে ইহা পৃথিবীর মধ্যরেখা। যে আনুমানিক কল্পিত সূত্র, লঙ্কা হইতে উজ্জয়িনী পুরীর উপর দিয়া কুরুক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া মেরুতে যায়, তাহাই পৃথিবীর মধ্যরেখা। ভারতের মানচিত্রে এইরূপে এই রেখাটী অঙ্কিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই রেখার দক্ষিণ ভাগ যাহা লঙ্কার উপর দিয়া গিয়াছে তাহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভারত উপকূলস্থ গোদাবরী নদীর সঙ্গমস্থানের অদূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে কোনস্থানে পতিত হয়। সুতরাং লঙ্কা এইরূপই কোন স্থানে ছিল। লঙ্কা শব্দের আর একটা ব্যুৎপত্তি এইরূপেও হইতে পারে যথা লীয়তেঽত্রেতি-লী+ড =লং=পৃথিবী বীজং। পৃথিবীর বীজ, বৃক্ষের বীজের ন্যায় পৃথিবীর মধ্যস্থানে বা কেন্দ্রেই থাকে। লঙ্কা=লং+ক। লং শব্দের অর্থ যেখানে লীন হয়, আর কং শব্দের অর্থ (কায়তি শব্দো নিগচ্ছতি যতঃ যস্মিন্) কৈ-শব্দে। অর্থাৎ যেখানে শব্দ লীন হয় ও যেখান হইতে নির্গত হয়। লং পৃথিবীর বীজ বা পার্থিব বিন্দু। সুতরাং গোলাকার পৃথিবীর মধ্যরেখা, তাহার মধ্যস্থ বীজ, বিন্দু বা কেন্দ্রকে ভেদ করিয়াই উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত হইবে। এস্থলে রম ধাতু হইতে টানিয়া বুনিয়া লঙ্কা নিষ্পন্ন না করিয়া যদি লং ও ক হইতে তাহা সাধিত হয় তাহা

হইলে কি আপত্তি হইতে পারে। আর রাবণ অর্থে যদি শব্দই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে শব্দরূপ রাবণ এই লয় করিবার স্থান হইতেই নির্গত হইত এবং তাহাতেই লীন হইত এবং সীতারূপ জ্যোতিকেও তথাতে লীন করিয়াছিল। সীতার উজ্জ্বল জ্যোতিও সেখানে লীন হইয়া মলিন হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেহের মেরুদণ্ডকে একটী ধনুর সহিত তুলনা করিয়াছি। এই মেরুদণ্ডে তিনটী কূট আছে। কূটশব্দের অর্থ কলস, কোটঃ গড়। যাহার অভ্যন্তরে বা যাহাতে কোনও পদার্থ থাকে তাহাই কূট। যেমন কূটস্থ চৈতন্য। চৈতন্য প্রকাশক সংজ্ঞা—তাহার জ্যোতি। এই মেরুদণ্ডেও তিন স্থানে জ্যোতি প্রকাশ হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। "দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে" স্থিত এই ত্রিকূট পর্ব্বতই যেন এই মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যেখানে হৃদয় স্থিত, তাহা কিছু বক্রভাবাপন্ন, সুতরাং উচ্চতা বশতঃ তাহাই তাহার অগ্র বা শিখর। ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরেই লঙ্কাস্থিত। মেরুদণ্ড অস্থি নির্ম্মিত সুতরাং প্রস্তর সদৃশ কঠিন। এই ত্রিকূট সমন্বিত তিনটী কলসের জলের ন্যায়ই সেই তিন জ্যোতি তাহাতে থাকিয়া, কখনও উচ্ছ্বসিত জলের ন্যায় ক্ষণতরে দৃষ্টিগোচর হয় আবার তাহাতেই লীন হয়। হৃদয়স্থ আত্মা হইতেই জ্যোতি বিকশিত হয় আবার তাহাতেই লীন হয়। তাই সীতারূপ জ্যোতি রাবণ কর্ত্তৃকই যেন অপসারিত হইয়া সেই লয়ের স্থান লঙ্কাতেই লীন হয়। রাবণ যখন শব্দ বা রব তখন তাহার উৎপত্তিস্থানও ঐ বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরেই যেখানে হৃদয়েরও স্থান। নিশ্বাস দ্বারা বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু, যাহা তথাতেস্থিত কূটে বা কলসে রুদ্ধ হয়, তাহাই প্রশ্বাসের সময় বহির্গমন কালে, কণ্ঠনালীতে-স্থিত পর্দ্দাদ্বয়ে আঘাত করাতে, রব বা শব্দের উৎপত্তি হয়। স্বর বা

শব্দ যেন দেহের অভ্যন্তর হইতেই উত্থিত হয়। তাই স্বর বা শব্দ বা রব সেই লঙ্কারূপ কূটেই যেন লীন অবস্থাতে থাকে। তাহা হইলে ইহাই বুঝা যায় যে শব্দ ও জ্যোতি উভয়েই বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ কোন স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় তথাতেই লীন হয়। তাই রব বা শব্দরূপী রাবণ জ্যোতিরূপিণী সীতাকে যেন হরণ করিয়াই উভয়ে তাহাদের এক সাধারণ (Common place) লীন হইবার স্থানেই গমন করিল। **এই সীতাকে** উদ্ধার করিতে হইলে শতযোজন রূপ দুর্লঙ্ঘ্য পথই অতিক্রম করিতে হয়। তাহা পৌরুষ বলে, কঠোর যোগ সাধনে ও দীর্ঘকাল অভ্যাসেই সিদ্ধ হয়।

ত্রিকূটপর্ব্বত দেহের মেরুদণ্ড হইলে উদধি কি হইবে। উদধি শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়। উদ (জল)+ধা+কি =উদধি। উদং=জলং হইল কেন? ভাগবতে এইরূপ একটী শ্লোক আছে "জগত্রয়াম্ভোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যো উদরনাভি-নালাৎ" ইত্যাদি। ত্রিজগতের সলিলরূপে অস্ত হইলে, তাহার জলে সংপ্লবমান নারায়ণের উদর নাভিনল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছিল। নারায়ণ নিরাকার। তিনি জলরূপে প্রথমে পরিণত হইলেন—তাই নারে বা জলে অয়ন বা গমন। সেই জলের মধ্যে যেখান হইতে সেই নালটী হইল সেইটী তাঁহার নাভি, আর সেই নাভি উদরেই স্থিত—যেমন সদ্যঃপ্রসূত শিশুর উদরে নাভিনল সংযুক্ত থাকে। গর্ভে শিশু সেই জলেই ডুবিয়া থাকে, তার উদর তখনও খোলা নৌকার মতই জলে পরিপূর্ণ থাকে, তারপর বহু পরে যেন সেই নৌকাটীর দুই ধার একস্থানে আসিয়া জোড়া লাগিলে তাহাই উদরের গহ্বর হয়। সুতরাং উদরও জলে পূর্ণ জন্য প্রকারান্তরে উদধি। সম্ভবতঃ এইজন্যই উদ শব্দের অর্থ জল হইয়াছে। উদং+রাতি-রা+ড। রাতি অর্থে

আহার যেমন বানং—বনজাত ফলং+রাতি খাওয়া=বানর এইরূপ অভিধানে ব্যুৎপত্তি থাকিলে উদর শব্দেরও উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি কেন না হইবে? তাহা হইলে যাহা জল খায়, তাই উদর। উদরে যে জল থাকে তাহার প্রমাণ বমনের সহিত জলই বেশীভাগ উদ্গীরণ হয়। আবার পাতলা মলও জলই—তাহা উদর হইতে আসে। মূত্রও উদরের নিম্নদেশে স্থিত আধার হইতে নিঃসৃত হয়। তাহা হইলে উদধি ও উদর প্রায় একার্থবোধকই হইল। আমাদের দেহের যে স্থান জল ধারণ করে তাহাই উদধি। মুখ দিয়াও বমনে জল নির্গত হয়, লালা নির্গত হয় আবার মলদ্বার ও মূত্রদ্বার দিয়াও জল নির্গত হয়; সুতরাং এই উদররূপ উদধি প্রায় মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর এই উদর, দেহের সম্মুখভাগেই অবস্থিত—তাই দক্ষিণ। আমরা সম্মুখের পদার্থকেই প্রদক্ষিণ করি বা দর্শন করি। তাই আমাদের সম্মুখই আমাদের দক্ষিণ। সুতরাং "দক্ষিণস্য উদধে" অর্থে সম্মুখস্থ উদর বা পেট। এখন উদর বা উদধির তীর তাহা হইলে দেহের মেরুদণ্ড যাহা মুখের পশ্চাৎদিক হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহাই হয়না কি? এবং ইহাদ্বারাই উদররূপ উদধি সীমাবদ্ধ হইল না কি? এতক্ষণে বাল্মীকির রহস্যান্বিত শ্লোকের

"দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ।
তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা॥

অর্থ হইল কি? সম্মুখদিকস্থ উদধি বা সমুদ্ররূপ উদরের তীররূপ যে মেরুদণ্ড আছে তাহার অগ্র বা শিখররূপ উচ্চস্থানে লঙ্কাপুরী।

অতঃপর দেখিতে হইবে রামের কি বিসদৃশ বা অন্যায় কার্য্যের জন্য এই সীতা অদৃশ্যা হইলেন। রাম বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন অনেকটা স্বেচ্ছাতে। সেই সীতারূপ জ্যোতি দর্শনের

সাহায্যে তিনি অনেকটা অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে-ছিলেন এবং বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, এই কার্য্যে তাঁহার সহায়ক হইবে, তাই পিতার অনিচ্ছাকৃত সত্যপালন করিবার জন্য স্বতঃই উন্মুখ হইলেন। যদিও তাহার মনে রাজ্যভোগ লালসার আকাঙ্ক্ষা শিথিল হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে যে সেই কামনা উদিত না হইত তাহা নয়। বন প্রবেশের সময় বিরাধ রাক্ষসরূপে ঐরূপ একটী কামনারূপী বিক্ষেপশক্তি তাঁহার পদস্খলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যখন তিনি বিরাধ কর্ত্তৃক স্কন্ধে নীত হইয়া বনমধ্যে বাহিত হইতেছিলেন, তখন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াই যাইতেছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে কৈকেয়ীর অভিলাষ পুর্ণ করিতেই যেন তিনি বনে আসিয়াছেন, সুতরাং রাক্ষস তাহাদিগকে এইরূপে বহন করিয়া বনমধ্যে লইয়া গেলে বরং তাঁহার ভ্রমণের অনেকটা সাহায্য হইবে ও তজ্জনিত ক্লেশেরও লাঘব হইবে। সীতার কথা তখন তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। তারপর সীতার ক্ষীণ স্মৃতিই যেন তাঁহার (সীতার) করুণ আর্ত্তনাদ রূপে তাঁহার মনে উদয় হইল। তখন আবার তাঁহার আত্মপৌরুষ উদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিরাধবধে সমর্থ করিল, এবং তিনি সেই লুপ্তপ্রায় সীতাজ্যোতিরই যেন উদ্ধার করিলেন। ইহার পর রাম অগস্ত্যাশ্রমে, ঋষির উপদেশ প্রাপ্তির পর সেখানে থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কেন? তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত রাক্ষসবধরূপ প্রতিজ্ঞা পালন, যাহা তাঁহার মনে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল, তাহাই প্রবল হওয়াতে তাঁহার এই সংকল্প ভঙ্গ হইল। কেননা অগস্ত্যাশ্রমে থাকিলে রাক্ষসবধ হইবেনা। তখন তাঁহার এই সংকল্পচ্যুতি ও

বাণপ্রস্থের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অহিংসায় জীববধরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য, তাঁহার বিবেক বুদ্ধিরই বিচার, যেন সীতার মুখেই ব্যক্ত হইল। তাঁহার মনে হইল তিনি তো বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন একরূপ স্বেচ্ছাতেই সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য। বানপ্রস্থীর তো অহিংসাই ধর্ম্ম। তাহাতো মুনিরাই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের তপস্যার হানি হইবে বলিয়াই, শাপ দিয়া এই সকল রাক্ষস বধ করিতে চাহেন না। বাণপ্রস্থের ধর্ম্ম সাধনা ও তপস্যাই মুখ্য। আবার তিনিতো এখন রাজ্য শাসনের জন্যও দায়ী নহেন, কেননা তিনি রাজ্যের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন। ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া বিনা হিংসায় জীব বধ করা তপস্যার পরিপন্থী কার্য্য হয়। সীতার উক্তি এইরূপই ছিল। সীতার বাক্য অবহেলা করা, যেন সীতারূপ জ্যোতিরই উপর ক্রমে আস্থার শিথিলতার নিদর্শন। রাম যদি সেই বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পরিহাসচ্ছলে শূর্পণখার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিতেন না। তাঁহার সেই অল্প পদস্খলনের সুযোগ পাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দশকরণ দূষিত হইল। কিন্তু রাম সেই চতুর্দ্দশকরণের দোষ হইতে নিজকে তৎকালের মত মার্জ্জিত করিয়াই যেন বিশুদ্ধ হইলেন, তাহা যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সেই ঝাড়াতে সেই চতুর্দ্দশসহস্রের মধ্যে একজন কম্পিত হইলনা—সেই অকম্পনই রাবণকে সংবাদ দিল। যতদিন সাধক বিদেহ কৈবল্য বা জীবন্মুক্তি লাভ না করিতে পারে, তত দিন এই দেহ থাকাবশতঃই এই চতুর্দ্দশকরণও সাধকের সহিত বর্ত্তমান থাকিবে। দেহের বিনাশেই এই করণগুলির বিনাশ হইবে। তাই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যতদিন প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত

সাধক দেহ রক্ষা করেন, ততদিন তিনি পূর্ণজীবন্মুক্ত নহেন, অর্দ্ধ-জীবন মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন। যখন সাধক আত্মভূত বা আত্মময় অবস্থায় থাকেন ততক্ষণই তিনি চতুর্দ্দশকরণ হইতেও মুক্ত থাকেন। রাম চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসকালে সেই চতুর্দ্দশকরণ সহ লিপ্তই ছিলেন। যে দিন তিনি আত্মভূত হইলেন, সেই দিনই এই বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়া তিনি এই চতুর্দ্দশকরণের বেষ্টনি হইতে তৎক্ষণস্থায়ী মুক্তিলাভ করিলেন—আর সেইদিনই তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসেরও শেষ হইল। তাই বাল্মীকি তাঁহার বনবাসের কালও এই নির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ সংখ্যা দ্বারাই পরিমাণ করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশবর্ষ বনবাসের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। আর কৈকেয়ীই বা কেন দুই একবর্ষ বেশী কম না বলিয়া এই নির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্যই তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন? সুতরাং বাল্মীকি কর্তৃক এই চতুর্দ্দশবর্ষ নির্দ্দিষ্ট হওয়ার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, আর অনুমান করা যায় উপরিউক্ত মর্ম্মেই তাহা হইয়াছিল। অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ বৎসর যেন সেই চতুর্দ্দশকরণেরই স্থিতির পরিমাপক সংজ্ঞা। এই চতুর্দ্দশকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া যেন তিনি কতকটা আত্মস্থ হইলেন। তখন আসিল আবার সেই ঘোর কামরূপী শত্রু বৃত্তবাহু সমন্বিত মারীচ, যাহাকে তিনি পূর্ব্বে শীতল বা ঠাণ্ডা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—সে যেন নিক্ষিপ্ত হইয়া বৃত্তের ন্যায়ই ঘুরিতে ঘুরিতে শীতল হইয়াছিল। পাপ বা অধর্ম্ম মনে আচরিত হইলেও মন কলুষিত হয় তাহা মানসপাপ, তাহাই একদিন না একদিন মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আচরিত হইয়া স্ফুটিত হয়, তখন তাহা দৈহিক পাপ হয়। মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, আর শারীরিক প্রায়শ্চিত্ত

হয় তাহার তদনুযায়ী দণ্ড প্রাপ্তিতে দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিয়া। দুই অবস্থাতেই মনই তাহা ভোগ করে। বিনা হিংসায় জীবহত্যারূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনের কলুষ রামের মনকে পূর্ব্বেই কলুষিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহা এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। এই শূর্পণখার উপহাসচ্ছলে নিগ্রহরূপ কার্য্যে তাহা যেন একটু প্রদীপ্ত হইল। অনার্য্যানারীর প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ রামের পক্ষে পরিহাস তুল্য হইলেও ইহা সেই নারীর নিকট তাহার মৃত্যুবৎই হইয়াছিল। নারীর বিরূপতা তাহার মৃত্যু তুল্যই। মন বিশুদ্ধ থাকিলেই আত্মহৃদিজ্যোতি তাহাতে প্রতিভাসিত হয়। আর মন যতই মলিন হয় সেই জ্যোতিও ক্রমে ততই ম্লান হইতে হইতে শেষে অদৃশ্য হয়। যেমন দর্পণ যতই পরিষ্কার হয় প্রতিবিম্ব ততই স্ফুটতর হয়, কিন্তু মলিন দর্পণের প্রতিবিম্ব ম্লানই হয়। তাই সীতারূপ জ্যোতিও ক্রমে রামের মানস দর্পণে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। কোন স্থানে ময়লা জমিয়া থাকিলে তাহা যদি পরিষ্কৃত না হয় তাহা হইলে অন্যান্য লোকেও সেই স্থানে ময়লা নিক্ষেপ করে, তেমনি মনের ময়লা যদি পরিষ্কৃত না হইয়া তাহাতে আবদ্ধই থাকে তখন নানাদিক হইতে আরও ময়লা সেই কলুষিত মনকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। বুদ্ধিই এই মনের মল পরিষ্কার করে। তাই যখন রামের কলুষিত মনকে আরও কলুষিত করিবার জন্য কামরূপী মারীচের আবির্ভাব হইল তখন সীতাই রামকে বলিলেন উহাকে ধরিয়া আনিয়া পালন কর। অর্থাৎ যেন সেই আত্মজ্যোতিই রামের পরীক্ষার জন্যই যেন বলিলেন ঐ মনের লোভনীয় পদার্থটী ধর—উদ্দেশ্য রামের মনে ঐ লোভনীয় পদার্থটীর আকর্ষণ কার্য্যকরী হয় কিনা তাহাই দেখিবার জন্য। রামের মন সেই আকর্ষণ জালে জড়িত হইয়া পড়িল। সেই

আকর্ষণ যতই প্রবল হইতে লাগিল, ততই রামের মন সীতারূপ জ্যোতি হইতে দূরে যাইতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধি একবার পূর্ব্বেই রামের মনকে সেই আকর্ষণকারী বৃত্তির স্বরূপ দেখাইয়া দিয়াছিল—যখন লক্ষ্মণরূপ তাঁহার সুমিত্র সেই মৃগের স্বরূপ অর্থাৎ সে যে মারীচরূপী কামনারাশির বৃত্ত তাহাই বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। রাম সেই বুদ্ধির বিবেক বাণী অবহেলা করিয়াই, তাহার জালে পড়িলেন। এস্থানে সেই মারীচরূপী কামনা, সেই সুন্দর মৃগটী দ্বারা প্রলোভিত হইয়া তাহাকে ধরিবার কামনা। তাই মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে জীবিত ধরিতে না পারিয়া তাহাকে যখন বিনা হিংসায় অকারণ বধ করিলেন, তখনই তাঁহার সেই সীতা কথিত ব্যসন বা পাপ হইল। তখন তিনি নিজের যে কতদূর পতন হইল তাহাই উপলব্ধি করিয়া অনুশোচনার উদয় হওয়াতেই 'হা লক্ষ্মণ' 'হা সীতা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে এত সাধনা করিয়া যে সীতা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি হারাইলেন। কিন্তু পৌরুষ বলেই তিনি সীতাকে পাইয়াছিলেন। তাই সীতারূপে, পুরুষই যেন তাঁহার লক্ষণ রূপ পৌরুষ লক্ষ্মণকে, তাঁহার নিকট পাঠাইলেন যেন লক্ষণ বা লক্ষ্মণের সাহায্যেই তিনি সীতারূপে তাঁহাকে (পুরুষকে) প্রাপ্ত হইতে পারেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জটায়ু বধ

অতিশয় আশঙ্কিতচিত্তে রাম যখন মারীচকে বধ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার সীতার জন্য অত্যন্ত চিন্তা হইল। লক্ষ্মণ, কেন সীতাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি রামকে সীতা কিরূপ কঠোর মর্ম্মভেদী অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া, তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতে বাধ্য করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। তখন তাঁহারা দ্রুত আশ্রমাভিমুখে গমন করিয়া তথাতে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া, রাম মনে মনে "আমার এই পত্নী বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী" স্থির করিয়া রোমাঞ্চিত ও ব্যথিত হইলেন,

"এতৎ তদিত্যেব নিবাসভূমৌ প্রহৃষ্টরোমা ব্যথিতো বভূব ॥"

তখন রাম পাগলপ্রায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামকে শোকোন্মত্ত অবস্থায় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "আপনি অনর্থক শোককাতর হইবেন না, আসুন আমরা সমস্ত বনে অন্বেষণ করি"। তখন উভয়ে বনে অন্বেষণ করিয়াও যখন সীতাকে দেখিতে না পাইয়া রাম হতচেতন হইলেন, তখন লক্ষ্মণ রামকে পুনরায় প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন,

উবাচ সৌমিত্রিরদীন সত্ত্বো।
ন্যায়ে স্থিতঃ কালযুতঞ্চ বাক্যম ॥

শোকং বিসৃজ্যাদ্য ধৃতিং ভজস্ব।
সোৎসাহতা চাস্তু বিমার্গণেঽস্যাঃ॥
উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে।
সীদন্তি কর্ম্মস্বতিদুষ্করেষু॥
ইতীব সৌমিত্রী মুগ্রপৌরুষম্।
ব্রুবন্ত মার্ত্তং রঘুবংশসত্তমঃ॥"

তখন অদীন-চিত্ত ন্যায় পথে স্থিত সুমিত্রানন্দন শোকাকুল রামকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন "এক্ষণে আপনি শোক ত্যাগকরতঃ ধৈর্য্যধারণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণে উৎসাহী হউন; কারণ উৎসাহশীল মনুষ্যেরা ইহলোকে অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হয় না।" উগ্রপৌরুষ সৌমিত্রি আর্ত্তজনের সান্ত্বনাদায়ক এইরূপ বাক্য বলিলেও রাম পুনরায় শোকে বিমোহিত হইলেন। রাম শোকাবেগে মৃগদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সীতা কোথায়?" তখন সেই মৃগসকলকে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিয়া ধীমান্ লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সেই ইঙ্গিতই যেন তাহাদের প্রত্যুত্তর মনে করিয়া রামকে বলিলেন, "আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াই যেন মৃগগণ উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিকে যাইয়া আমাদিগের পথ দেখাইতেছে। সুতরাং চলুন আমরা দক্ষিণাভিমুখেই অগ্রসর হই।" সেই দক্ষিণদিক ধরিয়া যাইতে যাইতে তাঁহারা একস্থানে একখানি ভগ্ন রথ ও তাহাতে যোজিত খর (গর্দ্দভ) ও তাহার সারথিকে হত অবস্থায় পতিত দেখিলেন; সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহ ও ভূমিতল রুধিররঞ্জিত দেখিতে পাইলেন। তাহারই নিকটে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রক্তরঞ্জিত পদচিহ্ন ও সীতার অলঙ্কারাদি বিক্ষিপ্ত দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন রাক্ষস সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। সেই, অন্য কোন রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তখন রাম অত্যন্ত

ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া বলিলেন, "যদি দেবতারা এক্ষণেই আমার সীতাকে না দেন, তাহা হইলে আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, নাগ ও পর্ব্বতগণ সহিত সমস্ত জগৎ বিমর্দ্দিত করিব। আমি শর সমূহ দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য, অধিক কি সমস্ত জগৎ সন্তাপিত ও বিনষ্ট করিব।" তখন লক্ষ্মণ রামকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "শুভদর্শী ব্যক্তিগণ ঘোরতর বিপদ্‌পাতেও শোক করেন না; আপনি বুদ্ধিদ্বারা প্রকৃতরূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুন"।

তদ্বিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্ব্বদর্শনাঃ ॥
তত্ত্বতো হি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যাসমনচিন্তয়।
বুদ্ধ্যাযুক্তা মহাপ্রাজ্ঞা বিজানন্তি শুভাশুভে ॥
দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব-মাত্মনশ্চ পরাক্রমম্।
ইক্ষ্বাকুবৃষভাবেক্ষ্য যতস্ব দ্বিষতাং বধে ॥"

আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম স্মরণ করিয়া শত্রুবধের জন্য যত্নবান হউন। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "তাহ'লে আমরা এখন কি করিব?" লক্ষ্মণ কহিলেন গিরি, দুর্গ ও ভীষণ বনসঙ্কুল এই জনস্থান অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য; আপনি আমার সহিত সমাহিত চিত্তে সেই সকল অন্বেষণ করুন।" "তানি যুক্তো ময়া সার্দ্ধং সমন্বেষিতুমর্হসি॥" তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত অগ্রসর হইয়া পর্ব্বতশিখরতুল্য রুধিরাক্ত পক্ষিরাজ জটায়ুকে ভূপতিত দেখিলেন। তাহাকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, গৃধ্ররূপ ধারণ করতঃ বনমধ্যে বিচরণ করে; এই, সীতাকে ভক্ষণ করিয়া মনের সুখে বিশ্রাম করিতেছে—"ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমাস্তে সীতাং যথাসুখম্॥" তখন রাম তাহাকে বধ করিতে ধাবিত হইলেন। তখন জটায়ু কহিল "তোমার ও লক্ষ্মণের অসাক্ষাতে বলবান্ রাবণ

সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি সীতার উদ্ধারের জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। আমি তাহার রথ ভগ্ন করিলে সে ভূতলে পতিত হইল। উহার সারথিও আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। শেষে আমি ক্লান্ত হইলে রাবণ খড়্গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহনন্দিনী সীতাকে লইয়া আকাশপথে গিয়াছে।" "সীতামাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহায়সম্।" তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "আমার পিতার বয়স্য এই বিহগরাজ জটায়ু আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ আহত হইয়া ভূতলে মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়াছে।" তখন জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। পরে "রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা" এইমাত্র বলিয়াই জটায়ু প্রাণত্যাগ করিল। ধর্ম্মাত্মা রাম স্বীয় বন্ধুর ন্যায় জটায়ুকে চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা সীতাকে অন্বেষণকরতঃ পশ্চিমদিক অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেইদিক হইতে দক্ষিণ দিক অভিমুখে গমন করিলেন।

বিষ্ণু অবতার রামের পক্ষে এই জটায়ু সম্বন্ধীয় সমস্ত বর্ণনাই সম্ভব। রাম যখন বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে পাইলেন না এবং রক্ত ও যুদ্ধের চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন সীতা কোন রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছেন তখন তিনি তাঁহার বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াই ধনুর্ব্বাণ হস্তে ত্রিলোক ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নতুবা দশরথাত্মজ মনুষ্য রামের পক্ষে ইহা বাতুলোচিত কার্য্যই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আর তাহা না হইলে জটায়ুও তাঁহার সহিত কথা বলিত না। এই জটায়ু গৃধ্র, দশরথ শম্বর অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া আহত হইলে, তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার বয়স্য হইয়াছিল। তাই রাম, তাহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া

অতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া, তাহার দাহ ও শ্রাদ্ধও করিয়াছিলেন। এখন সেই পিতার বন্ধু তাঁহারও উপকার করিবার জন্য রাবণের কবল হইতে সীতাকে উদ্ধাব করিতে যাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল এবং রামকে বলিল যে বিশ্রবার পুত্র রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমরা অতঃপর মনুষ্য রাম কি প্রকারে এই ঘটনা হইতে সীতার তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই দেখাইব, কেননা জটায়ুর মনুষ্যোচিত ভাষায় কথা বলিবার এবং রামেরও তাহা বোধগম্য হইবার সম্ভব এরূপ অবস্থায় হয় না। রাম যখন শোকে অধীর হইলেন তখন তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। তারপর যখন লক্ষ্মণের প্রবোধ বাক্যে ধীর মস্তিষ্কে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন তখন দেখিতে পাইলেন একটী বৃহৎ শকুনি পক্ষী দ্বিখণ্ডিত পক্ষ হইয়া ভূতলে পতিত আছে, আর সেখানেই রক্তাক্ত ভূমিতে দুইটী মনুষ্যজাতীয় প্রাণীর পদচিহ্নও আছে। সীতার অলঙ্কারাদিরও কিছু কিছু সেখানে পতিত হইয়াছিল। তাই তিনি বুঝিলেন যে কোন বৃহৎকায় মনুষ্যজাতীয় প্রাণী সীতাকে হরণ করিয়াছে। মনুষ্য না হইলে, তরবারি দ্বারা সে পাখীর পক্ষও দ্বিখণ্ড করিতে পারিত না। অন্য প্রাণীর পক্ষে তরবারি ব্যবহার অসম্ভব। এই জটায়ুই বা রাবণকে আক্রমণ করিতে গেল কেন? তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন সীতাকে উদ্ধার করিতে। এখন আমরা চেষ্টা করিব তাহার ঠিক বিপরীতটা দেখাইতে—তাঁহারই বর্ণনা হইতে।

ইহার জটায়ু নাম রাখা হইল কেন? জটায়ু=জটাং যাতি প্রাপ্নোতীতি। যা+কু=জটং সংহতং আয়ুর্যস্য। যাহার আয়ু জটার ন্যায় দৃঢ়। কেশগুচ্ছ জটাকারে পরিণত হইলে শীঘ্র পলিত হয় না,

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই গৃধ্র নিজমুখেই বলিয়াছিল তাহার বয়স ষষ্টি সহস্র বৎসর অর্থাৎ ৬০ বৎসর। গৃধ্র পক্ষীরাও এইরূপ দীর্ঘজীবি হয়। এখানে জটায়ু শব্দের অর্থ অতি বৃদ্ধ। তাই সে বৃক্ষ কোটরেই বাস করিত। গৃধ্র = গৃধ + ক্রন্—গৃধ্যতি অভিকাঙ্ক্ষতি = গৃধিনী, শকুনি, দূরদর্শনঃ। শকুনি পক্ষী মাংসাশী ও দূরদর্শনক্ষম, তাহাদের আকারও অতি বৃহৎ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman) কাগজে একটী ফটোগ্রাফের ছবি বাহির হইয়াছিল। চক্রাতা সেনানিবাসের একটী গোরা সৈনিকপুরুষ পাহাড় হইতে একটী বৃহৎ শকুনি ধৃত করিয়া তাহাকে তাহার পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখায়, সেই শকুনির মস্তক সেই ৬ ফিট দীর্ঘ সৈনিকের মাথার উপরে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত অবস্থায় এবং তাহার দুইটী বৃহৎ পক্ষ দুই পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভূমি স্পর্শ করতঃ, তাহাদের উভয়ের আকারের তারতম্য প্রদর্শন করাইয়াছিল। অনেকে কৌশাম্বীর রাজা উদায়নের গল্পও পড়িয়াছেন—কিরূপে তাঁহার গর্ভাবস্থায় শায়িতা মাতা, এইরূপ একটী বৃহৎ পক্ষী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পর্ব্বতশিখরে নীতা হইয়াছিলেন, এবং ভাগ্যক্রমে সেই শৈলবাসী কতকগুলি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচরা হওয়াতে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। সেই শৈলাবাসে উদায়ন জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া, পরে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপের আল্পস্ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোন কোন ভূখণ্ডে এইরূপ বৃহৎ পক্ষী মনুষ্য পশ্বাদি ধৃত করিয়া আহারার্থ পর্ব্বতশিখরে লইয়া যায়—এরূপ গল্প আছে।

এই জটায়ু যদি এইরূপই বৃহদাকার মাংসাশী শকুনি জাতীয় পক্ষী হয়, তাহা হইলে রাবণের সহিত তাহার যুদ্ধের তাৎপর্য্য কি? রাবণ একখানি খর বা গর্দ্দভবাহী ক্ষুদ্র দ্বিচক্র রথে একটী

মনুষ্য ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ, বৃহৎ-দন্ত সমন্বিত, ব্যাদিত আনন, মনুষ্যাকার প্রাণীর ক্রোড়ে ক্ষুদ্রাবয়বা সীতা, মুক্তির জন্য হস্তপদ সঞ্চালনে ও করুণ চীৎকারে, তাঁহার মুক্তির প্রয়াসই দেখাইতেছিলেন। গৃধ্র তাহার স্বভাবজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে করিয়াছিল সেই কদাকার বৃহৎ প্রাণীটী ঐ ক্ষুদ্রাকার লোভনীয় কোমলদেহ প্রাণীটীকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া, তাহার আহারের জন্যই লইয়া যাইতেছে। তখন তাহারও লোভ হইল সেই প্রাণীটীকে তাহার আহার্য্যার্থ সংগ্রহ করিবার জন্য। তাই সে রাবণের অনাবৃত রথের উপর উড়িয়া ছোঁ মারিবার অবসর খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। রাবণ তাহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যখন সে তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চু ও নখপ্রহারে রাবণের রথের সারথী ও খরকে হত্যা করিল, তখন রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তারপর তাহার শিরোপরি উড্ডীয়মান সেই শকুনির পক্ষছেদন করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিয়া পদব্রজেই সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সে শূন্যে চলিয়া যাইলে অনেকদূর পর্য্যন্ত ভূমিতে তাহার রক্তাক্ত পদচিহ্ন রাম দেখিতে পাইতেন না। শকুনি যে সীতাকেই ধৃত করিতে গিয়াছিল ইহা কষ্টকল্পিত নহে। ইহার আভাস বাল্মীকি অন্যত্র দিয়াছেন। যখন রাবণ সীতাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন ৫১ সর্গের ৪২ শ্লোকে বলিয়াছেন,

"তস্যব্যাধচ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ।
পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়্গমুদ্ধৃত্য সোঽচ্ছিন্নং॥"

রামস্যার্থে=রামের অর্থে। অর্থ=যাচনে=বিষয়ঃ, যাচ্ঞা, ধনং, কারণং, বস্তু, প্রয়োজনং। রামের যাচ্ঞা, বস্তু, ধন, বিষয় তো সেই সীতাই। রামের অর্থ—রামের সীতা। আর সেই ধনের

প্রতি ব্যাবচ্ছমান গৃধ্র। ব্যাধ, যেমন বধের ইচ্ছায় তাহার শিকারের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি এই গৃধ্রও সীতাকে তাহার শিকার (Prey) রূপে ধরিতে ইচ্ছমান হইয়া, তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ব্যাধঃ = বিধ্যতি মৃগাদীন্, ব্যধ + ণঃ। বিধ্যতি = কিছু বিদ্ধ করা। বিদ্ধ করিতে যে ইচ্ছুক সেই ব্যাধচ্ছমান। রামের বিষয় বা ধনরূপ সীতাকে বিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক যে গৃধ্র, তাহার পক্ষছেদন করিয়া রাবণ তাহাকে বধ করিল। ইহার আরও প্রমাণ অন্যত্র আছে,—যাহা বাল্মীকি সম্পাতির মুখে বর্ণন করিয়াছেন। সম্পাতি জটায়ুর অগ্রজ। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে দগ্ধপক্ষ বৃদ্ধ সম্পাতি নিজ আহার সংগ্রহে অসমর্থবশাৎ, তাহার পুত্র সুপার্শ্ব তাহার জন্য আহার সংগ্রহার্থ সমুদ্রতীরে বৃহৎ পক্ষ বিস্তার করিয়া শূন্যে অপেক্ষা করিবার সময়, সে রাবণক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়া সেই সীতাকে তাহার পিতার ভক্ষণার্থ ধৃত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাবণ শাম দাম দ্বারা নিরস্ত করিলে সে সীতাকে গ্রহণ না করিয়া, রিক্তহস্তে সন্ধ্যাকালে তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার পিতা তাহাকে ভৎর্সনা করে। তখন সে তাহার পিতাকে বলে যে তখন দেবতারা তাহাকে বলিয়াছিল "তুমি যে সীতাকে বধ কর নাই, তজ্জন্য তোমার বহু পুণ্য সঞ্চয় হইবে।" এখানে বাল্মীকি শকুনির স্বভাবজ প্রবৃত্তির সত্যরূপ প্রকাশ করিলেন। সুতরাং জটায়ু যে সীতাকে নিজ আহারার্থই ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ইহাই প্রমাণিত হয়। এতদিন সে সীতাকে ধরিবার সুবিধা পায় নাই, কেননা তিনি কুটিরাভ্যন্তরে থাকিতেন এবং সর্ব্বদা দুই ভ্রাতা দ্বারা রক্ষিতা হইতেন। এই সকল মাংসাশী প্রাণী অন্য কোন প্রাণীকে ধরিতে হইলে শূন্য হইতে বেগে আপতিত হইয়া তাহার মধ্যদেশে চঞ্চু ও

পদনখ দ্বারা গ্রহণ করে। মনুষ্যজাতীয় প্রাণীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ধরিতে সক্ষম হয় না। তাই যখন রাবণক্রোড়ে সীতা ধৃতা হইয়া রথোপরি ছিলেন, তখন তাঁহার করুণরোদনে সে আকৃষ্ট হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া বুঝিতে পারিল, যে রাবণও তাঁহাকে তাহার আহারের জন্যই ধৃত করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় শকুনিরা মৃত্যুকালীন রোদন শুনিয়া অনেকসময় শবের প্রতীক্ষায় শূন্যে আবির্ভূত হয়। রাবণকর্তৃক ধৃতা সীতা অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ক্লান্ত হইয়া অনেকটা নির্জীবও হইয়াছিলেন। সুতরাং সে তাহার স্বভাবজ তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শনে সীতাকে পাইবার এই উত্তম সুযোগ মনে করিয়াছিল।

অত্যন্ত শোকাবেগে রাম পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রবুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার সুবুদ্ধির উদয় হইলে পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার দ্বারা এখন বুঝিতে পারিলেন যে সীতা কোন বন্যজন্তু বা মাংসাশী রাক্ষসের দ্বারা ভক্ষিত হন্ নাই। সেই বিভিন্নাকারের পদচিহ্নদ্বয় দেখিয়া অনুমান করিলেন একটী বৃহদাকার মনুষ্য যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন এই শকুনিও তাঁহাকে শিকাররূপে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া, সেও আততায়ীর হস্তধৃত খড়্গদ্বারা দ্বিখণ্ডিত পক্ষ হইয়া মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে, আর সে ব্যক্তি রথাভাবে পদব্রজেই সীতাকে লইয়া গমন করিয়াছে। তখন তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া সীতা অন্বেষণে, সেই পদচিহ্ন অনুসরণে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এই জটায়ুকে রাম তাঁহার পিতৃবয়স্য বলিলেন কেন? অন্যত্র বর্ণিত আছে, দণ্ডকারণ্যে যখন রাজা দশরথ শম্বর অসুর বধার্থ উদ্যোগী হইয়া ইন্দ্রের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি আহত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন এবং জটায়ু গৃধ্রই তাঁহার প্রাণরক্ষার

সহায় হইয়াছিল। এই শম্বর অস্থর, একবার ইন্দ্রবধ করিয়াছিলেন, আবার কৃষ্ণও বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা কাল্পনিক। শম্বর শব্দ ঋগ্‌বেদে আছে। যথা "অরন্ধয়ো তিথি গ্বায়শম্বরম্।" ইহার অর্থ আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তবে পুরাণদ্বারা প্রভাবান্বিত সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন শম্বরং এতন্নামানমস্থরম্। যদি ইহা শম্বর বা শবর জাতি হয়, তাহা হইলে বৈদিকযুগে একবার তাহাদিগকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন আবার তাহার ৩।৪ সহস্র বৎসর পরে কৃষ্ণও সেই জাতীয় লোক বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিকযুগে, যে ইন্দ্র বৈদিক ঋষির স্তুতিদ্বারা আরাধ্য ছিলেন তিনিই কি আবার ত্রেতায় দশরথের সময় শম্বর বধ করিয়াছিলেন? সুতরাং শম্বর অস্থরই যুগে যুগে পুনঃপুনঃ বধ হইতেছে ইহাই প্রমাণ হয়। শম্বর শব্দের অর্থ শম্বরং=সলিলং, মেঘঃ যথা ঋগবেদে "অদর্দ্দর্মন্ন্যুনাশম্বরাণি।" "শম্বরাণি মেঘ নামৈতৎ মেঘান্ ব্যদর্দ্দঃ বর্ষণার্থং বিদারিতবান্" (সায়নভাষ্য)। বেদে সায়নভাষ্যে দুই স্থানে দুই অর্থে সায়নাচার্য্য ভাষ্যে বলিয়াছেন। শম্বর অর্থে মেঘ হইলে— ইন্দ্রের বজ্রপাতে মেঘ বিদীর্ণ হয়। তাই ইন্দ্র শম্বরাস্থর বধ করিয়াছিলেন—পুরাণের রূপকে। আবার শম্বরঃ=মৃগবিশেষঃ। অনেকে বৃহৎ শৃঙ্গধারী বৃহদাকার হরিণ শিকার করিতে যাইয়া তাহার শৃঙ্গাঘাতে আহত হইয়াছে এরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। দণ্ডকারণ্যে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সহিত শম্বর মৃগ বধ করিতে যাইয়া আহত হইয়া অচেতন হইয়াছিলেন। মৃগ অনুসরণে তিনি অনুচরগণকে বহু পশ্চাৎ ফেলিয়া একাকীই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যখন অস্থরের অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, তখন তিনি সম্ভবতঃ মৃগশৃঙ্গে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে একাকী

বনমধ্যে মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কোন শকুনি তাঁহাকে তাহার চঞ্চুদ্বারা বিদ্ধ করে। তখন সংজ্ঞালুপ্ত রাজার চেতনা ফিরিয়া আসাতে তিনি চীৎকার করেন, এবং সেই চীৎকার শ্রবণে তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে অন্ধকারে দেখিতে পায়। এই শকুনিই যেন রাজার জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিল তাই শকুনিজাতীয় পক্ষী রাজা দশরথের বন্ধু। মহিষী কৈকেয়ী রাজাকে সেই সময় শুশ্রূষা করেন। তিনি অনুচরদিগের নিকট এই শকুনিঘটিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, এবং রাম, বনবাসের পূর্ব্বে যখন পিতার সত্যরক্ষার কথা কৈকেয়ীর নিকট, শুনিয়াছিলেন তখন তিনি (কৈকেয়ী) রামকে ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তাই রাম এই দণ্ডকারণ্যেস্থিত বৃদ্ধ শকুনিই, যেন সেই দীর্ঘকাল পূর্ব্বে পিতার উপকার করিয়াছিল ইহাই মনে করিয়া, তাহাকে পিতৃবয়স্য মনে করিয়াছিলেন। শকুনি জাতি ষাট বৎসরেরও বেশী বাঁচে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। এখন এই জটায়ু যেন তাঁহারও বন্ধু হইল, কেননা সে যদি রাবণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া হত না হইত, এবং রাবণ নির্ব্বাধায় সীতাকে লইয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার এই রথাদির চিহ্ন ও পদচিহ্নও রাম দেখিতে না পাইয়া সীতা যে কোন বন্যজন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছেন ইহাই স্থির করিতেন।

শম্বর বধ করিবার জন্য ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার রাজা দশরথের কি প্রয়োজন ছিল? এই জটায়ুর ভ্রাতা অন্যত্র অঙ্গদকে বলিয়াছে, "আমি (সম্পাতি) ও জটায়ু পূর্ব্বকালে বৃত্র বধ করিতে উদ্যত ইন্দ্রকে জয় করিবার জন্য স্বর্গাভিমুখে যাই, তখন ইন্দ্রের বজ্রে আমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ হয়।" (এ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও বলিব)। এই উপাখ্যান হইতে ইহাই বোধ হয় যে রাজা দশরথ দণ্ডকারণ্যে মৃগয়ার্থ

গমন করিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অবিরল বারিধারা বর্ষণ হইতেছিল। তখন অনুচরবিহীন রাজা কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময় মেঘকে যেন বিদীর্ণ করিয়াই বজ্র সেই বৃক্ষের উপর পতিত হয়। সেই বৃক্ষের উপর দুইটী শকুনি পক্ষবিস্তৃত করিয়া ছিল এবং রাজার মস্তকও কতকটা সেই পক্ষীদ্বয়ের পক্ষদ্বারা বারিধারা হইতে রক্ষিত হইতেছিল। এমন সময় সেই বৃক্ষের উপর বজ্র পতিত হইল। সেই বজ্র সেই পক্ষীর পক্ষই দগ্ধ করায় রাজা রক্ষা পাইলেন। স্তম্ভিত রাজা বজ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও অচেতন হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন। ইত্যবসরে অনুচরেরা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিতে পাইল। উপরের দিকে চাহিয়া তাহারা দেখিল পক্ষীর পক্ষ দগ্ধ করিয়াই বজ্র অন্তর্হিত হইয়াছে সেই জন্যই রাজা বাঁচিয়া গিয়াছেন। তুলা এবং পক্ষীর পক্ষপালক একই জাতীয়। বিদ্যুৎ তাহার ভিতর দিয়া সঞ্চালন হয় না। এই পক্ষীদ্বয়ের পক্ষই রাজাকে রক্ষা করাতে তাহারা রাজা দশরথের বন্ধু। ইহাই ইন্দ্র কর্তৃক শম্বর বধের তাৎপর্য্য। এই জটায়ু বধের রহস্যান্বিত তাৎপর্য্য আমরা যথাস্থানে দেখাইব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কবন্ধ রাক্ষস বধ

অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে, পশ্চিম দিক অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে গমনকরতঃ এক ভীষণ জনসমাগমশূন্য বন অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণ দিকে যাইয়া জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে ক্রৌঞ্চবনে প্রবেশ করিলেন। পরে সেই অরণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে যাইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমের নিকট এক পর্ব্বত ও তন্মধ্যে পাতালবৎ গভীর চিরঅন্ধকারময় গহ্বর দেখিতে পাইলেন। সেই গুহার নিকট অয়োমুখী নাম্নী এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। সে লক্ষ্মণকে তাহার সহিত বিহার করিতে যাচঞা করিলে লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। সে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে এক বিকট শব্দ শুনিতে পাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিজন প্রদেশ বায়ুদ্বারা বিচলিত হইয়া উঠিল ও সমস্ত বন প্রতিধ্বনিত করিয়া একটী শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা সেই শব্দের উৎপত্তিস্থান নির্ণয়ার্থে অগ্রসর হইয়া এক বিপুলবক্ষা, বৃহৎকায় রাক্ষসের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই রাক্ষস কবন্ধ, সুতীক্ষ্ণাগ্র রোমসমূহে আচ্ছাদিত, নীল মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, বৃদ্ধ, মেঘের ন্যায় শব্দকারী; তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই কেবল উদরে একটী মুখ আছে; সেই মুখে একটী মাত্র চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় জলিতেছে; সে সেই চক্ষুর সাহায্যে দূরবর্ত্তী পদার্থ সম্যকরূপে

দেখিতে পায়। সে স্বীয় যোজনবিস্তৃত হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া বন্যজন্তু মৃগ প্রভৃতি ও পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্তদ্বারা সেই সকল প্রাণীদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল। তাঁহারা এক ক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই মহাবল কবন্ধ, বাহু দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়ন করিয়া একবারে ধরিল। তাঁহারা সেই রাক্ষস কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অবসন্ন হইলেন। তখন কবন্ধ তাহার বাহুপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণকে বলিল, "তোরা দৈবক্রমে প্রমত্ত হইয়া আমার আহাররূপে উপস্থিত হইয়াছিস্।" লক্ষ্মণ তাহার কথা শুনিয়া বিক্রম প্রকাশে কৃত-সংকল্প হইয়া রামকে তৎকালোচিত হিতকর বাক্য বলিলেন, "এই রাক্ষসাধম আমাদের উভয়কেই ভক্ষণ করিবে। আসুন, আমরা ইতিমধ্যে অসির আঘাতে উহার প্রকাণ্ড হস্তদ্বয় ছেদন করি। নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় প্রাণ-ত্যাগ করা অতীব গর্হিত। তখন তাঁহারা উভয়ে তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন। তখন সেই কবন্ধ কহিল. "পূর্ব্বে আমার মহাপরাক্রম সম্পন্ন ত্রিভুবনবিখ্যাত কমনীয় রূপ ছিল। আমি স্থূলশিরা নামক মহর্ষিকে ভয় দেখাইলে তাঁহার শাপে আমার এইরূপ হইয়াছে। পরে আমি ব্রহ্মার নিকট বর লইয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইলাম। আমি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে গেলাম। তখন ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষেপে আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন হইল ও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবেশিত হইল। তখন আমি ইন্দ্রকে বলিলাম, 'আমি কিরূপে অনাহারে সুদীর্ঘকাল বাঁচিব? তখন ইন্দ্র আমার এই যোজন বিস্তৃত হস্তদ্বয় ও কুক্ষিমধ্যে এই ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত মুখ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তৎকালে ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ যখন তোমার হস্ত ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গে যাইবে। আপনারা আমাকে অগ্নিতে সংকার করুন,

আমি আপনাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে সাহায্য করিব; এবং এক্ষণে আপনাদের যাহার সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য তাহা বলিব।"

রাম বলিলেন, "আমরা জনস্থানে বাসকালে রাবণ আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা সেই রাক্ষসদের নাম জানি; তাহার রূপ, বাসস্থান বা পরাক্রম কিছুই জানি না। আমরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সুকল্পিত গর্ত্তমধ্যে তোমাকে দাহ করিব, তুমি আমাদের উপকার করিয়া সেই অপহারীর প্রকৃত রূপ ইত্যাদি যদি বলিতে পার।" তখন সেই রাক্ষস বলিল "আমি এখন কিছুই বলিতে সক্ষম নহি, কেননা আমার দিব্যজ্ঞান নাই, আপনারা আমাকে দাহ করিলে যখন আমি নিজের সেই দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইব, তখন সেই রাক্ষসের বিষয় যিনি জানেন এবং আপনাকে সীতার সংবাদ বলিতে পারিবেন তাঁহার বিষয় আপনাকে বলিতে সক্ষম হইব। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তাচলে না যান, তন্মধ্যেই আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিয়া দাহ করুন, তখন যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত হইবেন তাহার নাম আপনাকে বলিব। সদাচারীর সহিত আপনাকে মিত্রতা করিতে হইবে, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন।" পরে তাঁহারা এক পর্ব্বত গুহার মধ্যে অগ্নি সংযোগ করিলেন। সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সংযোগে মেদ পরিপূর্ণ কবন্ধের শরীর অল্পে অল্পে দগ্ধ হইতে লাগিল। পরে মহাবল কবন্ধ শীঘ্র চিতা কম্পিত করিয়া নির্ম্মল বসন পরিধান পূর্ব্বক প্রভাশালী হইয়া সেই চিতা হইতে উত্থিত হইল। তখন উত্থিত সেই দিব্যদেহ রামকে বলিল, "আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, বিশুদ্ধাত্মা বীর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাহার ভ্রাতা ইন্দ্র-নন্দন ক্রুদ্ধ বালী কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া, চারিটী বানরের সহিত পম্পা সরোবরের অন্তভাগে বিরাজিত ঋষ্যমূক নামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে বাস করিতেছে। তাহার

সহিত মিত্রতা করা ব্যতীত আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না।

"তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যঃ স সুহৃৎ সুহৃদাংবর।
অকৃত্বা ন হিতে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিন্তয়ন্॥
শ্রূয়তাং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
ভ্রাতা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা॥
ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পা পর্য্যন্ত শোভিতে।
নিবসত্যাত্মবান্‌বীর চতুর্ভিঃসহ বানরৈঃ॥
বানরেন্দ্রো মহাবীর্য্যস্তেজস্বী চামিত প্রভঃ।
দক্ষঃ প্রগল্‌ভো দ্যুতিমান্ মহাবলঃ পরাক্রমঃ॥
···স তে সহায়ো মিত্রঞ্চ সীতায়া পরিমার্গণে।
ভবিষ্যতি হিতে রাম মা চ শোকে মনঃ কৃথা॥"

রাম! আপনি এই পথ দিয়া সহজে পম্পা নাম পুষ্করিণীর পশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তী ঐ প্রদেশে যাইতে পারিবেন।

"ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ॥
অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্।
রাম সঞ্জাত বালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্॥"

সেই পম্পা কঙ্করশূন্যা, সমতীর্থা, পতনসম্ভাবনারহিতা, বালুকাপরিবৃতা এবং শৈবালশূন্যা ও কমল ও নীল পদ্মসমূহে শোভিতা। সেই পম্পাতীরে অনেক স্থূলকায় বনচারী বানরকে বারিপান করিতে আসিতে দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিশাল দূরারোহনীয় ঋষ্যমুক পর্ব্বত সেই পম্পার তীরে অবস্থিত। ধার্ম্মিক পুরুষ সেই পর্ব্বত শিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধন লাভ করেন, জাগরিত হইয়া নিশ্চয় সেই ধন পাইয়া থাকেন। পাপকর্ম্মা পুরুষ

তথায় আরোহণ করিয়া নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া থাকে। সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপরিভাগে এক সুবৃহৎ প্রস্তরে আবৃত গুহা আছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা অতীব কষ্টসাধ্য। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব, বানরদিগের সহিত সেই গুহায় বাস করেন। কখন কখন পর্ব্বতের শিখর দেশেও থাকেন।” কবন্ধ তাহার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রামকে পথ প্রদর্শন করতঃ বলিল, “সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করুন।” তৎপরে সে অন্তর্হিত হইলে, তাঁহারাও সেই প্রদর্শিত পথে পম্পা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এই উপাখ্যানে ঐতিহাসিক সত্যের কিরূপে মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। কবন্ধ রাক্ষস, তাহার শির নাই এবং জানুদ্বয় ভঙ্গ বশতঃ চলচ্ছক্তিহীন অচল। কবন্ধ শব্দের অর্থ কংমুখং বধ্যতে রুধ্যতেঽস্মাৎ। রক্ষ বিশেষ—যাহার মুখ নাই। সুতরাং সে রামের সহিত বাক্যালাপ করিল কিরূপে? কবন্ধের আকার, তাহার কার্য্য, স্থিতিস্থান, সর্ব্বোপরি তাহার ঐরূপ দেহ প্রাপ্তির বিবরণ যাহা নিজেই বলিয়াছিল, তাহার যথাযথ সামঞ্জস্য করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহা একটী প্রাকৃতিক ঘটনা (physical phenomena)। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরাও যে অনেকে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য্যকারণ জানিতেন, তাহারই প্রমাণ এই কবন্ধ রাক্ষস। ইহা কিরূপ ঘটনা? রাম ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে যাইতে যাইতে দূরে এক পর্ব্বত ও তন্মধ্যে গভীর অন্ধকারময় গহ্বর দেখিলেন। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া এক বিকটশব্দ শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রদেশ প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা বিচলিত হইল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়া কবন্ধের সম্মুখীন হইলেন। এই কবন্ধ একটী পর্ব্বতস্থ গুহার সম্মুখভাগ ও উপরিভাগের আবরণ। পাঠক! একটা রেলরাস্তার পার্ব্বতীয়

সুরঙ্গের (tunnel যেমন জামালপুরের নিকট আছে) কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই মনে মনে অঙ্কিত করুন। দুই পার্শ্বস্থ পাহাড় সমতল ভূমি হইতে ক্রমোচ্চে উত্থিত হইয়া সেই সুরঙ্গের উপরস্থ পাহাড়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহারা যেন সেই সুরঙ্গের দুই বাহুর ন্যায় আর সেই পর্ব্বত তাহার দেহ। সুরঙ্গটী যেন তাহার বক্ষস্থ মুখ। রাম যে পর্ব্বতস্থ গুহা দেখিয়াছিলেন তাহা পাতালবৎ অর্থাৎ সেই ভূমির নিম্নস্থানে। এই সুরঙ্গ যে পর্ব্বতের অভ্যন্তর দিয়া গিয়াছে সেই পর্ব্বতের মধ্যভাগ, যাহা দুই পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে খোদিত হইয়াছে তাহাই সীমাবদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত প্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া, বোধহয় ইহা যেন সেই পর্ব্বতের দেহ, আর ইহাই কবন্ধের আকার। আর এই সুরঙ্গের ভিতর যখন গাড়ী যাইয়া অদৃশ্য হয় তখন যেন বোধহয় তাহা যেন ইহা কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়াছে। রাক্ষসও গ্রাস করে তাই উভয়ের সৌসাদৃশ্য। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে কবন্ধ শিরচ্যুত হইয়াছিল এবং তাহার জানুভগ্ন হওয়াতে সে অচল হইয়াছিল। কোনও সময়ে এই গুহার উপরিস্থ আবরণে বজ্রপাত হয়, তাহাতেই বিদীর্ণ বা ভিন্ন হইয়া যে গর্ত্ত বা সুরঙ্গ সেই পর্ব্বতের গায়ে হয় তাহাই তাহার মুখ। বজ্রপাত হইলে শক্ত মাটি যেমন চারিদিকে ফাটিয়া যায় . তেমনি এই গুহার গাত্রস্থ অপেক্ষাকৃত পাতলা প্রস্তর দেওয়াল ফাটিয়া যাওয়াতে চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের অগ্রভাগ সেই সুরঙ্গের মধ্যভাগের দিকেই বিস্তীর্ণ থাকাতে, সেগুলি কবন্ধের দাঁতের মতই বোধ হইতেছিল। তাহার গাত্রে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ গুল্মাদি জন্মিয়াছিল তাহাই তাহার দীর্ঘ রোমরাশির ন্যায় দেখাইতেছিল। বজ্রাগ্নি এই সুরঙ্গদ্বারা গুহাভেদ করিয়া, সেই গুহার নীচস্থ দাহ্য ও জ্বলনশীল (Inflammable) ধাতু বা উপাদানের খনিতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাতেই অগ্নিসংযোগে

যে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল, তাহাই সেই স্বরঙ্গ দ্বারাই বহির্দ্দেশ হইতে দৃষ্ট হইতেছিল। এই অগ্নিশিখাই কবন্ধের মুখাভ্যন্তরস্থ একটীমাত্র দীপ্তচক্ষু।

পাঠক! কখনও ধুলারাশিব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘুর্ণীবায়ুর আবির্ভাব দেখিয়াছেন কি? তাহা হইলে তাহা একবার স্মরণ পথে আনিয়া পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত তুলনা করুন। এই প্রান্তরের কোন স্থানে যখন প্রখর রৌদ্রতাপে ভূমিস্থল অতিশয় তপ্ত হইয়া সেখানকার বায়ুকে অত্যন্ত উষ্ণ করে, তখন তাহা লঘু হইয়া উর্দ্ধে উঠিলে, সেই স্থান প্রায় বায়ুশূন্য অবস্থা (Vacuum) প্রাপ্ত হয়, তখন চারিদিক হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতাবশতঃ গুরুবায়ু, সেই স্থানের দিকে বেগে প্রবাহিত হইয়া সেই শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্যই যেন ধাবিত হয়। বায়ু অতিশয় উষ্ণ হইলেই তাহা উর্দ্ধে উঠে এবং চারিপার্শ্বের ভূমিতলস্থ শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত অবস্থাতে থাকাতে, চারিদিক হইতে সেই শূন্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃতির নিয়মবশতঃ কোন স্থান বায়ুশূন্য থাকিতে পারে না। পাখা দ্বারা যে বাতাস উৎপন্ন হইয়া আমাদিগের দেহ শীতল করে, তাহাও এই কারণেই হয়। টানাপাখা টানিলে সেইস্থানের বায়ু দূরীভূত হওয়াতে, সেই শূন্যস্থান অধিকার করিতে যে বায়ু ধাবিত হয় তাহাই আমাদের দেহ স্পর্শ করে। বিজলী পাখা চক্রাকারে ঘুরাতে তাহার বাতাসও গোলাকার। এখন এই গুহার মাত্র একটী প্রবেশ দ্বার—তাহার মুখের ন্যায় সেই বজ্রভিন্ন স্বরঙ্গ। গুহার অভ্যন্তরের নীচভাগ বিদীর্ণ করিয়া, বজ্র পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, কয়লার খনির স্বরঙ্গের ন্যায়, একটী অপ্রশস্ত স্বরঙ্গ করিয়াছিল। সেই পর্ব্বতগুহাতলে নিহিত কয়লা গন্ধক ইত্যাদি জাতীয় দাহ্য ও জ্বলনশীল পদার্থ, সেই বজ্রাগ্নির সংস্পর্শে

জ্বলিত হওয়াতে, তাহারই শিখা ঐ ভূমিস্থিত সুরঙ্গ দ্বারে ঐ গুহা গহ্বরে উত্থিত হইত। এই অগ্নিশিখা কখন কখন প্রচণ্ড হইয়া সেই বৃহৎ গহ্বরে স্থিত বাতাসকে উত্তপ্ত করিলে তাহা তরল ও লঘু হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইলে, সেই শূন্যস্থান অধিকার করিতে গুহার বাহির হইতে শীতল ও ঘনীভূত গুরুবায়ু সেই গুহাভ্যন্তরে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। দুই পার্শ্বে উচ্চ পাহাড়শ্রেণী (ridge) ক্রমে উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া ভূমির দিকে আসাতে সেই সুরঙ্গের প্রবেশ পথ একটী আচ্ছাদিত গিরি পথের মতই ছিল। সুতরাং বাহির হইতে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ বায়ু যখন সেই গুহার দিকে প্রবাহিত হইত তখন সেই উভয় পার্শ্বের ক্রমোচ্চ পাহাড় দ্বয়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নদী স্রোতের ন্যায়, বেগবতী হইয়া সবেগে সেই গুহার দিকে ধাবিত হইত এবং বায়ুর বেগও (Velocity) ক্রমে বর্দ্ধিত হইত। যেমন একটা শূন্য গর্ত্তের মধ্যে চারিদিক হইতে জলপ্রবেশের সময় সেই গর্ত্তের চারিদিকের কিনারায় বেগে স্রোত প্রবাহিত হয়, তেমনি এই সুরঙ্গে প্রবেশের সময় বায়ুস্রোতেরও, সেই দুই পার্শ্বের কিনারার ন্যায় পাহাড়ে, সেইরূপ প্রবল বেগ হইয়াছিল। একটী গ্রামোফোনের শিঙ্গার অভ্যন্তরে যদি সজোরে বায়ু প্রবেশ করান যায় তাহা হইলে তাহারও এইরূপ হয়। নদীর জলের স্রোত প্রশস্ত স্থানে প্রথমে তত বেগশালী হয়না, কিন্তু তাহা যত অপ্রশস্ত স্থানে যায়, ততই তাহার বেগবৃদ্ধি হয় এবং সেইজন্যই নদীতীরস্থ ভূমি ভগ্ন হয়। এই বায়ুরাশি সেই সুরঙ্গ প্রবেশের সময়, গর্ত্তে জলপ্রবেশের শব্দের ন্যায়ই, ভীষণ শব্দ করিতেছিল। তাই রাম সেই শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং ঝড় উঠিয়াছে এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেই প্রবল বাত্যাপ্রবাহে সমস্ত প্রাণী ধৃত হইয়া সেই গহ্বর মুখে নীত হইতেছিল। আর

রামলক্ষ্মণও সেই শব্দ ও ঝড়ের কারণ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়া, সেই ঘূর্ণীব্যাতায় আকর্ষিত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে সেইদিকে আকর্ষিত হইতে হইতে, সেই দুই পার্শ্বের ক্রমোচ্চে উত্থিত পাহাড়ের দিকেই নীত হইতেছিলেন। এই দুই পার্শ্বের পাহাড়ের গাত্র অবলম্বনে প্রবাহিত বায়ুই সেই কবন্ধের হস্তদ্বয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে আকর্ষিত হইয়া, যদি তাঁহারা ঐ গুহার সুরঙ্গের মধ্য দিয়া সেই গুহাভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হন, তাহা হইলে যে তাঁহাদের নিশ্চয় মৃত্যু ইহা তাঁহারা অনুমান করিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণের বুদ্ধিমতে তাঁহারা দুই হস্ত, এবং পরিহিত চর্ম্ম বা বল্কল দ্বারা সেই বায়ুপ্রবাহকে আঘাত করিতে লাগিলেন, —যেমন লোকে ধূলিরাশিসমন্বিত ঘূর্ণীবায়ুর মধ্যে পড়িয়া দুই হস্ত বা বসন দ্বারা সেই বায়ুকে অপসারিত করিতে চেষ্টা করে। ইহাই তাঁহাদের কর্তৃক অসিদ্বারা রাক্ষসের বাহু ছেদনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহারা সেই পার্শ্বস্থ পাহাড়ের গাত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাহার উপরে উঠিলেন। তখন মুক্তস্থানে আসিয়া তাঁহারা নিরাপদ হইলেন। এই ভৌতিক কাণ্ডে অনেক পশু পক্ষীর নিধন যেন বলিদান রূপেই সেই রাক্ষস কর্তৃক গ্রাসিত হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা এই পশুবলিদান চিরতরে রোধ করিবার জন্য মনস্থ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের বুদ্ধিই যেন রাক্ষসের ভাষনে তাঁহাদিগকে বলিল এই গুহার নীচে অগ্নি সংযোগ করিলে, এই গুহাস্থ ভূগর্ভে নিহিত খনিজ পদার্থ সমস্ত জ্বলিয়া নিঃশেষিত হইলে, আর এইরূপ প্রাণীবধকর 'প্রাকৃতিক উৎপাত হইবে না। তখন তাঁহারা হস্তীকর্তৃক ভগ্ন বহু শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেই গুহার পাতালের দিকে বা ভূমির নীচের দিকে যে

গহ্বর ছিল তাহাই পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন—যেন রাক্ষসের দেহটাই পোড়াইলেন। তখন সেই প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠের অগ্নির সহায়ে সেই খনিজ পদার্থগুলি প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে দীপ্ত অগ্নিশিখা ভীষণবেগে উপরেরদিকে উত্থিত হইয়া, সেইগুহাকে কম্পিত করিয়া তাহার উপরের আবরণ ভেদ করতঃ শূন্যে প্রকাশিত হইল—যেমন পর্ব্বতগাত্রে নিহিত বারুদ, অগ্নিসংযোগে পাহাড়গাত্র বিদীর্ণ করে। সেই গুহার উপরিস্থিত আবরণ বিদীর্ণ করিয়া সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা যখন শূন্যে উত্থিত হইল তখন যেন তাহা সেই গুহারূপ কবন্ধের গ্রীবা বা গলার ন্যায়ই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাঁহারা দুই ভ্রাতা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখন সেই গুহার পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার সাহায্যে বিভাসিত বহু দূর পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন অদূরে একটী পুষ্করিণী এবং সেই সরোবরে বলশালী বানরেরা জলপান করিতেছে, আবার তাহারই পশ্চিম তীরবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখরে, চারিটী বানর সহিত যেন তাহাদেরই নেতা বৃহৎকায় বলশালী বানর সমাসীন আছে। সেই বানরগণকে দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ উৎসাহান্বিত হইলেন, কেননা এপর্য্যন্ত তাঁহারা সীতা অন্বেষণ করিবার সময় এক জটায়ু ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীর সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। এখন যখন রাম সেই বানরদিগকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল এই বানরজাতি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান কুতূহলপ্রিয়। সীতাপহারী যদি এই পথ দিয়া যাইয়া থাকে, তাহাহইলে ইহারা তাঁহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছে এবং হয়তো সীতাও ইহাদিগকে দেখিয়া কোন নিদর্শন নিক্ষেপ করিয়া থাকিলে ইহারা কৌতুহলী হইয়া তাহা কুড়াইয়াও রাখিতে পারে। সুতরাং ইহাদের সহিত মিত্রতা করিয়া

ইহাদের বিশ্বাসভাজন হইলে ইহাদের সাহায্যেও সীতা অন্বেষণের সুবিধা হইতে পারে। যখন কবন্ধের গ্রীবারূপে গুহা হইতে উত্থিত তাহার গ্রীবার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার সাহায্যে এই বানররাজকে দেখিতে পাইলাম, তখন এই গ্রীবারূপ অগ্নিশিখাই আমার 'সুগ্রীব'। আর সেই অগ্নিশিখা যখন বানরপতিকে দেখাইয়াছে তখন সেই আমার সুগ্রীব বা বন্ধু হইবে। বিপদে সাহায্য পাইয়া উদ্ধার হইলে, লোকে সেই সাহায্যকারীর গ্রীবা বা গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে "বন্ধু! তুমি আমার বড়ই উপকার করিয়াছ!" তাহার সু বা শুভ হইয়াছে জন্যই তাহার গ্রীবা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করে। পক্ষান্তরে অপকারীকে গলাধাক্কা দিয়া দূরীভূত করা হয়। তাই উপকারকারী সুগ্রীবা সদৃশ অগ্নিশিখার প্রদর্শিত এই বানর পতির সহিত মিত্রতা করিলে সে-ও তাঁহার সুগ্রীব হইবে—এইরূপ রামের মনে উদয় হইল। নতুবা কবন্ধের বা তাহার দিব্যদেহ রূপ অগ্নিশিখার কথা বলিবার কি সম্ভব হয়? তাহা অস্বাভাবিকই। যেমন মহর্ষি অগস্ত্যঋষি বিন্ধ্য পর্ব্বত সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ফলে তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন তেমনি বাল্মীকি ঋষিও এই প্রাকৃতিক অদ্ভুত ঘটনা তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ফলে অবগত হইয়া, তাহাই রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাম যদি এই প্রাকৃতিক ঘটনা রূপ কবন্ধের সম্মুখীন না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুগ্রীব সাক্ষাৎকার হইত না। তাঁহারা সমতল ভূমিতেই বনের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। পর্ব্বত শৃঙ্গে শ্রমস্বীকার করিয়া উঠিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না, বিশেষতঃ যখন সীতাপহারী পদব্রজেই পথ অতিক্রম করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই পর্ব্বত শৃঙ্গে, ঘটনা চক্রে না উঠিলে তাঁহারা

পম্পা ও তত্তীরস্থ ঋষ্যমূক পর্ব্বতস্থ বানরগণকে দেখিতে পাইতেন না। আবার সেই গুহাতে অগ্নি সংযোগ না করিলেও তাহার প্রজ্জলিত উর্দ্ধগামী শিখার সাহায্য ভিন্ন, দূরস্থ ঐ সকল দৃশ্য তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইত না, আর কবন্ধ ও তাঁহাদিগকে তাহার দেহ ভস্ম না করিতে বলিলে তাঁহারা সেই গুহাতে অগ্নি সংযোগ করিতেন না। সেই বন্য মৃগদিগের সহিত তাঁহারাও সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত না হইলে, যজ্ঞাহুতিতে পশু বলিদানের ন্যায় সেই পশুদের অসহায় অবস্থায় বিনাশ প্রাপ্তি দেখিয়া তাঁহাদের করুণার উদ্রেক হইত না। বাল্মীকি যেরূপ রূপকে তাঁহার নিপুণ হস্তে, তুলিকা দ্বারা এই চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বড়ই উপভোগ্য নহে কি? তিনি নিজে স্বচক্ষে এইরূপ কোন প্রাকৃতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কারণ অবধারণ করিতেও যে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই ঘটনা বর্ণনে দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণ কবন্ধ দেহ যেন সেই কৃষ্ণবর্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত গুহারই প্রতিমূর্ত্তি। আর কবন্ধকে ভস্ম করিবার প্রেরণা যেন কবন্ধের মুখে রামের নিজ বুদ্ধিরই প্রেরণা। এই কবন্ধের যে অন্য গূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
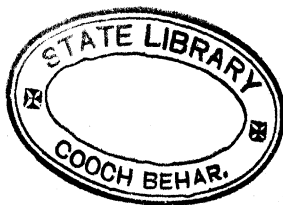
বানর সম্মিলন ও বালিবধ

অতঃপর তাঁহারা সেই দীপ্ত কবন্ধ দেহ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া পম্পার তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে পম্পা পার হইয়া তাহার অপরপারস্থিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে সেই অগম্য বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, পর্ব্বতশিখরোপরি উপবিষ্ট সুগ্রীব, তাহারা বালি প্রেরিত চর মনে করিয়া, ভীত হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। সেই চারিজন অমাত্যসহ সুগ্রীব বালিভয়ে অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইলে, হনুমান তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, সুগ্রীব বলিল, "ধনুর্ব্বাণ ও তরবারীধারী, বিশাল নেত্র, দীর্ঘবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ-দ্বয়কে দেখিয়া কাহার না ভয় জন্মে? আমার আশঙ্কা হইতেছে ইঁহারা বালি কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব বানর শ্রেষ্ঠ হনুমান! তুমি উদাসীন বেশে তথায় যাইয়া, আকার, ইঙ্গিত ও উক্তি প্রত্যুক্তিদ্বারা উঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হও। এবং উঁহাদের এস্থানে আগমনের উদ্দেশ্য কি তাহাও জানিয়া আইস।" তখন হনুমান, বানররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষু সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে সেই দুই ভ্রাতার নিকট গমন করিল।

"কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান মরুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ ॥"

হনুমান অতি মধুর বাক্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া বলিল, "বোধ

হইতেছে আপানারা তপস্যারত ব্রহ্মচারী প্রধান অথচ বলবান। সুগ্রীব নামক কোন ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবানশ্রেষ্ঠ বানরশ্রেষ্ঠ, অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য হইতে দূরীভূত হইয়া, দুঃখিত চিত্তে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে; আমি বানর, আমার নাম হনুমান; আমি সেই বানর রাজ সুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এখানে আসিয়াছি। তিনি আপনাদের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।” তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন “আমি যাহাদের দর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি সেই বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের অমাত্য এই কপিবর আমাদিগের নিকট আসিয়াছে, সুতরাং তুমি ইহার সহিত কথোপকথন কর।” তখন লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন “আমরাও সেই সুগ্রীবকেই অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহার সহিত মিত্রতা করিব। রামের পত্নী সীতাকে যে রাক্ষস হরণ করিয়াছে আমরা তাহাকে সবিশেষ রূপে অবগত নহি। তাই আমরা সুগ্রীবের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তখন হনুমান তাঁহাদিগকে স্কন্ধে বহন করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আরোহণ করতঃ, তাহার একদেশস্থিত মলয় নামে বিখ্যাত পর্ব্বতে যাইয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন “আমি হনুমানের নিকট বিস্তারিত শুনিলাম এবং এই হস্তদ্বয় প্রসারণ করিলাম; যদি আপনি এই বানরের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে আপনার হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারন করুন।” তখন রাম তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলে, সুগ্রীব বলিল “কয়েক দিবস পূর্ব্বে এক ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করিয়া শূন্যপথে লইয়া যাইতেছিল, আমি দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে তিনিই সীতা। তৎকালে আমরা এই পাঁচজনে শিলাতলে বসিয়াছিলাম। সেই রমণী আমাদিগকে দেখিয়া উত্তরীয় বসন ও অলঙ্কার এখানে নিক্ষেপ

করিয়াছিলেন। আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।" তখন সুগ্রীব সেই বসন ও আভরণ রামকে দেখাইলে, রাম তাহা চিনিতে পারিলেন। রাম লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন "আমি প্রতিদিন সীতার চরণ বন্দনা করিতাম, সুতরাং এই দুইটী নুপূর মাত্র দেখিয়া চিনিলাম, কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনিতে পারিলাম না। কেননা আমি সীতার চরণ ভিন্ন অন্য কোন অবয়ব দেখি নাই।" তৎপরে রাম সুগ্রীবকে তাঁহার বীর্য্যবত্তার পরিচয় দেখাইবার জন্য সপ্ততাল বৃক্ষ শরদ্বারা ভেদ করিলে, সুগ্রীব আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার ভ্রাতা বালীর বাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যাতে হুঙ্কার দিল। তখন বালী বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিলে, সুগ্রীব আহত হইয়া পলায়ন করতঃ পুনঃ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাম বালী বধের জন্য বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, যখন দুই বানর যুদ্ধ করিতেছিল তখন তাহাদের সৌসাদৃশ্য বশতঃ পাছে ভুলক্রমে সুগ্রীবকে বধ করেন, এই আশঙ্কায় শর ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন। সুগ্রীব ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে, তাহাকে বুঝাইয়া তাহার গলে একটী লতা ও পুষ্পের মালা পরাইয়া, তাহাকে পুনরায় বালীর সহিত যুদ্ধার্থ লইয়া গেলেন। বালীও পুনরায় সুগ্রীবের হুঙ্কার শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল। ইত্যবসরে বৃক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া রাম শর ত্যাগ করিলেন, আর তাহাতেই বালী ভূপতিত হইল। এই বালী মরিবার সময় রামকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছিল, তন্মধ্যে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল। বালী বলিল, "আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন তুমি অদৃশ্য থাকিয়া আমাকে নিহত করিয়াছ; তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিয়া কি যশলাভ করিলে? জগতে সকলেই

তোমার যশকীর্ত্তন করিয়া বলে যে তুমি বলশালী, তেজস্বী, ব্রহ্মচারী, সকল জীবের হিতকারী, দয়াপ্রকাশে সুদক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কোন সময়ে কি করা উচিত তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ড-প্রদান রাজাদিগের ধর্ম্ম। তোমার এই অনুচিত কার্য্যে আমি জানিতে পারিলাম যে তুমি যথার্থ অধার্ম্মিক, ধার্ম্মিকের ভাণকারী, পাপাচারী ও তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অহিতকারী। আমি তোমাকে অবমাননা করি নাই, তোমার রাজ্যে বাস করিনা, কোন পাপাচরণ করি নাই, এবং তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেও যাই নাই ; অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তবে তুমি বিনাদোষে কেন আমার হিংসা করিলে? আমি এরূপ পঞ্চনখ পশু যাহার মাংস অভক্ষ্য, তথাপি তুমি কেন আমাকে হত্যা করিলে? তুমি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে বধ করিয়াছ ; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আমার নিকটেও আসিতে পারিতে না। তুমি সুগ্রীবের রাজ্য লাভার্থ অধর্ম্মানুসারে আমাকে বধ করিলে।"

তখন রাম তাহাকে বলিলেন "এক্ষণে ধর্ম্মাত্মা সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছেন ; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করতঃ তিনি পৃথিবী শাসন করিতেছেন। কোন প্রদেশেই কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারেনা। আমি ও অন্যান্য অনেক রাজা সেই ধার্ম্মিক রাজা ভরতের আদেশক্রমে ধর্ম্ম প্রচারে অভিলাষী হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে বিচরণ করিতেছি। ভরতের আদেশানুসারে ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড দিয়া থাকি। তুমিও, রাজার কর্ত্তব্য ধর্ম্মপথে অবস্থিত নও। যিনি ধর্ম্মপথে থাকেন তাঁহার, পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিদ্যাপ্রদাতা এই তিনজনকেই, পিতার ন্যায় মনে করা এবং পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সদ্গুণশালী শিষ্য এই তিনজনকেও পুত্রবৎ

বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতার পত্নীতে অভিগমন করিয়াছ। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, সুতরাং ইহার পত্নী তোমার পুত্রবধূ তুল্যা। কিন্তু তুমি কামপরায়ণ হইয়া ইহার জীবিতাবস্থাতেই ইহার স্ত্রীতে উপরত হইয়াছ; সুতরাং তুমি পাপাচারী হইয়াছ! তোমার কনিষ্ঠভ্রাতৃ ভার্য্যাগমনের অপরাধে আমি তোমার এরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছি। যে ব্যক্তি কামপরতঃ সহোদরা ভগ্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াতে গমন করে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে সে প্রাণদণ্ডার্হ। মাংসপ্রিয় মনুষ্যগণ তৃণ লতাদি দ্বারা গুপ্তভাবে থাকিয়াই হউক আর প্রকাশ্যভাবেই হউক পরাবর্ত্তিত, ধাবিত, আস্বস্থ, দণ্ডায়মান, সতর্ক অসতর্ক বা বিমুখ মৃগ সকলকে বাগুরা এবং পাশ প্রভৃতি উপায় দ্বারা বধ করিয়া থাকে। এই জন্য গুপ্তভাবে তোমাকে বধ করিয়া আমার মনের গ্লানি হয় নাই; এবং ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও ঐরূপ মৃগয়া করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহাতে কোন দোষ মনে করিনা। তুমি বানর, এজন্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াই হউক, যুদ্ধ না করিয়াই হউক, বাণদ্বারা তোমাকে নিহত করিয়াছি। "অযুধান প্রতিযুধান বা যস্মাচ্ছাখা মৃগোহ্সি॥" তখন বালী বলিল, "আমি অধার্ম্মিকদিগের প্রধান, সুতরাং ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে আমাকে পরিত্রাণ করুন।"

তখন বালীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তৎপত্নী তারা শোকাতুরা হইয়া ভূতলে পতিত স্বামীকে দেখিয়া তাহাকে বলিল "তুমি পূর্ব্বে সুগ্রীবের পত্নী হরণ করিয়া তাহাকে যে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে, অদ্য মৃত্যুরূপে তাহার পরিণাম ফল পাইলে। রাম যে অন্যের সহিত যুদ্ধেরত বালীকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া নিন্দিতকার্য্য করিয়াও তজ্জন্য সন্তাপিত হইতেছেন না ইহা নিতান্ত নিন্দনীয়। রাম তোমাকে

বধ করিয়া অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; কারণ সুগ্রীবের সহিত প্রতিশ্রুতিরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।” তৎপরে বালির দেহ সংকার হইলে সুগ্রীব রামকর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নিজপত্নী রুমা ও তারার সহিত রাজ্য করিতে লাগিল। এদিকে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে সীতা অন্বেষণ কার্য্য তখন স্থগিত থাকিল এবং রামও লক্ষ্মণ, পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবও দুই পত্নীসহ নিজপুরী কিষ্কিন্ধ্যাতে, ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমস্ত অমাত্যাদি সহ রাজসম্পদ ভোগে মত্ত হইল।

রামায়ণের এই বানর সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী অতীব কুহেলিকাপূর্ণ। এই বানরগণই রামের সীতা অন্বেষণের ও উদ্ধারের প্রধান সহায়স্বরূপ হওয়াতে, বাল্মীকি তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা যেন দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যজাতীয়ই ছিল। তাহাদের রাজ্য সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ, তাহাদের মুখে বিজ্ঞোচিত বাক্য ভাষণ, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মে বিচার, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য্য বীর্য্য সম্বন্ধে, বাল্মীকি যেরূপ নিপুণ তুলিকায় তাহাদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা যে সত্যই দাক্ষিণাত্যবাসী সভ্য মনুষ্যজাতি ছিল, তাহাই দৃঢ় প্রতীতি হয়, এবং তাহারই ভিত্তি অবলম্বনে এখন অনেক মনীষী ইহাই স্থির করিয়াছেন যে এই দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম মনুষ্যজাতি বাস্তবিক বানর ছিল না, অন্যথা তাহাদের মধ্যে উক্তরূপবর্ণিত সভ্যতার বিকাশ হইত না। আবার তথাকথিত বানরজাতি যে পুরাতন (Dravidian) দ্রাবিড়বাসীই ছিল, তাহার প্রমাণও এখন সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যাইতেছে। এই সেদিনে হরপ্পা ও মাহেঞ্জুদারো নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের স্থানবিশেষ খনন দ্বারা যে, পূর্ব্বতন ৫০০০ পাঁচ হাজার

বৎসরের পূর্ব্বের সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দেশে প্রাপ্ত অনেক পুরাতন পদার্থের সহিত, বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই বিলুপ্তপ্রায় জাতিও এক সময়ে নিজেদের সভ্যতার গর্ব্বে গৌরবান্বিত হইয়া, ভারতের কুমারিকা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত, তাহা প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর ইহারাই বাল্মীকিবর্ণিত বানর, এবং ইহারা যে ভাষায় বাক্যালাপ করিত তাহা রাম শীঘ্রই আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে আবার শিক্ষারও অভাব ছিল না, কেননা হনুমান যখন রামের সহিত প্রথম বাক্যালাপ করিয়াছিল তাহা রামের সহজেই বোধগম্য হওয়াতে প্রমাণ হয় যে, সে আর্য্যাবর্ত্তের তৎকালিন প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাতেও অভিজ্ঞ ছিল; তাই রাম তাহার বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া তাহার বাগ্মীতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অকাট্য যুক্তিতেই আধুনিক পণ্ডিতেরা তাহাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পক্ষান্তরে সংস্কারী অন্ধবিশ্বাসী বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে-রাম-উপাসক হিন্দুরা, তাহাদের সরলজ্ঞানে ও বিশ্বাসে এই বানরদের বানরত্বেই বিশ্বাসী, কেননা দেবতাবংশীয় হওয়াতে তাহারা মনুষ্যের ভাষাতেই সুসংস্কৃত বাক্যে যে কথোপকথন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আর বিষ্ণুও মর্ত্ত্যে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সাঙ্গোপাঙ্গ স্বর্গস্থ দেবতাদের ঔরসে উদ্ভূত বানররূপী জীবের সহিত, ত্রিভুবন বিধ্বস্তকারী রাবণ রাক্ষসকে নিধন করিবার জন্যই যেন লীলাছলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং এসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই। পক্ষান্তরে রামের ইতিহাসের সত্যতা রক্ষা করিতে হইলে ঐরূপ মনুষ্যজনোচিত চিত্রে তাহাদিগকে অঙ্কিত না করিলে বানরের মূকত্ব বিধায়, রামের ঐরূপ দুরূহ কার্য্য

সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, ইহাও সত্য। কিন্তু এই বানরজাতি যদি প্রকৃতই তাৎকালিক আদিম মনুষ্যজাতিই হয়, তাহা হইলে তাহাদের লাঙ্গুল থাকিতে পারে না। বানর হইতে ক্রমবিবর্ত্তনে যদি মানুষ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের লাঙ্গুলের তিরোধানেই তাহা হওয়া সম্ভব। এই অসঙ্গতি কি বাল্মীকির মনে উদয় হয় নাই, নতুবা কেন তিনি এই বানরের লাঙ্গুলের কথা এত দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং বানর-জাতিকে বরাবর পশু-জাতীয়ই বলিয়া গিয়াছেন। এই বানরের পশুত্ব তিনি অতি স্পষ্টভাবেই বানরের উক্তিতেই দেখাইয়াছেন—"বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ। এষা প্রকৃতিরস্মাকং পুরুষস্ত্বং নরেশ্বর।" আমরা ফলমূলভোজী বনচর পশু। আমাদের প্রকৃতি এইরূপ, আপনি মনুষ্যের পতি পুরুষ। "পঞ্চনখাভক্ষ্য ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘবঃ। অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোঽহং পঞ্চনখো হতঃ॥" পঞ্চনখী প্রাণী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য। আমি এরূপ পঞ্চনখী পশু যে আমার মাংস অভক্ষ্য। আমরা পরেও দেখাইব যে লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরেরা ভয়ে কিল্ কিল্ শব্দ করিতে করিতে পলায়ন করিয়াছিল "তত কিল কিলাং চক্রু র্লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।" তাহারা মনুষ্যজনোচিত বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কিল্ কিল্ শব্দে তাহাদের ভীতি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা তাহাদের বানরোচিত ভাষাই ছিল। সুতরাং এই বানরকে বানররূপে প্রতিষ্ঠিত রাখাই বাল্মীকিরও উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাই আমাদিগকে দেখাইতে হইবে কিরূপে এই পশুবানরোচিত কার্য্যকলাপের সাহায্যে রাম তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

বানরজাতি অতিশয় অনুকরণপ্রিয়, চতুর ও কৌতূহলী। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত একটী সত্য ঘটনায়—যাহা সংবাদপত্রে

প্রকাশিত হইয়া, হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকিতে পারে। একটী লোক তাহার পোষা শিক্ষিত বানর নাচাইয়া নিজের ও বানরের ভরণপোষণ করিত। একদিন সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রামান্তর হইতে তাহার তাৎকালিক বাসস্থানে প্রত্যাগমন সময় একটী জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হয়। সেই সময় একটী দস্যু তাহাকে হত্যা করিয়া মৃত্তিকাতে তাহার মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া, তদুপরি কতকগুলি তৃণগুচ্ছ বিছাইয়া রাখিয়া, তাহার সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ হরণকরতঃ চলিয়া যায়। সে যখন তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বানরটী বন্ধনরজ্জু-মুক্ত হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া সেই হত্যাকারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে। দস্যু চলিয়া গেলে বানরটী সেই সদ্যঃপ্রোথিত প্রভুর কবরের উপর তাহার বংশযষ্ঠিখানি প্রোথিত করিয়া সেই হত্যাকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করতঃ তাহার বাসস্থান দেখিয়া আসিয়া পরিচিত নিজ প্রভুর বাসস্থানে চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামস্থলোক সেই বানরটীকে একাকী দেখিতে পাইয়া তাহার প্রভুর অনুসন্ধান করে। তখন সে তাহাদিগের বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করতঃ এমন হাবভাব দেখায় যাহাতে সেই সমাগত গ্রামবাসীরা অনুমান করিতে পারিল যে এই বানর যেন তাহাদিগকে কোথাও লইয়া যাইতে চাহিতেছে। তখন তাহারা কুতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বানরের ইঙ্গিত মত সেই প্রান্তরে উপস্থিত হয়। তখন বানর সেই যষ্ঠিখানি উঠাইয়া তথাকার মৃত্তিকা হাত দিয়া সরাইতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহারাও সেই সদ্যঃখনিত ও পূরিত স্থানের মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া দেখিতে পাইল সেই মৃত বানরপালকের শবদেহ। তাহার বস্ত্রাদি অন্বেষণ করিয়া যখন দেখিতে পাইল যে

তাহাতে কোন অর্থাদি নাই তখন তাহাদের ধারণা হইল যে, কোন দস্যু কর্ত্তৃকই এ ব্যক্তি অপহৃত ও হত হইয়াছে। তারপরে সেই বানরই তাহাদিগকে সেই হত্যাকারীর বাসস্থানের নিকট লইয়া গেল। তখন তাহারা পুলিসে সংবাদ দিলে পুলিস কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইলে, সেই বানরটী সেই হত্যাকারীর স্কন্ধে লম্ফপ্রদানে উঠিয়া, তাহাকে কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে, বিচারপতি, সেই বানরের সেই নাট্যাভিনয়ের ন্যায় হত্যার দৃশ্যের কার্য্যাবলী দেখিয়া যেন তাহার সাক্ষ্যেই, অপরাধীর দণ্ড দিয়াছিলেন। আমার একটী আত্মীয়ের বাড়ীতে একটী বানর আছে। আমি তাহার নিকটে যাইয়া যখন আমার যষ্ঠির নিম্নভাগ তাহার গায়ে দিই, তখন সে তাহা ধরিয়া উঠিলে, আমি তাহাকে দোলাইলে সে বেশ ক্রিয়ামোদ উপভোগ করে, কিন্তু যখনই তাহা ঘুরাইয়া তাহার বক্র অগ্রভাগ তাহার নিকট দেখাই, তখনই সে দাঁত খিঁচাইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসে বা তাহার উচ্চ আশ্রয়স্থানে পলাইয়া যায়। আমার শান্তভাব দেখিলে সে আমার গায়ে উঠিয়া আমার অলক্ষ্যে জামার পকেটে হস্ত দিয়া টাকা পয়সা অতি সন্তর্পণে লইয়া তাহার মুখের মধ্যে পুরিয়া ফেলে, পরে খাদ্যদ্রব্য দেখাইয়া তাহার মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইতে পারি। অনেক পাঠক সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফ চিত্রে দেখিয়াছেন শিক্ষিত বানর (ape) ও সিম্পাঞ্জী কিরূপ মনুষ্যের ন্যায় কার্য্যাদি করিতে পারে। এক্ষে বানরজাতি স্বভাবতঃই চতুর ও কৌতুকপ্রিয় এবং বুদ্ধিমান, তাহার উপর শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তাহারা মনুষ্যোচিত অনেক কার্য্যই করিতে সমর্থ হয়। যদি এইরূপ সম্ভব হয় তাহা হইলে বালিও যে এই

শ্রেণীর বানর সাহায্যেই, তাঁহার সীতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই বা সম্ভব হইবে না কেন? আমরা এখন যথাযথ রামের সেই আচরণ ও কার্য্যপ্রণালী দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রাম যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত হনুমান, ভিক্ষু সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার নিকটে ধীরে ধীরে আসিল। সুগ্রীব হনুমানকে বলিয়াছিল "তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম॥" এই প্রাকৃত শব্দের অর্থ কি? অনুবাদে আছে ছদ্মবেশ। প্রাকৃত=স চ সংস্কৃতপ্রকৃতিকঃ। প্রাকৃতং ক্লীং=প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্। সংস্কৃত প্রকৃতি। "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতং।" অর্থাৎ সুগ্রীব বলিলেন তোমার বানর প্রকৃতি সংস্কৃত করিয়া রাম লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আইস। এখানে রূপ বা আকার পরিবর্ত্তন করিয়া মনুষ্যবেশ ধারণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আবার হনুমানও

"কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মরুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ॥"

অর্থাৎ হনুমান তাহার স্বভাবজ বানরসুলভ মুখের চেহারা (appearance) পরিত্যাগ করিয়া শঠতা করিয়া ভিক্ষুর চেহারা বা (appearance) অনুকরণ করিয়াছিল। তাহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পরিচায়ক আকারকে ভিক্ষুর ন্যায় নম্রভাবাপন্ন আবেশে পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সে বানরআকৃতিতেই তাহার নম্রস্বভাব প্রকাশ করিয়াই রামের সন্নিধানে অগ্রসর হইয়াছিল। রামও তাহার শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রয়াস না করিয়া তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন—যখন সে তাঁহাদিগকে স্কন্ধে বহন করিবার ইঙ্গিত করিয়া

তাহাদের জানুদ্বয়ের মধ্যে তাহার মস্তক প্রবেশ করাইয়া দিল, তখন হনুমান তাঁহাদিগকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। বালী ও সুগ্রীব দুইজনই অতিশয় পরাক্রমশালী হওয়াতে, তাহারা দুইজনই বানরদলের যূথপতি ছিল। তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যই ছিল এবং যতদিন তাহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বানরীর সহিতই তাহাদের উপভোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল, ততদিন বিরোধের কোন কারণও হয় নাই। কিন্তু বালী সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া সুগ্রীবের সহচরী বানরী উপভোগ করাতে, দুইজনের মধ্যে এই বানরীঘটিত বিরোধ হইল; তখন সুগ্রীব অপেক্ষাকৃত বলবান বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। বানর ও বানরীরা বালীকেই বেশী শক্তিশালী দেখিয়া তাহারই অধীনে বাস করিতে লাগিল। বানর দুই পক্ষের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ অনেকেই দেখিয়াছেন। তখন মাত্র হনুমান, জাম্বুবান-ঋক্ষ, মৈন্দ ও দ্বিবিধ এই চারিটী বানর যাহারা সুগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচর ও প্রিয় ছিল তাহারাই সুগ্রীবের নিকট রহিল। এইরূপেই সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল।

যখন হনুমান তাঁহাদিগকে সুগ্রীবের সম্মুখে স্কন্ধ হইতে নামাইল তখন সুগ্রীবকে দেখিয়া রাম তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া যেন তাহার সহিত তাঁহার মৈত্রীভাব দেখাইলেন। ইতিপূর্ব্বে এই পঞ্চ বানর যখন পর্ব্বতসানুদেশে বসিয়াছিল, তখন তাহারা এক ভীষণাকার দুর্দ্দান্ত মনুষ্যজাতীয় প্রাণীকে অন্য একটী ক্ষুদ্রাবয়বা নারীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল, কেননা সুগ্রীবের সহচরী বানরীকে যখন বালী এইরূপে লইয়া গিয়াছিল, তখন সে তাহাতে বাধা দিবার জন্য তাহার যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে তাহার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং সীতাকেও সেইরূপ

করিতে তাহারা দেখিয়াছিল। সীতা যে নারী জাতীয়া তাহা তাহারা তাঁহার বক্ষঃস্থল দৃষ্টেই বুঝিতে পারিয়াছিল। বানর কর্ত্তৃক মানুষী নারীর প্রতি আক্রমণের গল্প কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়। সীতা তখন তাঁহার কৌষেয় উত্তরীয় ও অলঙ্কার নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—অভিপ্রায় যে এই কৌতুকপ্রিয় বানরগণ সেইগুলি কৌতূহলী হইয়া কুড়াইয়া রাখিবে এবং রাম যদি তাঁহার অন্বেষণে এইদিকে আসেন তাহা হইলে এই বানরদিগের নিকট তাহা দেখিতে পাইলে, তাঁহার গমনের পথ ও দিক নির্দ্দেশ হইতে পারিবে। সুগ্রীবের প্রিয় সহচরী বানরীও এইরূপে বালি কর্ত্তৃক তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক নীতা হইয়াছিল, ইহা সুগ্রীবের একটী মহামনঃকষ্টের কারণ ছিল। বানর ও বানরীরা এক সঙ্গে বহুকাল বাস করিলে তাহাদের পরস্পরের প্রতি একটা অনুরাগ সঞ্চার হয়। যদি বাল্মীকিদৃষ্ট ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে তবে মনুষ্যেরই ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীর মধ্যেই বা ইহা সম্ভব হইবে না কেন? তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যে একই মনুষ্যজাতীয় এবং হয়তো তাহাদেরই সহচরী এই নারীটীকে, সেই বৃহদাকার দুর্দ্দান্ত মনুষ্যটী বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাওয়াতে, তাঁহারই অন্বেষণে ইঁহারা বনে বনে ঘুরিতেছে, ইহাই সুগ্রীবের বুদ্ধিতে আসিল। তখন সে গুহা হইতে সীতার সেই নিক্ষিপ্ত বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিল। যখন সীতার সেই পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কার দেখিয়া রাম অশ্রুসিক্ত নয়নে করুণ রোদন করিতে লাগিলেন তখন সুগ্রীবের আর বুঝিতে বাঁকি রহিল না। রাম সেই বানরদিগের সহিত সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই বানরদিগের হাবভাব ও ইঙ্গিত ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এখন বালী মধ্যে মধ্যে, কখন কখন সদলে বানরী

পরিবৃত হইয়া সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বতের দিকে আসিলে, যখন সুগ্রীব সেই সহচরী বানরীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে করুণ রোদন করিত, তখন রাম বুঝিতে পারিলেন কেন এই পর্ব্বতস্থ বানর দলের মধ্যে একটীও বানরী সমাগম দেখিতে পাইলেন না, আবার যখনই বালী সুগ্রীবের দৃষ্টিপথে আসিত, তখনই সুগ্রীব যেন কোন অজ্ঞাত কারণে ভীতিবিহ্বলচিত্তে লুক্কায়িত হইবার চেষ্টা করিত। রাম বুঝিলেন এই অন্য পরাক্রমশালী বানর, সুগ্রীবকে তাহার সহচরীর সঙ্গচ্যুত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে দল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। তখন রাম তাহাকে সঙ্গে করিয়া পম্পা তীরে লইয়া যাইয়া সেই সরোবরস্থিত একটী বৃহৎ কঠিন ত্বগাচ্ছাদিত শাল মৎস্যের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। বহু পুরাতন পুষ্করিণীতে এইরূপ বৃহৎ শাল মৎস্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাদের অঙ্গে কঠিন 'আঁইস' থাকাতে তাহা ভেদ করা বহু বলসাপেক্ষ। বাল্মীকি এখানে বলিতেছেন—

"স গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরং শরমেকঞ্চ মানদঃ।
সালমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ পূরয়ন্ স রবৈর্দিশঃ॥
স বিসৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ।
ভিত্ত্বা তালান্ গিরিপ্রস্থং সপ্ত ভূমিং বিবেশ হ॥"

"রাম সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ধনু এবং এক ভয়ঙ্কর শর লইয়া উচ্চরবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া শাল বৃক্ষের উদ্দেশে সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণ সাতটী শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। সেই বাণ শালবৃক্ষ সকল ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অতি দ্রুত বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তূণ মধ্যে প্রবেশ করিল।" (তর্করত্ন)। ইহা বিষ্ণু অবতার রামের বিষ্ণুত্ব দেখাইবার জন্য সম্ভব হইলেও মনুষ্য

রামের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে কি? একটা বাণ সাতটা তালবৃক্ষ ভেদ করিয়া সপ্ত ভূমি প্রবেশ করিয়া আবার তাহা রামের তূণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। এখানে সাল শব্দ আছে। সালঃ পুং শল্যতে ইতি। শলগতৌ+ঘঞ্=শাল মৎস্য। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ। ইহা গতি বোধক শল ধাতু হইতে নিষ্পত্তি জনিত গতিশীল হওয়া উচিত। সাল ও শাল একই শল ধাতু হইতে সাধিত। উভয়ের অর্থই মৎস্য বিশেষ। বৃক্ষ বিশেষ। এই সাল মৎস্যের নাম বাঙ্গলা ভাষায় 'গজাড়' অর্থাৎ অতি বৃহৎ মৎস্য। পরের শ্লোকে আছে 'তালান্'। যদি শাল বৃক্ষের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা 'তাল' বৃক্ষ ভেদ করিল কি করিয়া? প্রথম সাল একটী, আর তালান অনেকগুলি। সাল ও তাল বৃক্ষে কত প্রভেদ। তর্করত্ন মহাশয়ের মতে ইহা সপ্ততাল বৃক্ষ, কিন্তু সপ্ত শব্দ, ভূমির পূর্ব্বে থাকাতে ইহা ভূমির বিশেষণ। এখানে বিষ্ণু অবতার রামের শরের শক্তিই দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ সেই বাণ শুধু সাল বৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থই ভেদ করিল না তাহা সাত পাতাল ভেদ করিয়া পুনরায় তূণে ফিরিয়া আসিল। পক্ষান্তরে মানুষ রাম তাঁহার শরে চলন্ত বৃহৎ কঠিন গাত্রচর্ম্ম আবৃত সাল মৎস্য ভেদ করিয়া তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন বাল্মীকি একই বর্ণনায় তাহাও দেখাইলেন—ইহা শুধু বিভিন্ন দৃষ্টি সাপেক্ষ।

তখন সুগ্রীব, রামের শরের শক্তি বুঝিতে পারিয়া, রাম কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বালীর আবাসস্থানের নিকট হুঙ্কার দিল। বালী তাহার গর্জ্জন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে, রাম বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া তাহাদের একইরূপ আকারবশতঃ চিনিতে না পারিয়া শরনিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। তখন পুনরায় পরাজিত ও পলায়িত সুগ্রীবকে ভয়প্রদর্শনে তাহার গলায় পত্রপুষ্পমালা দিয়া

সঙ্গে করিয়া বালীর সহিত যুদ্ধার্থ লইয়া গেলেন। বালী সুগ্রীবকে আক্রমণ করিলে, তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তখন সমস্ত বানরদল রামের এই অত্যদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া, ভয়ে তাঁহারই আশ্রিত সুগ্রীবের অধীনতা স্বীকার করিল এবং সমস্ত বানরীরাও তাহার নিকট আসিল। সুগ্রীব রামের ভৃত্য হইল। ইত্যবসরে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সুতরাং সীতা অন্বেষণ তৎকালে স্থগিত থাকিল।

বাল্মীকি রামকে আদর্শপুরুষ স্থির করিয়াই ভূমিকাতে তাঁহাকে সর্ব্বগুণমণ্ডিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া, তাঁহার চরিত্র অঙ্কন করিতে মনন করিয়াছিলেন। এখানে তিনি রামের সেই চরিত্রের বৈপরীত্য দেখিয়া বালী ও রামের কথোপকথনচ্ছলে রামের আচরণে কি অন্যায় হইতে পারে তাহা দেখাইয়া, আবার তাহার উত্তরদানে তাহা যে ন্যায়সঙ্গত তাহাও দেখাইয়াছেন। তিনি বালীকে যেন মনুষ্যজাতীয় ও তদুপযোগী যতদূর সম্ভব তাহার রাজ্যপাট, পুরী ও ঐশ্বর্য্যের সহিত সমাবেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। রাম একজনের নিকট উপকার পাইবার প্রত্যাশায়, তাহার বিপক্ষের সহিত, তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষবশতঃ, যুদ্ধে ব্যাপৃত অবস্থায়, নিজে অদৃশ্য থাকিয়া তাহাকে (বিপক্ষকে) বধ করিলেন। মনুষ্যপক্ষে—ক্ষাত্রধর্ম্মে ইহা অনুমোদিত নহে। ইহা অধর্ম্ম। রাম সেই বিপক্ষকে যদি ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুযায়ী সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে ইহাতে কোন ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য হইত না। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটি কলঙ্ক, যাহা, তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করিয়া বালী তাঁহাকে বলিয়াছিল এবং ইহা মনুষ্যোচিত উক্তিই। রাম নিজের কার্য্য যে অন্যায় হয় নাই, তজ্জন্য বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নীতে উপগত হওয়ার অপরাধের উল্লেখ

করিলেন। এইরূপ বিধান সভ্য মনুষ্যসমাজেই প্রযোজ্য। সুতরাং এই যুক্তিতে রামের দোষস্খালন হইতে পারিত, যদি বালী সেই মনুষ্যসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হইত। কিন্তু বালী যখন বলিয়াছিল আমরা বন্য শাখামৃগ, আমাদের মাংস অস্পৃশ্য, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে কেন আমাকে হত্যা করিলে? তাহার উত্তরে রাম যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দোষ স্খালন হয় না। "মাংসাশী মনুষ্যেরা অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া মৃগসকলকে যে কোন অবস্থায় বধ করিলে, তাহাতে অধর্ম্ম হয় না, কেননা ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও ঐরূপ মৃগয়া করিয়া থাকেন।" মাংসাশী ব্যক্তিই এই কার্য্য করে। বানরের মাংস অভক্ষ্য। সুতরাং বিনা স্বার্থে ইহা জীবহত্যা। ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরা কি এইরূপ বিনা কারণে বৃথা জীবহত্যা করিতেন? কাজেই এ উত্তরে রামের এই কার্য্য যে অন্যায় হয় নাই তাহা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হয় না। বরং ইহা আধুনিক সভ্যসমাজের পক্ষে খাটিতে পারে। ইহা দুর্দ্দান্ত বন্যজন্তুর শক্তির বিরুদ্ধে নিজের শক্তির পরীক্ষা করা রূপ মৃগয়া। যেমন দক্ষ শিকারীরা বন্য সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ, গণ্ডার ও গরিলা শিকারের জন্য আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলে যাইয়া থাকেন। ইহা নিজেদের শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশের জন্য। রাজর্ষিরা যদি এই হিসাবে জীব বধ করিতেন তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মানুমোদিত হইত। অনেকে আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলা শিকারের কাহিনী পড়িয়াছেন। সেই গরিলা বধ করিতে হইলে অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়াই করিতে হয়। যদি শিকারীকে সে একটুও দেখিতে পায়, তাহা হইলে চক্ষুর নিমেষে তাহার সাবধান হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করে—এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। গরিলা একটা বন্দুক লইয়া তাহার মধ্যস্থানে ভগ্ন করিতে

পারে। সুতরাং এইরূপ অতি ভীষণ দুর্দ্দান্ত বন্যজন্তুকে বধ করিতে হইলে, অদৃশ্য থাকিয়া অতর্কিতে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিলেই নিজের প্রাণরক্ষা হয়। বালীর শক্তি ও পরাক্রমের বর্ণনায় বোধ হয় সে সেই গরিলারই সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ছিল। সুতরাং এইরূপ অদৃশ্য থাকিয়া অন্তরাল হইতে তাহাকে বধ করাতে রামের অন্যায় কার্য্য হয় নাই ইহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ইহা আর একস্থানে বাধে। বালী বলিল "তুমি নিজ স্বার্থসিদ্ধি হেতু সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য তাহার এই উপকার করিলে?" সুতরাং ইহা রামের শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন জন্য হয় নাই। ইহারও অন্য যুক্তিদ্বারা সমর্থন হইতে পারে। কাহারও গৃহপালিত বানর বা কুক্কুর ও তাহাদের সঙ্গিনী আছে। অন্য কোন বহিরাগত দুর্দ্দান্ত সেই জাতীয় পশু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া নির্ব্বল করতঃ, যদি সেই সঙ্গিনীটিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার প্রভু কি করেন? তখন তিনি সেই জন্তুটীকে সঙ্গে লইয়া সেই সঙ্গিনীটীকে উদ্ধার করিতে যান এবং যখন সে তাহা নিজ সামর্থ্যে তাহা করিতে সমর্থ হয় না, তখন প্রভু নিজশক্তি প্রদর্শন করিয়া অস্ত্রাঘাতে সেই আততায়ী জন্তুটীকে হত্যা করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করেন। এই আশ্রিত রক্ষা ক্ষাত্রধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। এক্ষেত্রেও সুগ্রীবের সঙ্গিনীঅপহরণকারী বালীকে সে আক্রমণ করিতে যাইলে প্রথমবারে রাম, সে তাহার নিজশক্তিতে এ কার্য্য করিতে পারে কিনা তাহাই দেখিলেন। সুগ্রীব পরাজিত হইয়া অতি দ্রুত পলায়ন করাতে রাম বালীকে বধ করিতে অবসর পাইলেন না। তখন দ্বিতীয়বার তাহাকে চিহ্নিত করিয়া (যাহাতে পূর্ব্ববারের ন্যায় তাঁহার ভ্রান্তি না হয়) সঙ্গে লইয়া যাইলেন, এবং তাহারা পরস্পর দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিলে, তখন সেই

গরিলার ন্যায় ভীষণ জন্তু বালীকে, রাম নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াই বধ করিলেন। সুতরাং এই দুর্দ্দান্ত ভীষণ জন্তু বধে রামের কার্য্য অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান না হওয়াই সঙ্গত। তাই বাল্মীকি বালীর মুখে বলাইলেন "বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ ॥" এবং বালী যে বানরই, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার রামের চরিত্রের আদর্শ অব্যাহত রাখিলেন। আমরা যথাস্থানে এই বানরের স্বরূপ দেখাইয়া বাল্মীকির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বানর কর্ত্তৃক সীতা অন্বেষণ

সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করিলে, এবং গগনমণ্ডল মেঘবিহীন হইলে, বর্ষারাত্রে অবসাদ ও কামশোক পীড়িত রাম, পাণ্ডুরবর্ণ আকাশ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল এবং শারদীয়া জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনী দেখিয়া, এবং সুগ্রীবকে কামাসক্ত হইয়া বানরী উপভোগে প্রমত্ত দৃষ্টে, অতিশয় আতুর হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ রামকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "আর্য্য! আপনি কামবশবর্ত্তী হইয়া অকারণ আপনার বীর্য্যহানি করিতেছেন কেন? কাম হইতে শোক জন্মে, তাহা হইতেই সমাধি বিনষ্ট হয়। সুতরাং আপনার সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শোক নিবারণে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আপনি চিত্তপ্রসাদ এবং শৌচাদি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিরন্তর অক্ষীণচিত্তে সমাধি অবলম্বনকরতঃ নিজের পৌরুষ বৃদ্ধির মূলীভূত সহায় এবং সামর্থ্যপ্রদ দেবপূজা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনার সনাথা সেই জানকীকে কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না। তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাসস্থান গুহাতে গমন করিলেন। ধনুর্ব্বাণ হস্তে লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের পুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বানরগণ ভয়ে ইতস্ততঃ কিল্ কিল্ শব্দ করতঃ পলায়ন করিতে লাগিল "ততঃ কিল কিলং চক্রু লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ॥" সুগ্রীব তখন মদমত্ত মদন বিমোহিত অবস্থায় ছিল। "বভূব মদমত্তশ্চ মদনে চ বিমোহিতঃ॥" লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় তথায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া

স্বগ্রীব প্রগাঢ়রূপে রুমাকে আলিঙ্গন করিয়া, কৃতান্তের ন্যায় লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে কম্পিত হইল।

দিব্যাভরণমালাভিঃ প্রমদাভিঃ সমন্ততঃ।

রুমান্তু বীরঃ পরিরভ্যগাঢ়ম্ বরাসনস্থো বরহেমবর্ণঃ।

দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্ত্বং বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রং ॥"

তখন সেই অবস্থায় স্থিত স্বগ্রীবকে দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া, ভীতি প্রদর্শন করতঃ তাহাকে সীতা অন্বেষণের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পরে স্বগ্রীব সমস্ত বানর-সেনা সংগ্রহ করিয়া নানাদিকে তাহাদিগকে পাঠাইল। অঙ্গদ ও হনুমান সহ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ বানরদিগকে দক্ষিণাভিমুখে প্রেরণ করিল। তাহাদিগকে বলিল "তোমরা দক্ষিণদিকে যাইয়া সমুদ্রতীরে পৌছিলে, শত যোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে যে দ্বীপ আছে সেখানে রাবণকে দেখিতে পাইবে।" তৎপরে হনুমানকেই সীতা অন্বেষণে সমর্থ বিবেচনা করিয়া স্বগ্রীব তাহাকে বলিল "হরিপুঙ্গব! তোমার গতি, বেগ বল এবং লঘুত্ব তোমার পিতা মহাতেজা পবনের সমান।" রাম স্বগ্রীবের কথা শুনিয়া ভাবে বুঝিতে পারিলেন হনুমানই কার্য্য সাধনে সমর্থ। তখন তিনি সীতার প্রত্যয়ের জন্য নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় তাহাকে দিলেন। তখন হনুমান নভোদেশে উত্থিত হইয়া গমন করিল। রাম আকাশমার্গে উত্থিত হনুমানকে কহিলেন "পবনতনয়! আমি তোমার উপরই নির্ভর করিয়াছি, স্বতরাং সীতাকে যেরূপে পাওয়া যায়, তুমি তাহা কর।"

হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ, স্বগ্রীব কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া, তাহারা বিন্ধ্যাচলের প্রথমাবধি সমস্ত প্রদেশ চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। "বিন্ধ্যমেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ

সমন্ততঃ ॥" তাহারা দক্ষিণদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় এক অনাবৃত দ্বার বৃহৎ বিল দেখিতে পাইল। তাহারা সেই দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল চক্রবাক, সারস, ক্রৌঞ্চ সকল সেই বিলদ্বার হইতে নির্গত হইতেছে। তাহারা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং সেই পক্ষীদিগকে সেই বিলদ্বার হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া জল প্রাপ্তির আশায় সেই বিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় চারিদিকে অন্ধকারে আবৃত থাকাতে তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া অনাহারে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। তখন অদূরে তাহারা একটী উজ্জ্বল আলো দেখিয়া তদভিমুখে যাইয়া স্বয়ংপ্রভা নামে এক তপস্বিনীকে দেখিতে পাইল। সেই তপস্বিনী তাহাদিগকে সেই বিল মধ্যে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে যাইতে তাহারা বিল হইতে নির্গত হইল। তখন সেই তেজদ্বারা প্রদীপ্তা স্বয়ংপ্রভা তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সেই ভয়ঙ্কর বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। এই সেই শ্রীমান্ বিন্ধ্যগিরি। এই প্রস্রবন, পর্ব্বত এবং মহাসাগর দেখ।" এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা অদৃশ্যা হইলেন। তখন সেই বানরেরা অনাহারে ক্লান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া, বিন্ধ্যগিরির পুষ্পিত বৃক্ষসমন্বিত প্রত্যন্ত পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল।

"বিন্ধ্যস্ত তু গিরেঃ পাদে সম্প্র-পুষ্পিতপাদপে।
উপবিশ্য মহাত্মানশ্চিন্তামাপেদিরে তদা "
ততঃ পুষ্পাতিভারাগ্রান্ লতাশতসমাবৃতান্।
দ্রুমান্ বাসন্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ ॥"

পরে লতাজালে সমাচ্ছাদিত বসন্তকালীন ফলবান বৃক্ষসকল পুষ্পভরে অবনত দেখিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইল, "তে বসন্ত-

মনুপ্রাপ্তঃ প্রতিপদ্য পরস্পরম্।" এবং বসন্তকাল উপস্থিত প্রায় দেখিয়া সুগ্রীবের আদিষ্ট নিয়মিতকাল অতীত হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা সকলেই ভূতলে পতিত হইল। তখন অঙ্গদ বলিল, "সুগ্রীবের আদেশ-ক্রমে বাহির হইয়া বিল মধ্যেই বাস করায় আমাদিগের একমাস পূর্ণ হইল। এক মাসমধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে সুগ্রীব এইরূপ আদেশ দিয়া যে আশ্বিন মাসে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহাও গত হইয়াছে। সীতার কোন তথ্য পাওয়া গেলনা। সুতরাং সুগ্রীব কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত যখন হইতে হইবে, তখন আমাদের এই সমুদ্রতীরেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ।" তখন তাহারা তাহাই স্থির করিয়া তাহাদের করুণ রোদনে সমুদ্রতীর প্রতিধ্বনিত করিল।

তাহাদের সেই করুণ আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া জটায়ু ভ্রাতা সম্পাতি গৃধ্র সেই বিন্ধ্যগিরির গুহা হইতে নির্গত হইয়া সেই নির্জীব মৃত-প্রায় বানরদিগকে দেখিয়া মনে মনে হৃষ্ট হইয়া বলিল "এই বানরগণ ক্রমে ক্রমে প্রাণত্যাগ করিলে, আমি ইহাদের এক একটি করিয়া ভক্ষণ করিব।" তখন বানরেরা সেই সম্পাতির বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে করিতে রামকে যে জটায়ু পক্ষী সাহায্য করিবার জন্য রাবণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও বলিল। তখন সম্পাতি ভ্রাতার কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিল "আমার পক্ষ সূর্য্যসন্তাপে দগ্ধ হইয়াছে, সেই জন্য আমার গতিশক্তি নাই; অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি আমাকে এই পর্ব্বত হইতে অবতারণ কর, আমি আমার ভ্রাতার সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত শুনিতে চাই।" তখন অঙ্গদ পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া গৃধ্ররাজকে নীচে অবতারিত করিল। অঙ্গদ যখন রাম সম্বন্ধে তাবৎ বৃত্তান্ত তাহাকে বলিল তখন সম্পাতি তাহাকে বলিল

"যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তখন আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। সেই ললনা কাঁপিতেছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার নিক্ষেপ করিতেছিলেন। "বিশ্রবার পুত্র বিশ্রবণের ভ্রাতা সেই রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কা নগরীতে বাস করে। সেই লঙ্কা নগরী এখান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যস্থ দ্বীপে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" তখন বানরগণ দগ্ধপক্ষ সম্পাতির নিকট রাবণের সন্ধান পাইয়া আনন্দিত হইল। সম্পাতি তাহাদিগকে আরও বলিল সে দগ্ধপক্ষ ও গতিশক্তিহীন হওয়াতে নিজের আহার সংগ্রহ করিতে পারেনা, সেই জন্য তাহার পুত্র সুপার্শ্ব নিয়মিত তাহার আহার যোগায়। কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে সে আহার না লইয়া আসাতে সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহার পুত্রকে তিরস্কার করে। তখন সুপার্শ্ব বলে যে সে আহার সংগ্রহার্থ পক্ষবিস্তার করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বার রোধ পূর্ব্বক অধোমুখে অপেক্ষা করিতে-ছিল, এমন সময় ভিন্ন অঞ্জন রাশির ন্যায় কোন পুরুষ একটী দীপ্তিমতী রমণীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন সে আহারার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে সে বিনীত ভাবে সাম উপায় দ্বারা তাহার নিকট পথ চাহিলে সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। তখন আকাশগামী দেবতা ও মহর্ষিগণ তাহাকে বলিয়াছিল যে "সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমেই জীবিতা রহিলেন; তুমি যখন তাহাকে ভক্ষণ কর নাই তখন তোমার মঙ্গল হইবে।"

"দিষ্ট্যা জীবতি সীতেতি অব্রুবন্ মাং মহর্ষয়ঃ।
কথঞ্চিৎ সকলত্রোঽসৌ গতস্তে স্বস্ত্যসংশয়ম্ ॥"

ইহা বলিয়া সম্পাতি বলিল আমি বহুপূর্ব্বে যখন আমার ভ্রাতা

জটায়ুর সহিত, ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্রবিজয়ে অভিলাষী হইয়া স্বর্গে গমন করি, তখন আমার পক্ষ সূর্য্য কিরণে দগ্ধ হয়।” “পুরাবৃত্রবধে বৃত্তে স চাহঞ্চ জয়ৈষিণৌ।” আমি দগ্ধ পক্ষ হইয়া এই বিন্ধ্যপর্ব্বতে পতিত হই। আমি কখনও কখনও অতিকষ্টে নিকটস্থ নিশাকর মুনির আশ্রমে যাইতাম। একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তপোবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে ইক্ষ্বাকু-কুলে রাম জন্মগ্রহণ করিবেন। রামের পত্নী সীতাকে রাক্ষস রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। রাবণ নানারূপ ভক্ষ্যবস্তু তাঁহাকে দিলেও তিনি তাহা ভক্ষণ করিবেন না। পরে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে পরমান্ন প্রদান করিবেন। তখন সীতা সেই পরমান্নের অগ্রভাগ তাঁহার জীবিত অথবা মৃত পতি ও দেবরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভূতলে স্থাপন করিবেন। পরে রামের দূতগণ সীতার অন্বেষণে এইস্থানে আসিলে তিনি আমাকে তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এবং আরও বলিয়াছিলেন যে যখন সেই দূতেরা আমার নিকট সে বিষয় অবগত হইবে তখনই আমি পুনরায় পক্ষদ্বয় লাভ করিব। আমি আমার পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম, “তুমি যখন মহর্ষিদের মুখে শুনিয়াছিলে যে “অদ্য রাম, সীতা বিরহিত হইলেন” তখন কেন তাঁহার উদ্ধারসাধন কর নাই? অতএব আমার প্রতি দশরথের যেরূপ স্নেহ ছিল, তুমি আমার পুত্র হইয়া তদনুরূপ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর নাই।” বানরদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পুনর্ব্বার সম্পাতির পক্ষদ্বয় উদ্গত হইল, এবং সম্পাতি গিরিশিখর হইতে উৎপতিত হইল। তখন বানরেরা হৃষ্টচিত্তে উল্লম্ফন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে সমুদ্রতীরাভিমুখে যাইতে লাগিল।

পরে বানরগণ কিরূপে সেই শত যোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় যাইবে চিন্তা করিয়া পরস্পরের লম্ফনের সামর্থ্য বিষয়ে বলাবলি করিতে লাগিল। অঙ্গদ বলিল সে একশত যোজন যাইতে পারে কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ আছে। তখন বৃদ্ধ জাম্ববান হনুমানকে নীরবে থাকিতে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন "তুমি পুঞ্জিকস্থলানাম্নী শাপভ্রষ্টা অঞ্জনা বানরীর গর্ভে পবনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার পিতার ন্যায় তোমার শক্তি আছে, সুতরাং তুমিই কেবল এই দুস্তর সাগর পার হইয়া সীতার অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ। তখন হনুমান পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থ মহেন্দ্রপর্ব্বতের উপর আসীন হইয়া একলম্ফে লঙ্কায় পৌছিয়া সমস্ত অট্টালিকা অনুসন্ধানের পর যখন সীতার সাক্ষাৎ পাইল না তখন অশোকবনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের নিম্নে একটী মানবীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। হনুমান লঙ্কায় যাইয়া পুনরায় নিজ স্বাভাবিক বানর মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুতরাং সে অনায়াসে সেই বৃক্ষোপরি আসিয়া সীতাকে দেখিতে লাগিল। ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে সীতাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল, সেইজন্য ঠিক চিনিতে না পারিয়া, সেই সীতানিক্ষিপ্ত কৌষেয় উত্তরীয়খানি যাহা সে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে আনিয়াছিল তাহাই সীতার নিকট নিক্ষেপ করিল। তখন সীতা তাঁহার সেই নিক্ষিপ্ত বস্ত্রখানি চিনিতে পারিয়া বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট বানরকে নীচে ডাকিলেন। হনুমানও তখন তাঁহার গাত্রে অন্য কৌষেয় বসন দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সীতা বলিয়াই স্থির করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল। সীতা বুঝিতে পারিলেন তিনি যে অভিপ্রায়ে এই উত্তরীয় বানরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা ফলপ্রসূ হইয়াছে।

রাম তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার অন্বেষণের জন্য কৌষেয় বস্ত্র সহিত এই বানরকে পাঠাইয়াছেন। পরে তাহার অঙ্গুলিতে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দেখিতে পাইয়া সে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই অঙ্গুরির পরিবর্ত্তে নিজ শিরোরত্ন হনুমানকে দিলেন। হনুমান তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রাবণকে দেখিবার জন্য স্থানে স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখন লঙ্কাবাসী রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া রাবণ সকাশে লইয়া গেল। রাবণ তাহার লাঙ্গুলে তৈলসিক্ত কার্পাস বস্ত্র জড়াইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে হনুমান লম্ফপ্রদানে লঙ্কার গৃহে গৃহে পতিত হওয়াতে সমস্ত লঙ্কাপুরীর স্বর্ণ অট্টালিকাদি দগ্ধীভূত হইল, পরে হনুমান সমুদ্রে আসিয়া সমুদ্র মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"দর্শয়িত্বা বলং ঘোরং বৈদেহীমভিবাদ্য চ।
প্রতিগন্তুং মনশ্চক্রে পুনর্ম্মধ্যেন সাগরম্॥"

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বানর সহ হনুমান কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাম হনুমানের নিকট সেই সীতাদত্ত শিরোরত্ন মণি দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিলেন, এবং বুঝিলেন এই বুদ্ধিমান্ বানর হনুমান সীতার দর্শন পাইয়াছে। পরে সুগ্রীব সমস্ত বানরসেনা সংগ্রহ করিলে, তাঁহারা সেই বানর কটক সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সেই দুস্তর সাগর অতিক্রমের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর আমরা মূক বানর কর্ত্তৃক মনুষ্যবোধ্য কথা বলা অসম্ভব বুঝিয়াই শুধু তাহাদের কার্য্যকলাপের প্রণালী দেখাইতে চেষ্টা করিব। অবশ্য বিষ্ণু অবতার রামের পক্ষে দেবতা বংশীয় বানরদের মনুষ্য-জনোচিত কেন, দেব-ভাষাতেও কথা বলা সম্ভব এবং বিষ্ণুত্ব

জ্ঞানে রামের তাহা অবোধ্যই বা হইবে কেন? কিন্তু আমরা যখন ঐতিহাসিক মনুষ্য রামেরই আলোচনা করিতেছি তখন সে প্রশ্ন উঠিতেই পারেনা। যাঁহারা রামায়ণের রামকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের এই আলোচনা অবশ্যই মনঃপুত হইবে না। বর্ষাকালের অপগমে শরৎকাল উপস্থিত হইলে, রাম সীতা বিরহে অত্যন্ত অধীর হইয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন তাহার আদিরসাত্মক বর্ণনা বাল্মীকি মনুষ্য রামের উক্তির যোগ্যরূপেই বিবৃত করিয়াছেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অনেকরূপে প্রবোধ দিলে, রাম তাঁহাকে সুগ্রীবের বাসস্থানে পাঠাইলেন। সুগ্রীব তখন মদোন্মত্ত হইয়া বানরীদের সহিত বিহার করিতেছিল। সেই সময় লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে অতর্কিতে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সুগ্রীব অতিশয় সন্ত্রস্ত হইল এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ সেই বানরীকে দেখিয়া তাহার গাত্রে সেই সীতা নিক্ষিপ্ত কৌষের উত্তরীয়খানি জড়াইয়া দিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া দূরে কোন অন্তরালে রাখিয়া আসিয়া, সুগ্রীবকে সঙ্গে লইয়া সেই লুক্কায়িত বানরীর অনুসন্ধান করিবার ভাণ করিয়া দেখাইলেন। তখন সুগ্রীব বুঝিল তাঁহাকে কি করিতে হইবে। অর্থাৎ সে যে বানরীর সহিত বিহার করিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্মণ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যেন সেই কৌষেয় বস্ত্রপরিহিতা নারীর রাবণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হরণই ইঙ্গিতে দেখাইলেন এবং পরে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ছলে সীতার অনুসন্ধানই যে তাহাকে করিতে হইবে, ইহাই ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইলেন। সে তখন তাহার বানর সহচরদিগকে তাহা তাহাদের জাতীয়ভাবে বুঝাইয়া দিল। অঙ্গদ ও হনুমান সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী বানর হওয়াতে তাহাদিগকেই

সেই বৃহৎকায় পুরুষের (রাবণের) সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে সেই পূর্ব্বদৃষ্টা বলপূর্ব্বক নীতা কৌষেয় বস্ত্রপরিহিতা নারীর অন্বেষণ জন্য দক্ষিণদিগাভিমুখে যাইতে ইঙ্গিত করিল। হনুমান পূর্ব্বে সেই নারীকে দেখিয়াছিল, তাই তাহার নিকট সেই কৌষেয় বস্ত্রখানি দিলে, রাম তাহা তাহার গাত্রে জড়াইয়া দিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি তাহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। তাহারা বিন্ধ্যগিরির নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল সেই পর্ব্বতের একটী বৃহৎ সুরঙ্গমুখ হইতে বহু জলচর পক্ষী জলার্দ্র হইয়া বাহিরে উড়িয়া আসিতেছিল, কেননা তাহাদের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু জলকণা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাই তাহারা জলাশয়ের অন্বেষণে সেই সুরঙ্গে প্রবেশ করিল। কিছুদূর যাইয়া তাহারা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই সুরঙ্গের অভ্যন্তরে পথহারা হইয়া নির্গত হইতে না পারিয়া অনেক দিন কাটাইল। তাহাদের ভাগ্যবশাৎ দূরে তাহারা একটী আলো দেখিতে পাইল। সেই আলোটী গতিশীল ছিল অর্থাৎ যেন চলিয়া যাইতেছিল। তাহাই অনুসরণ করিয়া তাহারা সুরঙ্গের অপরপার্শ্বস্থ স্থানে উপনীত হইয়া বহির্গমন করিয়াই দূরে সম্মুখে সমুদ্র দেখিতে পাইল আর পশ্চাতে সেই বিন্ধ্যগিরি যাহার অভ্যন্তরে তাহারা সুরঙ্গ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। এই আলোই সেই স্বয়ংপ্রভা নাম্নী তপস্বিনী, যাহাকে আলেয়া বলে। ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে স্থানে, সেই স্থানের পদার্থ পচিত হইয়া যে গ্যাস বা বায়ু জন্মে তাহা সময় সময় স্বতঃপ্রজ্বলিত হওয়াতে এইরূপ পার্ব্বতীয় সুরঙ্গের ভিতরে বা জলসিক্ত কান্তারে (marshy land) কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সুরঙ্গাভ্যন্তরে তাহারা বহুদিন

অনাহারে ক্ষুধার্ত্ত ও জলাভাবে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দুর্ব্বলদেহে মৃতকল্প অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হইল এবং সেই বেলাভূমিতে শয়ন করিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সেই বানরদের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া গিরিশিখরস্থ গুহা হইতে বার্দ্ধক্য বশতঃ ঝরিতপক্ষ মাংসাশী বৃদ্ধ শকুনি বাহির হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া সম্মুখে নিকটে আহার্য্য পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাতে ও তাহার উড়িবার শক্তির অভাবে অসামর্থ্যবশতঃ, লোলুপ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। এদিকে বানরেরাও তাহাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল; তাহাদের মনে হইল তাহারা তো দেহের দুর্ব্বলতা বশতঃ উত্থান শক্তি রহিত, এরূপ অবস্থায় ঐ মাংসাশী বৃহৎ শকুনি একে একে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। তখন তাহারা আর চীৎকার না করিয়া মৃত অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। এইরূপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। যখন তাহারা প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ভাবিতেছিল এই বুঝি শকুনি তাহাদের উপরে পড়ে, তখন সে কেন আসিতেছেনা, আর তাহারাই বা কতক্ষণ আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় এরূপ সংশয় চিত্তে থাকিতে পারে, তাই কৌতূহলী হইয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক বানর অঙ্গদ, তাহার অবসন্ন দেহকে চেষ্টা করিয়া কিঞ্চিৎ সবল করতঃ ধীরে ধীরে সেই পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিল। অঙ্গদ = অঙ্গং দদাতি ইতি। অঙ্গ + দা + ড = চেষ্টয়তি, অঙ্গয়তি। অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া শরীরের গতি করা। সে যুবরাজ অল্পবয়স্ক, তাই তাহার নাম অঙ্গদ দেওয়া হইয়াছে।

যখন অঙ্গদ পর্ব্বতশিখরে উঠিল তখন সে দেখিতে পাইল সেই শকুনি ঝরিতপক্ষ হওয়াতে উড়িতে অশক্ত, আর তখনই তাহার দৃষ্টি গোচর হইল সমুদ্রের মধ্যে দূরে একটি পর্ব্বতোপরি দ্বীপ। এই গিরি

শিখরে না উঠিলে, ভূমিতল হইতে এই দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভব ছিলনা। সে আরও দেখিতে পাইল সেই দ্বীপ হইতে আর একটী শকুনি উড়িয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সে অন্তরালে লুকাইল। কুতূহলপ্রিয় বানর দেখিতে লাগিল সেই উড্ডীয়মান শকুনি সেই বৃদ্ধ শকুনির নিকট অবতীর্ণ হইয়া, তাহার মুখের মধ্যে নিজ চঞ্চুপ্রবেশ করাইয়া তাহাকে যেন কি আহার প্রদান করিতেছে, আর তাহার মুখ হইতে সেই আহার্য্য দ্রব্যের কিছু কিছু অংশ নীচে পড়িতেছে। পাখীরা তাহাদের শাবকদের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া নিজ কণ্ঠনালীস্থ থলিয়াতে (pouch) জমাইয়া রাখে এবং তাহাই উদ্গীরণ করিয়া শাবকের মুখাভ্যন্তরে নিজ চঞ্চু সাহায্যে প্রবেশ করায়। আহার করান শেষ হইলে, সেই দ্বিতীয় অল্পবয়স্ক শকুনি অন্যত্র উড়িয়া যাইলে, অঙ্গদ কৌতূহলী হইয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল সেই শকুনির মুখভ্রষ্ট আহার্য্য পদার্থ পক্ক অন্ন। সুতরাং সে ইহা বুঝিতে পারিল যে এই দ্বিতীয় অল্পবয়স্ক শকুনি এই বৃদ্ধ শকুনির শাবক এবং সেই ইহার আহার্য্য সংগ্রহ করে, এবং সে যখন ঐ দ্বীপ হইতেই উড়িয়া আসিতেছিল তখন সেখান হইতেই ইহা সংগ্রহ করিয়াছে। এই বানরেরা বহুদূর ভ্রমণ করিত এবং অনেক তপস্বীদের আশ্রমেও যাইত। এই তপস্বীদের আশ্রমে তাহারা তপস্বিনীদের কর্তৃক এইরূপ পক্কঅন্ন প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছে এবং সম্ভবতঃ কোন কোন তপস্বিনী তাহাদিগকে স্নেহভরে তাহা আহার করিতেও দিয়াছে। তাই তাহার বুদ্ধিতে যখন আসিল ঐ দ্বীপ হইতে এই শকুনি এই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছে, তখন কোন মনুষ্যজাতীয়া তপস্বিনী নারী সেখানে অবশ্যই আছে। তাহারা তখন বুঝিতে পারিল, তাহা হইলে সেই কালবর্ণ বৃহদাকার পুরুষ যে নারীকে বলপূর্ব্বক লইয়া

যাইতেছিল, যাহা তাহার রোদনে ও হস্তপদ সঞ্চালনে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই নারী ঐ দ্বীপেই আছে। কেননা তাহারা জানিত রাক্ষসজাতীয় প্রাণীরা মাংসাদিই ভক্ষণ করে, অন্নপ্রস্তুত করিতে জানে না। অঙ্গদ হনুমানকেও পর্ব্বতশিখরোপরি ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং হনুমানও এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন তাহারা প্রস্রবণের জলে তৃষ্ণানিবারণ করতঃ বনজাত ফলমূলে ক্ষুধার শান্তি করিয়া সেই দ্বীপে কিরূপে সন্তরণ দ্বারা যাওয়া যাইতে পারে এবং কে কতদূর পর্য্যন্ত সন্তরণে গমনক্ষম তাহাই নিজেদের মধ্যে পরীক্ষা করিতে লাগিল। সমুদ্রমধ্যে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সন্তরণে গমন করিয়াই সমস্ত বানর ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের অসামর্থ্য দেখাইল। তখন হনুমান সন্তরণে পার হইয়া সেই দ্বীপে পৌছিল। সেখানে সে তন্ন তন্ন করিয়া কুটিরে কুটিরে সীতার অন্বেষণ করিয়া শেষে অশোকবনে সীতার দেখা পাইল। তখন সীতাকে, তাহার হস্তস্থ কৌষেয় বস্ত্র দেখিয়া ও সীতার পরিহিত বস্ত্রের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, সে চিনিতে পারিল। তারপর সীতা তাহার হস্তাঙ্গুলিতে রামপ্রদত্ত অঙ্গুরি দেখিয়া নিজের নিদর্শনস্বরূপ শিরের অলঙ্কার মণি দিলেন। হনুমান কুতূহলবশতঃ সেই কালবর্ণের বৃহদাকার পুরুষের সন্ধান করিতে যাইয়া রাক্ষসদের হস্তে ধৃত হইলে, তাহারা তাহার লাঙ্গুলে কিছু দাহ্য পদার্থ বাঁধিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। তখন সেই অগ্নির জ্বলনে কাতর হইয়া হনুমান সমুদ্রের জলের উদ্দেশে এক কুটিরের চাল হইতে অন্য কুটিরের চালে লম্ফপ্রদানে গমন করিবার সময় লঙ্কার সেই তৃণাচ্ছাদিত স্বর্ণাট্টালিকা সমস্ত দগ্ধ হইল। হনুমান সমুদ্রজলে পতিত হইলে তাহার লাঙ্গুলাগ্নিও নির্ব্বাপিত হইল।

সেই শাবক শকুনিটী যখন আহার সংগ্রহার্থ অধোমুখে শূন্যে উড্ডীয়মান অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিল তখন সে রাবণক্রোড়ে সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যজাতীয় কোমলদেহ প্রাণীটিকে দেখিয়া তাহাকে ভক্ষণার্থ লইবার জন্য তাহার (রাবণের) পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িয়া যাইতেছিল। রাবণ, হয় সন্তরণে সীতাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল অথবা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে খোদিত জলযানে (ডোঙ্গা বা Canoe) সীতাকে স্থাপিত করিয়া লইয়া যাইতেছিল। এখনও সমুদ্রমধ্যে দ্বীপবাসীরা ঐরূপ নৌকাই ব্যবহার করে। রাবণের হস্তস্থিত নৌকাচালন করিবার দীর্ঘ বংশ (নগি) পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হওয়াতে সেই শকুনিশাবক সীতাকে ছোঁ মারিয়া লইবার সুবিধা পাইতেছিল না। তারপর রাবণ যখন সীতাকে লঙ্কার কুটিরাভ্যন্তরে লইয়া গেল তখন আর তাঁহাকে ধরিবার কোন সুযোগ না পাইয়া সে বিফলমনোরথে যেন রিক্তহস্তেই ফিরিয়া আসিয়া যেন বাপকর্ত্তৃক তিরস্কৃতই হইল। রাবণ যখন সীতাকে লইয়া সেই সুরঙ্গের অভ্যন্তর হইতে বিন্ধ্যগিরির নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়াছিল তখন সম্পাতিও তাহার ক্রোড়ে সীতাকে দেখিতে পাইয়া আশা করিয়াছিল তাহার শাবক নিশ্চয়ই সেই কোমলদেহ প্রাণীটীকে ধরিয়া তাহার আহারার্থ লইয়া আসিবে, তাই বলা হইয়াছে সম্পাতিও রাবণক্রোড়ে সীতাকে নীতা হইতে দেখিয়াছিল। রাবণ সেই বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সুরঙ্গের অভ্যন্তর দিয়াই তাহার অপর পার্শ্বে যাতায়াত করিত। সেই লঙ্কাদ্বীপবাসীরা ঐ পথ জানিত এবং আলো বা অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাদের পথ দেখিয়া লইত। সেদিন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেও সেই শাবকশকুনি সীতাকে ধরিবার লোভে তৎপর দিনও সেই দ্বীপে যাইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। সীতা

কুটির পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া আহারার্থ অন্ন সিদ্ধ করিয়া তাহার কতক পরিমাণ স্বামী ও দেবরের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ভূমিতলস্পর্শী নিম্নশাখায় আচ্ছাদিত থাকা বশতঃ শকুনি তাঁহাকে ছোঁ মারিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া সেই নিক্ষিপ্ত অন্নই সংগ্রহ করিয়া তাহার পিতার জন্য লইয়া গেল। বৃদ্ধ শকুনি সেই উপাদেয় খাদ্য, মাংসের পরিবর্ত্তে, পাইয়া যেন তাহার হর্ষই প্রকাশ করিল। তাই তাহার শাবক দিনের পর দিন সেই দ্বীপ হইতে তাহার পিতার জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিত। এদিনও যখন সে ঐ দ্বীপ হইতে আসিতেছিল তখন অঙ্গদ তাহাকে দেখিতে পাইল, তারপর যাহা হইল তাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। জটায়ুও বৃদ্ধ, তাহার ভ্রাতাও বৃদ্ধ। তাহারা উভয়ে, ইন্দ্র বৃত্র বধ করিলে তাঁহাকে জয় করিতে স্বর্গে যাইয়া দগ্ধ হইয়া দগ্ধপক্ষ হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে, জটায়ুর রাজা দশরথের বন্ধু হইবার কারণ দেখাইয়াছিলাম, যে তাহাদের পক্ষে বজ্রপাত হইবার জন্য রাজার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, এখানে তাহা প্রমাণিত হইল। আবার সম্পাতিও বলিল সে রাজা দশরথের বন্ধু। জটায়ুরূপ দূরদর্শনে রাম সীতার তথ্য অবগত হইয়াছিলেন আবার সম্পাতিরূপ দুরদর্শনে বানরেরাও সীতার তথ্য জানিবার সূত্র প্রাপ্ত হইল। তাই সম্পাতিও প্রকারান্তরে রামের উপকার করিল। এই পাখীর নাম সম্পাতি দেওয়া হইল কেন? সম্পাতি—পত ধাতু পতনে সং সম্যক্ প্রকারে যাহার পতন হইয়াছে। পক্ষী খেচর, শূন্যেও উড়ে আবার ভূমিতলেও পতিত হয়। এই বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত গৃধ্রের পক্ষদ্বয় পালকশূন্য হওয়াতে সে উড়িতে পারিত না। সে উড়িতে পারিতেছে না কেন তাহাই দেখিবার জন্য যদি অঙ্গদ পর্ব্বতশিখরে না উঠিত তাহা হইলে

তাহারা সমুদ্রমধ্যে দ্বীপও দেখিতে পাইত না। তাই সম্পাতি নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য। আবার সুপার্শ্ব অর্থাৎ যাহার পার্শ্ব বা পক্ষদ্বয় সু বা শক্তিশালী। নতুবা সে প্রত্যহ সেই দূর সমুদ্রস্থিত দ্বীপ হইতে উড়িয়া আসিতে পারিত না। আর সম্পাতি যে ইন্দ্রদত্ত পরমান্নের কথা বলিয়াছিল তাহাও সে আনিতে না পারিলে অঙ্গদের দৃষ্টিতে তাহা আসিত না। তাই বাল্মীকি এই 'ঘোরান ফেরান' (round about) আখ্যায়িকায় পশুপক্ষীর ভাষণে প্রকৃত কার্য্য, যে কিরূপ স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হইয়াছিল তাহাই দেখাইলেন।

বানরেরা বলিয়াছিল সুগ্রীব দত্ত মেয়াদ আশ্বিন মাস তাহাদের গত হইয়াছে এবং বসন্ত কালের আগমনের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শরৎকালে লঙ্কার যুদ্ধ ও রাবণ বধ হয় নাই। কেননা বানরেরা দ্রুতগামী হইয়াও একমাসে সমুদ্রতীরে আসিয়াছিল। তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও প্রায় সেইরূপ সময় কাটিয়াছিল, তারপর রাম পদব্রজে আবার এই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ কোন সময়ে হইবার সম্ভব তাহা আমরা পরে বিশেষরূপে আলোচনা করিব। বলবান যুবক অঙ্গদ কেন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল না। আর হনুমান সেই সমুদ্র সন্তরণে পার হইল তাহার প্রকৃত রহস্য আমরা পরে ভেদ করিব। উপস্থিত বানর হনুমান, কেন এত শক্তিশালী ও তাহার নামই বা বাল্মীকি হনুমান রাখিলেন কেন তাহাই আমরা দেখাইব। যাহার হনু আছে সেই হনুমান। হনু অর্থে উচ্চ চোয়ালদ্বয়, নাসিকার দুই পার্শ্বে যে দুইটী-উচ্চ অস্থি আছে তাহারই নাম হনু। অন্য বানরজাতীয় প্রাণীর এই হনু নাই। এই হনুদ্বয় মনুষ্যেই আছে। তাই মনুষ্য, বাক্য নানারূপে উচ্চারণ করিতে পারে।

অর্থাৎ মুখের অভ্যন্তরের উপরিভাগে এই উচ্চ চোয়াল থাকাতেই তাহা প্রশস্ত ও গোলাকার এবং তাহারই জন্য, মনুষ্যের বাক্যের নানারূপ উচ্চারণ বশতঃ বিবিধরূপ শব্দের বিন্যাস হয়! বানরদের এই উচ্চ চোয়াল না থাকাতে তাহারা মাত্র কিল্ কিল্ কিচকিচ শব্দ করিতে পারে। যদি ডারউইনের (Darwin) ক্রম বিবর্ত্তনে নানারূপ ক্রমোন্নত জীবের উদ্ভববাদ সত্য হয়, তাহা হইলে বানরের পরেই এই উচ্চ চোয়ালদ্বয় সম্পন্ন জাতীয় প্রাণী বানর ও মনুষ্যজাতির মধ্যবর্ত্তী অবস্থা প্রকাশক বিবর্ত্তিত জীব, যাহার কোনরূপ জীবিত বা কঙ্কালের নিদর্শন এখনও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই হনুমানই সেই অমিল ধারা বা missing link between ape and man. বানর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী জীব। ইহা যে রামায়ণের যুগে ছিল তাহা এই বাল্মীকির বর্ণনাতেই বুঝিতে পারা যায় এবং তাৎকালিক দূরদর্শী ঋষিদের এই বিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। এখন যে বানরজাতিকে তাহাদের কালমুখ দেখিয়া লঙ্কাদগ্ধকারী মুখপোড়া হনুমানের বংশধর বলা হয়, তাহাদের হনু বা চোয়াল না থাকাতে তাহারা হনুমানের বংশধারা নহে। ইহা কীর্ত্তিবাস আদি অন্যান্য বাল্মীকির মূল রামায়ণের বিকৃতিকারক কবিদের কল্পনাপ্রসূত, কেননা হনুমানের লাঙ্গুলের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মুখে পুরিয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিবার কথা বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। এই মুখপোড়া, সাধারণ বানরেরই অন্য প্রকার জাতি। অগ্নিদগ্ধ পোড়ামুখ একটা জাতিতে সংক্রমিত হইতে পারেনা। এই হনুদ্বয় যাহার মহান্ সেই পুরুষ অত্যন্ত বলশালী হয়। তাই বাল্মীকি, রামকেও 'মহাহনু' বলিয়াছেন। এই বানর হনুমানও

অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল, এবং রামের সহিত যে প্রথম বাক্যালাপ করিয়াছিল তাহাকে রাম সংস্কৃত বা উন্নত ভাষাই বলিয়াছিলেন, আর এই হনুমানের কার্য্যাবলীও প্রায় এরূপ ভাবে আচরিত হইয়াছিল, যাহাতে তাহাকে প্রায় মনুষ্যের তুল্যই বলা যাইতে পারে। রাম সুগ্রীব বানরকেই তাঁহার বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা সে সেই বানর দলের যূথপতি ছিল। উপকারী বন্ধুরই গলা জড়াইয়া আমরা তাহাকে বন্ধু সম্ভাষণ করি। দুর্ব্বলপদ ব্যক্তি চলিতে অশক্ত হইলে অন্য কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া—তাহার সাহায্যে চলিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার সাহায্যকারীর গ্রীবা বা গলা তাহার নিকট সু হয়। তাই সুগ্রীব অর্থে বিপদে সাহায্যকারী বন্ধু। সুগ্রীব সীতা অন্বেষণের ও উদ্ধারের প্রধান সহায়—যেন তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াই রাম এই দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সুগ্রীব নামের যে অন্য আর একটী উদ্দেশ্য আছে তাহা ও বালীর নামের রহস্য আমরা যথাস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিব। আমরা রামের এই ঐতিহাসিক চরিত্রে বাল্মীকির রচনাচাতুর্য্যের দৃষ্টান্ত :মাত্র এখানে দেখাইলাম। সমুদ্র বন্ধন পর্য্যন্ত এই রূপই দেখাইব, তৎপরে জটায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রে সেতু বন্ধনের যে অন্য কি তাৎপর্য্য ও রহস্য আছে তাহা পরে দেখাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সমুদ্র বন্ধন

হনুমান লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বানরগণসহ কিষ্কিন্ধ্যায় রামের নিকট আসিয়া সেই সীতাদত্ত আভরণ প্রদর্শন করিলে রাম বুঝিতে পারিলেন সে সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে। তখন সুগ্রীবের সহিত সমস্ত বানর কটক লইয়া হনুমান প্রদর্শিত পথে তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করতঃ সহ্য ও মলয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন, এবং সম্মুখে মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে অবতরণ করিয়া সেই বেলা-বনপ্রাপ্ত সমুদ্রতটে বানর সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিয়া সমুদ্র পার হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমুদ্রতীরস্থিত বানরদের ভীষণ কোলাহলে সমুদ্রতট প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এদিকে রাবণ বুঝিতে পারিল যে রামই হনুমানকে সীতার সন্ধান জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তিনিই বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তাহার ভ্রাতা বিভীষণ তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল যে রামের সহিত বিবাদ না করিয়া তাঁহাকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই বিধেয়। বলদর্পিত রাবণ বিভীষণের কথা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে লঙ্কা হইতে দূরীভূত করিল। বিভীষণ শূন্যপথে রামের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিল। তৎপরে রাবণ একটী শুকপক্ষী রূপধারী রাক্ষসকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করিল। সে রাবণের শিক্ষিত

মতে তাহাকে বলিল "সুগ্রীব! তুমি রামের সাহায্য করিলে তোমার কোন সম্পদ বৃদ্ধি হইবে না এবং না করিলেও বিপদের আশঙ্কা নাই। বানরের তো কথাই নাই, দেবতাগণও মিলিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং তোমার কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত।" এই শুকরূপী রাক্ষস পরে বানরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া শূন্যপথে লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাবণকে সমস্ত বিবরণ বলে। রাম সমুদ্র লঙ্ঘনের চিন্তা করিয়া যখন কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না, তখন বিভীষণ সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া রামকে বলিল "আপনি সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন্। তাহা হইলে এই অপ্রমেয় মহামতি মহাসমুদ্র নিজের সগর হইতে উৎপত্তির কারণে আপনাকে (রামকে) আপনজ্ঞাতি বিবেচনা করিয়া, অবশ্যই আপনার কার্য্য সাধন করিবেন।"

"সমুদ্রং রাঘবো রাজা শরণং গন্তুমর্হতি।
খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেয়ামহোদধিঃ॥
কর্ত্তুমর্হতি রামস্য জ্ঞাতেঃ কার্য্যং মহামতিঃ॥"

সগর কর্ত্তৃক খনিত মহাসাগর নিজজ্ঞাতি রামের কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন।

পরে রাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া সমুদ্রের নিকট বর প্রার্থনার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বমুখ হইয়া নিজ-বাহুকে উপাধান করতঃ সমুদ্রতীরে শয়ন করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এইরূপ শয়নাবস্থায় তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। "অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখো কৃত্বা প্রতিশিশ্যে মহোদধেঃ॥" নীতিজ্ঞ রাম এইরূপে ত্রিরাত্র বাসকরতঃ সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। কিন্তু মন্দ বুদ্ধি সাগর, ব্রতাবলম্বী রাম কর্ত্তৃক সম্যক পূজিত হইয়াও তাঁহাকে দর্শন না দেওয়ায়, তিনি সমুদ্রের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎপরে রক্তবর্ণ চক্ষুতে

তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "সমুদ্র যখন এতাবৎকাল মধ্যে আমাকে দর্শন দিল না, তখন বোধ হয় তাহার গর্ব্ব হইয়াছে। আমি অদ্য সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলিব"। তৎপরে তিনি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সমুদ্রের উদ্দেশ্যে শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সৌমিত্রি লক্ষ্মণ তাঁহাকে না না শব্দে নিষেধ করিয়া তাঁহার ধনু ধারণপূর্ব্বক বলিলেন "আপনার ন্যায় ব্যক্তির ক্রোধপরবশ হওয়া অনুচিত। সুতরাং সমুদ্রের প্রাণীসকলকে এইরূপ সংক্ষুব্ধ না করিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা অন্য কোন উপযুক্ত উপায় স্থির করুন।" "ভবদ্বিধাঃ ক্রোধ বশং ন যান্তি দীর্ঘং ভবান্ পশ্যতু সাধুবৃত্তং॥" লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া রাম সাগরকে বলিলেন "আমার বাণসমূহ দ্বারা বারিরাশি নির্দ্দগ্ধ হইয়া পরিশুষ্ক হইলে, তোমার গর্ভ হইতে ধূলিপটল উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন এই বানর সকল তোমার উপর দিয়া পদব্রজেই পরপারে যাইবে। তুমি আমার পৌরুষ বুঝিতে পারিতেছ না।" এই বলিয়া রাম ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রহ্মদণ্ডনিভ বাণ, ধনুতে যোজনা করিলেন। তখন মহাসাগর ঊর্ম্মির বেগবশতঃ এত বেগশালী হইল যে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক যোজন পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন দেদীপ্যমান মনিরত্ন বিভূষণে বিভূষিত আঘুর্ণিত তরঙ্গমালা এবং মেঘবায়ু সমূহে সঙ্কুল সমুদ্র, জলরাশির মধ্যদেশ হইতে স্বয়ং উত্থিত হইতেছেন দেখা গেল। তখন সমুদ্র রামকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন "আপনি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পারিবেন তাহার উপায় বলিতেছি। আমি বানরগণের তরণের জন্য এরূপ কৌশল বাহির করিব যে আপনার সেনাগণ সমুদ্র পার হইবার সময় জলজন্তুগণ তাহাদের উপর উপদ্রব করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল, তাহার পিতার নিকট হইতে সর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণ, সামর্থ্যরূপ

বর পাইয়াছে। সুতরাং পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহ বানর আমার উপর সেতু প্রস্তুত করুক, আমি তাহা ধারণ করিব।” ইহা বলিয়া সাগর অন্তর্হিত হইলেন। তখন নলসহ বানরগণ মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন ও উৎপাটিত করিয়া সমুদ্রতীরে আনিতে লাগিল। তখন সেই বৃক্ষদ্বারা সেতুবন্ধন আরম্ভ করিয়া পঞ্চমদিনে সেই সেতু লঙ্কা নিম্নস্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিল। তখন রাম সেই বানরগণ সহ সেই সেতুর উপর দিয়া লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলে, বহুসংখ্যক বানর সন্তরণ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অনেকে সেই শতযোজন দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত সেতুর উপর স্থান না পাইয়া তীরেই অবস্থিত রহিল। তখন বানর সেনা নলনির্ম্মিত সেতুরদ্বারা মহার্ণব পার হইল, সুগ্রীব তাহাদিগকে বহু ফলমূল পূর্ণ তীরে সন্নিবেশিত করিল।

এই সমুদ্র বন্ধনের বর্ণনায় বিষ্ণু অবতার রামের আত্মবিস্মৃতি-বশতঃ সমুদ্রের উপাসনা, আবার সেই বিস্মৃতি অপগমে নিজের বিষ্ণুত্ব জ্ঞানে, তাহাকে শোষণ করিবার শাসনে, সমুদ্রের রত্নাদি-বিভূষিত স্বমূর্ত্তিতে রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনান্তর বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নলের সেতুবন্ধন যোগ্যতার উল্লেখ ও তাহার শতযোজন দীর্ঘ ও দশযোজন বিস্তৃত সেতুবন্ধন ইত্যাদি সংস্কার বদ্ধ পাঠকের বেশ শ্রবণপ্রীতিকর ও বিশ্বাস্য হইলেও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট ইহা আস্থা প্রাপ্ত হয় না। বাল্মীকি দুইশ্রেণীর শ্রোতারই উপভোগ্য করিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। রাম যে বিষ্ণু অবতার তাহা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণের অজ্ঞাত ছিল। নতুবা তিনি রামের শর-দ্বারা সমুদ্র শোষণ রূপ বাতুলের কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ হইয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা যেরূপে সমুদ্রবন্ধন সম্ভব সেই উপায় উদ্ভাবন

করিতে বলিলেন কেন? সুতরাং মনুষ্যরাম কর্ত্তৃক কিরূপ মনুষ্যসাধ্য কার্য্যদ্বারা এই সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইয়াছিল তাহা এই বাল্মীকির বর্ণনা হইতেই দেখাইব।

রাম সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গী বহু বানরের ঘোর কলরব লঙ্কায় পৌছিলে, রাবণ তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদের সহিত রামের আগমন বুঝিতে পারিয়াছিল। শতযোজন পথ অতিক্রম করিয়া দেবতাজাত বানরের শব্দই লঙ্কাতে যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। সাধারণ বানরের কলরব যতই উচ্চ হউক না কেন তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং বোঝা যায় এই লঙ্কা দক্ষিণ সমুদ্রের তীর হইতে বেশী দূরে ছিলনা। নতুবা একটা শুক পাখী এই শতযোজন ব্যাপী সাগর পার হইয়া পুনরায় লঙ্কায় যাইতে পারিত না। শুক পক্ষীকে যে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই উচ্চারণ করিতে পারে। রাবণ তাহার নিজ ভাষাই তাহাকে শিখাইয়াছিল, তাই সে বানর সুগ্রীবকে তাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর আদিম মনুষ্যজাতির ভাষা রামের অবোধ্য হইলেও তাহা হয়তো তাহাদেরই প্রায় সমকক্ষ উন্নতশ্রেণীর বানর জাতিদের কিছু কিছু বোধ্য হইতে পারে। আর এই শুকপক্ষী পাঠাইয়া রাবণ রামকে জানাইয়াছিল এই সমুদ্রপথ দুস্তরনীয়, কেবল পক্ষীরাই ইহা উত্তীর্ণ হইতে পারে—উদ্দেশ্য ইহাতে যদি রাম ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাই যেন রাক্ষস, শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। যদি কোন রাক্ষস সমুদ্র সন্তরণে পার হইয়া আসিত, তাহা হইলে রাম এবং তাঁহার সঙ্গী বানর, সেই সমুদ্রপথ যে মনুষ্যেরও সন্তরণ সাহায্যে উত্তরণীয় হইতে পারে, ইহা অনুমান করিয়া সেইরূপ চেষ্টা করিতে পারেন এই আশঙ্কাতেই সেই শুকপক্ষীকে রাবণ পাঠাইয়াছিল।

বিভীষণ যে শূন্যপথে রামের নিকট আসিয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে।

"আজগাম মুহূর্ত্তেন যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥
'তং মেরুশিখরাকারং দীপ্তামিব শতহ্রদাম্।
গগনস্থং মহীস্থাস্তে দদৃশু র্বানরাধিপা ॥"

বিভীষণ লঙ্কা হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে রামের নিকট আসিল, বানর যূথপতিগণ তাহাকে আকাশস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় দেখিতে পাইল। এই বিভীষণ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার স্বরূপ দেখাইব কেন সে আকাশপথে আসিয়াছিল। বিভীষণ রামের সাক্ষাতে সুগ্রীবকে বলিল সাগরের উপাসনা করিতে। আদিম মনুষ্যজাতীয় রাবণভ্রাতা বিভীষণ বিতাড়িত হইয়া রামের সহিত মিত্রতা করিল। তাহার ভাষা রামের অবোধ্য হইবে বুঝিতে পারিয়াই যেন সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া রামকে ইঙ্গিতে জানাইল সমুদ্রের উপাসনা করিতে। আদিম জাতিরা তৎকালে এবং এখনও অনেক ভূখণ্ডে এইরূপ দেবতার উপাসনা করে। পক্ষান্তরে তাৎকালিক সভ্য আর্য্যজাতির মধ্যেও যে এইরূপ কুসংস্কার ছিল, তাহা রামের সমুদ্র উপাসনাতেই বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্ত্তবাসী রাম কখনও সমুদ্র দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী সরযূতে অবগাহন করিতে যাইয়া কথঞ্চিৎ সন্তরণশিক্ষা করা সম্ভব হইলেও, এই বিশাল সমুদ্র দেখিয়া তাহা সন্তরণে পার হইয়া সেই লঙ্কাদ্বীপে পৌছিবার শক্তি বানর হনুমানের থাকিলেও, যে তাঁহার সাধ্যাতীত তাহা বুঝিতে পারিয়াই, সেই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সমুদ্রকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন—তিনরাত্রি কুশাসনে মৌনী হইয়া শয়ন করিয়া। কেননা তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট ইতিপূর্ব্বে

শুনিয়াছিলেন তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যবংশীয় রাজা সগরের ষষ্টিসহস্র-পুত্র যে ভূমিতল খনন করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রপৌত্র ভগীরথ কর্ত্তৃক হিমালয় হইতে আনীতা গঙ্গার সলিলে প্লাবিত হইয়াই সাগরের উৎপত্তি। সগরস্য অপত্য=সাগর। সুতরাং সাগর তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞাতি। তাই তিনি, প্রেত-লোকেস্থিত মৃত পিতৃ-মাতৃ উদ্দেশে যেমন লোকে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে, তেমনই এই পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণাদি উপাসনা করিয়া তাহার (সাগরের) সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। যখন তাঁহার এই কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারাও সাগরের আসন টলিল না, তখন আবার রামের বিষ্ণুত্ব আবির্ভাব হওয়াতে, তিনি সেই জ্ঞাতির কথা বিস্মৃত হইলেন—(কেননা তাঁহার নিজের মনুষ্যজ্ঞানেই সাগর তাঁহার জ্ঞাতি ছিল এবং সে জ্ঞাতিবধ, ধার্ম্মিক রামের পক্ষে অধর্ম্মই হইত) তিনি ব্রহ্মদণ্ড-নিভ বান ধনুতে যোজনা করিয়া সাগরকে শাসন করিতে উদ্যত হইলেন—আর তখনই বিষ্ণু কর্ত্তৃক শোধন ভয়ে ভীত সাগর নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া রামের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় উপস্থিত হইল। পক্ষান্তরে মনুষ্য রাম যখন এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সমুদ্রের উপাসনা সত্ত্বেও তাহার সাহায্য না পাইয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার বিবেকবুদ্ধি উদয় হওয়াতেই, তিনি তাঁহার এই বাতুলোচিত কার্য্যে যেন লজ্জিত হইয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপ মনুষ্য-সাধ্য কার্য্য দ্বারা এই সমুদ্রে সেতুবন্ধন করা সম্ভব হয়। তাই যেন তাঁহার সুমিত্র লক্ষ্মণ—তাঁহাকে বলিলেন নিজের বুদ্ধি ও পৌরুষের সাহায্যেই এই দুষ্কর কার্য্যসাধন করিতে প্রয়াস করুন। দৃঢ়

অধ্যবসায়সহ পৌরুষসহকারে, ধীরবুদ্ধিতে কাজ করিলে দৈবও সহায় হইয়া সেই কার্য্যে সফল হইবার পথ প্রদর্শন করে। জগতে কত কত বৃহৎ আবিষ্কার, অধ্যবসায়ী পৌরুষসম্পন্ন মেধাবী মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক হইয়াছে। রাম যেন একটা কঠিন সমস্যাসাধনে নিমগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ একাগ্রচিত্তে কোন জটিল সমস্যার চিন্তা করিতে থাকিলে তখন বুদ্ধিই তাহার সাধন পথ দেখাইয়া দেয়—যেমন অনেকে দেবতার নিকট হত্যা দিয়া স্বপ্নাদেশে অনেক ঔষধের বিষয় জানিতে পারে। রাম যখন এইরূপ অবস্থায় তন্ময় হইয়াছিলেন তখন ঝটিকার আবির্ভাব হওয়াতে সমুদ্রবক্ষে বৃহৎ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া এক যোজন পর্য্যন্ত বেলাভূমি সমুদ্রজলে প্লাবিত হইল। আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে উত্থিত কতকগুলি বংশ বৃক্ষ রামের গাত্রে আঘাত করাতে রামের চমক ভাঙিল, তিনি দেখিলেন সমুদ্র-তীরে পতিত কতকগুলি বংশবৃক্ষ তরঙ্গ কর্ত্তৃক নীত হইয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হইয়া সমুদ্রগর্ভেই যাইতেছে, পুনরায় সেই তরঙ্গেই বাহিত হইয়া বেলাভূমিতে আসিতেছে। রামের জটিল সমস্যার সাধন হইল; সেই বাঁশের ভাসমান অবস্থা দৃষ্টে—কিরূপে তিনিও তো তীরস্থ বন হইতে বানরের সাহায্যে সেই বংশ উৎপাটন করিয়া তাহা লতা দ্বারা বন্ধন করতঃ ভেলা প্রস্তুত করিলে, তাহা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হইতে পারে, এবং সেই সমস্ত ভেলা পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে পারেন? ইহাই "মেঘবায়ু সঙ্কুল আঘুর্ণিত উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র" মধ্য হইতে মূর্ত্ত সমুদ্রের উত্থান ও রামকে শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নলের বিষয় জ্ঞাত করণের তাৎপর্য্য। নল শব্দের অর্থ বংশবৃক্ষ। নলং-বন্ধে-যাহার গাঁইট আছে ও অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে-তৃণবিশেষ; দীর্ঘবংশঃ। দীর্ঘবাঁশ। যেন এই বংশই, নল

বানররূপে রামকে বলিল আমি সাগরের উপর সেতু বন্ধন করিব। এখানে অন্য বানরের কথা না বলিয়া নল বানরের কথাই সমুদ্র বলিল। এই বংশ বৃক্ষের মূল, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে না যাইয়া তাহার উপরেই থাকে, সুতরাং তাহা বলশালী বানরগণ কর্তৃক সহজেই উৎপাটিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যবৃক্ষ সকলের মূল ভূমিতলে দৃঢ়নিবদ্ধবশাৎ তাহা উৎপাটন সহজসাধ্য নহে। রামের নিকট এক অসি ব্যতীত বৃক্ষ কাটিবার অস্ত্র কুঠার বা করাত ছিল না। তাই নল বা বংশের উল্লেখ হইয়াছে। তখন রাম সেই সমুদ্র তীরস্থ বন হইতে বংশ বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া লতাদ্বারা তাহা বন্ধন করতঃ ভেলা প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই ভেলা পর পর সজ্জিত করিয়া পাঁচ দিনে সেতুবন্ধন করতঃ তাহা লঙ্কার তীরে সংযোজন করিলেন। সুতরাং এই ভেলা প্রস্তুত ও তাহা সংযোজন করিতে যদি তাঁহাদের মাত্র পাচদিন সময় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে লঙ্কার দূরত্ব শত যোজন হওয়া সম্ভব কিনা তাহা সুধী ব্যক্তির বিবেচ্য। তারপর বানরগণের অনেকে, সেতুর উপর স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে সন্তরণে সমুদ্রপার হইয়াছিল। "সলিলং প্রপতন্ত্যন্যে মার্গমন্যে প্রপেদিরে।" এই লঙ্কার অবস্থান সম্বন্ধে আমরা দেখাইয়াছি। আর এই সমুদ্রবন্ধনের রহস্য আমরা দেখাইব।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জটায়ু, কবন্ধ ও বানরদের স্বরূপ

জটায়ু বধ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রবন্ধন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী অধ্যায়ে আমরা মনুষ্য রামের যেরূপ মানব সুলভ কার্য্যে ও চেষ্টায় সীতার অন্বেষণ ও সমুদ্রে সেতুবন্ধন পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছিল তাহা দেখাইয়াছি। আদিম মনুষ্যজাতীয় রাবণ কর্ত্তৃক কিরূপে মানবী সীতা অপহৃতা হইয়া সমুদ্রদ্বীপস্থ লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেন এবং কিরূপে রাম বন্যপশু বানরদিগকে, বসন্তকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ও তাহাদের হাবভাব বিষয়ে বিশেষ রূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে, লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। কিন্তু আমরা সীতা ও রাবণের যে অন্যরূপ দিয়াছি অর্থাৎ জ্যোতিরূপী সীতা, রবরূপী রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছিলেন, তাহার স্বপক্ষে এই পূর্ব্ব বর্ণিত অধ্যায় সমূহে বর্ণিত বিবরণ হইতে কিরূপ সমন্বয় হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ যোগাশ্রয়ী সাধক রাম কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই আচরণে বা সাধনায় কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাই দেখাইবার প্রয়োজনে আমরা, প্রথমে রামের বনগমন হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র বন্ধন পর্য্যন্ত, এই অধ্যায়ে দেখাইব।

বিশ্বামিত্রগুরু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে সাধন করিয়া মনঃসংযমে সিদ্ধ হইয়া ও মনের একাগ্রতা লাভে অভ্যস্ত হইয়া, রাম, রাজর্ষি

জনকগুরুর প্রদর্শিত অয়ন বা পথে, আত্মজ্যোতি বা নিজ দেহস্থিত আত্মার জ্যোতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। তখনও তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই; সুতরাং রাজকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া, জনকাত্মজা সীতা ও অযোনিজা সীতাসহ দ্বাদশবর্ষকাল অযোধ্যাপ্রাসাদে নির্লিপ্ত অবস্থাতেই বাস করিয়া, পরে স্বেচ্ছাতেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং সাধনাতে পূর্ণসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যেই রাজসম্পদ ও তদনুসঙ্গিক ভোগ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করতঃ সহাস্যবদনে সমস্ত অসার ধনসম্পদ বিতরণ করিয়া, নিঃসম্বলে বনযাত্রা করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে বনবাসে না যাইতেও পারিতেন, কেননা ইক্ষ্বাকুকুলে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যলাভে অধিকারী এই চিরন্তনপ্রথা,—বশিষ্ঠ ঋষিই বলিয়াছিলেন। সুতরাং কৈকেয়ীর এই অভিলাষ, তাঁহার বনগমনের সুযোগই করিয়া দিল, অন্যথা পুত্রবৎসল রাজা দশরথ তাঁহাকে নয়নান্তরাল করিতেন না। বনে গমন করিয়া তিনি বরাবরই শ্রেষ্ঠ ঋষিদের সহযোগে থাকিয়াই নিজ সাধনপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যোগ্য অধিকারী হইলেন, তখন ব্রহ্মবিদ্ ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই ক্রম-সাধনে-অগ্রসরের সাহায্য হইয়াছিল—সুতীক্ষ্ণ ও শরভঙ্গ ঋষির উপদেশপ্রাপ্তিতে এবং তাঁহারা তাঁহাকে অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের পথ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন তখনই, যখন তাঁহারা রামকে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সেই যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান অগস্ত্য তাঁহাকে অধিকারীর যোগ্য বুঝিয়াই, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। রাম সেই উপদেশানুযায়ী সাধন ও অভ্যাস করিলে তাঁহার সাধ্য ও কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার বিঘ্ন ঘটিল—কতকগুলি স্বার্থপর তাপসের চাটুকারের

ন্যায় বাক্যজালে জড়িত হইয়া। এই তপস্বীরা শাপদ্বারা রাক্ষসবধে নিজেদের তপস্যার হানি হইবে এই ক্ষতি স্বীকার না করিয়া, প্রজারক্ষক নৃপতি রামের সাহায্যে তপস্যার বিঘ্নকারক রাক্ষসবধের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, রামও তাঁহার বানপ্রস্থোচিত সাত্ত্বিক ধর্ম্ম ক্ষণেকের তরে বিস্মৃত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে আচরিত ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে সেই রাক্ষসদিগের বধসাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। প্রতিজ্ঞাপালনরূপ সত্যধর্ম্মকেই আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করেন। কাজেই এই সত্যরক্ষারূপ পণ, তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ হওয়াতে তিনি অগস্ত্যঋষির আশ্রমে থাকিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ অপেক্ষা নিজের সত্যপালনরূপ ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, তাঁহার আশ্রম ত্যাগকরতঃ গভীর রাক্ষসঅধ্যুষিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি জাবালি ঋষিকেই এই সত্যপালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহা বলিয়াছিলেন। তাঁহার মঙ্গলকামিনী ভার্য্যা সীতা তাঁহার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সীতার উপদেশ তাঁহারই বিবেকবাণী। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তিনি সেই রাক্ষসবধরূপ প্রতিজ্ঞাপালনের অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার মনে কলুষের দাগ পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। সেই অবস্থায় একদিন তাঁহার মনশ্চক্ষে কোন "মনোজ্ঞা" রমণীর প্রতিবিম্বের উদয় হওয়াতে তাঁহার মন কিছু বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, আর তখনই যেন সীতারূপ জ্যোতিও তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হয় হয় এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি সে যাত্রা সেই কামনারূপিনী শূর্পণখাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াই নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। বিকটাকারা শূর্পণখার বিভৎসরূপকে "মনোজ্ঞা"

বলিবার তাৎপর্য্য ইহাই। তাই তাঁহার চতুর্দ্দশকরণ, প্রখররূপে দূষিত হইয়াও তাঁহার পদস্খলন সাধন করিতে পারিল না; কিন্তু ইহাতে ও তাঁহার অব্যাহতি হইল না। মনের সেই প্রতিজ্ঞাপালন রূপ দাগ বা মল একবারে মুছিয়া না যাওয়াতে মন কখন কখন সেই দাগে মলিন হইবার উপক্রম হইত, যেমন ভস্মাবৃত অগ্নি অনুকুল দাহ্য পদার্থ পাইলেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই অনুকূল পদার্থ আসিল মারীচরূপে—যাহার নির্ম্মূল বিনাশ সাধন রাম ইতিপূর্ব্বে করিতে পারেন নাই। কামরূপী মারীচই আসিল সেই অস্বাভাবিক প্রলোভনীয় মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহার পদস্খলনের কারণ হইয়া। রামের মনের এইরূপ ক্ষণচাঞ্চল্য ও ক্ষণস্থায়ী স্থৈর্য্যের অবস্থা দেখিয়া যেন বৈদেবী সীতারূপ জ্যোতিই, তাহার রামহৃদয়ে, স্থিতি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, রাম প্রকৃত তাহাকেই চাহে কিনা, তাই পরীক্ষার জন্য, জানকীর মুখে বলিল "ঐ অলৌকিক সুদৃশ্য মৃগটীকে আমার ক্রীড়ামোদ চরিতার্থ করিবার জন্য জীবন্ত ধৃত করিয়া আনুন"। তাই বাল্মীকিও এস্থানে বলিলেন "পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যাঃ স্পৃহামুল্লসিতামিমাম্"। সীতার কথা শুনিয়া লক্ষ্মণরূপ-রামের পৌরুষ তাঁহাকে মারীচের স্বরূপ দেখাইয়া অর্থাৎ সে, কামনারূপ রাক্ষসই, মায়ায় মৃগরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল—যেন রামের নিজের বিবেক বুদ্ধির উদয়েই, তিনি ক্ষণিকের জন্য এইরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাম বলিলেন 'সে মৃগ হইলেও মরিবে রাক্ষস হইলেও মরিবে'। তিনি ভার্য্যা জানকীর তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য, একটী নিরীহ প্রাণী তাঁহাদের কোন অনিষ্ট না করিয়া নির্ভয় চিত্তে যখন ক্রীড়া করিতেছিল তখন তাহাকে ধৃত করিতে সমর্থ না হইয়া বধ করিলেন। রাম জাবালিকে বলিয়াছিলেন তিনি বনবাসে

তপস্বীর ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ফলমূলাহারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, তাঁহার পিতৃসত্য পালন করিবেন। কিন্তু তিনি যে প্রভূত জীব হত্যা করিয়া তাহার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন তাহা সীতার উক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং বাল্মীকিও বলিয়াছেন যে, রাম মারীচ বধ করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে আহারার্থ আর একটী প্রকৃত মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং তিনি সীতা কথিত বিনাহিংসায় জীব বধের ত্রুটি করেন নাই। এখানেও তিনি বিনা উদ্দেশ্যেই (আহার্য্য সংগ্রহের জন্যই মাংসাশী জীব বধ করে) সেই ক্রীড়ারত প্রাণীটী বধ করিলেন। ইহা যেন বাল্মীকির সেই রতিক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চ বধের করুণ দৃশ্যে তাঁহার মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণী “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ” রই পুনরুক্তির ন্যায় রামের কিরূপ প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইল তাহাই দেখান হইল। ক্রৌঞ্চ-অবধীঃ নিষাদের প্রতিষ্ঠালোপের বিষয় তাঁহার অবগতি না থাকিলেও সেইরূপ নৃশংস হত্যার ফলে কিরূপ প্রতিষ্ঠালোপ হয় তাহা রামের কার্য্যে তিনি দেখাইলেন। রাম সাধন বলে সীতারূপ জ্যোতি দর্শন লাভে যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার লোপ হইল সীতার অন্তর্দ্ধানে—এই বিনা হিংসায় প্রাণী হত্যার পরিণাম ফলে। সীতার ভবিষ্যৎবাণীও ফলপ্রসূ হইল, আর বাল্মীকির ভবিষ্যৎ বাণীও পূর্ণ হইল। রামের মাত্র জ্যোতি দর্শনই হইয়াছিল। আত্মজ্ঞান হয় নাই। আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, অন্য প্রাণীতেও সেই আত্মার অধিষ্ঠান আছে ইহাও উপলব্ধি হয়, কেন না আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজিত। এরূপ অবস্থায় অন্য প্রাণী বধ করিতে প্রবৃত্তি হওয়া তো দূরের কথা, নিজের আত্মাকে রক্ষা করিতে যে প্রেরণা আসে সেই প্রেরণাতেই লোকে, আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত অন্য প্রাণীর উদ্ধার সাধনের জন্য নিজের

হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই ধাবিত হয়; তখন তাহার নিজের মৃত্যুভয়ও থাকে না এবং নিজের প্রাণহানিতে তাহার পোষ্যবর্গের কি অবস্থা হইবে সে চিন্তা করিবারও অবকাশ থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই যখন জলমগ্ন বা অগ্নিসংযুক্ত গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রাণীর অরুন্তুদ করুণ রোদন সহস্রলোকের মর্ম্মে তাহা আঘাত না করিলেও, একটী লোককে আকৃষ্ট করিয়া যেন তাহাকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারই প্রেরণায় সে নিজ শুভাশুভ বিবেচনার অবসর না পাইয়াই, যেন তাহার নিজ আত্মারই উদ্ধারার্থ জলে বা অগ্নিমধ্যে ঝম্প দিয়া পড়ে। লোকে দান করে কি উদ্দেশ্যে? আর্ত্তকে এক পয়সা দিলে ভগবান আমাকে দশ পয়সা দিবেন। যে অন্যকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিত্তসঞ্চয় করিয়াছে, সে হয় দেবতার পূজা, ভোগ দেয় তাঁহার তুষ্টিসাধন করিয়া সেই নিজকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইবার বাসনায়, অথবা কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, আর তাহা যেন দাঁড়ির পাল্লার একদিকে রাখিয়া অন্যদিকে সেই পাপকার্য্যটীকে স্থাপিত করিয়া মাপ করিবার ন্যায় তাহাদের গুরুত্বের মাপ করে। আবার যাহার অগাধ বিত্ত আছে, সে মনে করে ইহলোকে আমার কোনই অভাব নাই, সুতরাং উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু দান করিলে ভগবান্ আমাকে স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে স্থান দিবেন। এইরূপ একটা না একটা কামনাতেই লোকে দান করে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত যে তৃষ্ণার্ত্ত সৈন্যাধ্যক্ষ (Sir Philip Sydney) তাঁহার হস্তস্থিত জলের পাত্রের দিকে একটী নগণ্য আহত তৃষ্ণাতুর সৈনিকের সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি দেখিয়া, সেই জলের পাত্রটী নিজের মুখে না দিয়া তাহার মুখেই ধরিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য দান নহে। তিনি তাঁহার তৃষ্ণার যন্ত্রণা মর্ম্মে মর্ম্মে

অনুভূতি করিয়া সেই সৈনিকের মুখে তাহা প্রতিফলিত দেখিয়াই নিজের তৃষ্ণা ক্ষণতরে ভুলিয়া, যেন তাঁহারই প্রতি-আত্মাকে তাহা সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে দেহস্থ আত্মাই কখন কখন স্থানবিশেষে নিজে যেন প্রকাশিত হইয়াই দেহীকে তাঁহার সর্ব্বদেহে সমভাবে বিদ্যমানতা দেখাইয়া দেন। রামের এইরূপ আত্মানুভূতি হইলেও তিনি অকারণে জীব হত্যা করিতে পারিতেন না। এই আত্মানুভূতি না হইলে বুদ্ধদেবের মুখ হইতে সেই অমূল্য সর্ব্বজনশ্রুত বাণী "অহিংসা পরমধর্ম্ম" নিঃসৃত হইত না। সুতরাং ত্রেতার ও কলিযুগের বিষ্ণু অবতারের মধ্যে কত পার্থক্য তাহা ইহাতেই উপলব্ধি হয়। আর একজন দ্বাপরের বিষ্ণু অবতার, ক্ষত্রিয় বংশে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াও, আর একজন ক্ষত্রিয় রাজা কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া, ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে তাহাকে অস্ত্রধারণের অবসর না দিয়াই,* তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত মৃগশিকারে অভ্যস্ত-ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, পূর্ব্বাপর চিরন্তন অভ্যস্ত এই অহিংসায় জীববধ দেখিয়াই কলিযুগের ক্ষত্রিয় বংশীয় শাক্যসিংহ মর্ম্মাহত হইয়া, এবং জরাব্যাধিগ্রস্ত লোকের মর্ম্মন্তুদ করুণ রোদনে ব্যথিত হইয়া, লোকের ও প্রাণীদের এইরূপ পরিণতির নিরাকরণ জন্য, যুবা বয়সে স্ত্রী, পুত্র রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ যোগাচরণে 'সিদ্ধার্থ' হইয়া, শুধু তথাগতই হইলেন না, পুরাণকর্ত্তাদের কৃপাদৃষ্টিতে বিষ্ণু অবতাররূপেও প্রতিপন্ন হইলেন। ত্রেতাযুগের বিষ্ণু-অবতারের এইরূপ একটী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ মনুষ্যহত্যার বিবরণ বাল্মীকি তাঁহার উত্তরাকাণ্ডে বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠক তাহা যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন। তাহা

* ইয়োরোপে এখনও কেহ কাহারও কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলে, তাহাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহাকে তাহার অস্ত্র পছন্দ করিয়া লইতে বলে।

হইলে ইহাই অনুমান হয় যে বিষ্ণু পূর্ব্বতন যুগসমূহে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও সেই সেই মনুষ্য অবতারগুলি আত্মোপলব্ধি করিতে পারেন নাই, বা সাধনা দ্বারা পারিলেও তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাই তিনি (বিষ্ণু) কলিযুগে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেখাইলেন—তাঁহা হইতেই উদ্বর্ত্তিত বা অবতীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রাণী মনুষ্য—যেন তাঁহারই অবতার, তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাধনাবলে কিরূপে আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারই (বিষ্ণুরই) নির্গুণসত্তারূপ 'তথা' হইতে আগত হইয়া আবার 'তথা'তেই মিশাইয়া যাইতে পারে।

রামের হৃদয় হইতে এই সীতার অন্তর্ধানে রামের কি অবস্থা হইল তৎপরে তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, আমরা এখন তাহাই দেখাইব। সাধক যদি দীর্ঘ অনভ্যাস বশতঃ, অথবা কোন অধর্ম্মাচরণে তাহার সাধনা পথচ্যুত হইয়া লব্ধফল হারাইয়া, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য আর চেষ্টা না করে তাহা হইলে ক্রমেই তাহা সুদূর পরাহত হইয়া একবারেই চিরতরে অপ্রাপ্য হয়। এরূপ অনেক সাধকের জীবনে দৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের মনে কোন গ্লানি বা কষ্ট বা অনুতাপেরও উদয় হয়না। যদি অনুতাপ বা কষ্ট উদয় হয়, তখন তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে পৌরুষের সহিত তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করে। সাধক মাত্রেই জানেন কিছুদিন অনভ্যাসের ফলে কিরূপ অবস্থা হয়, যেন সমস্তই অন্ধকারে আবৃত বলিয়া বোধ হয়। অভ্যাসে ও পৌরুষ সাহায্যেই আবার জ্যোতি ফুটাইয়া সেই অন্ধকার দূরীভূত করিতে হয়। তাই রাম সীতারূপ জ্যোতির অদৃশ্যে সমস্তই অন্ধকার দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যে কষ্ট অনুভূতি করিয়াছিলেন এবং অনুতাপানলে

দগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা কবিসুলভ সরস বর্ণনায় বাল্মীকি সীতার বিরহে রামের করুণ বিলাপেই দেখাইয়াছেন। সেই পূর্ব্বদৃষ্ট জ্যোতি কোথায় এবং কি সূত্রে অন্তর্হিত হইল তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তাহাই তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার দৃঢ় আকাজ্ক্ষা হইল। সেই অভিকাজ্ক্ষা সংহত হইয়া জটার ন্যায়ই দৃঢ় হইল—যেন জটায়ুর ন্যায়ই হইল। সেই অভিকাজ্ক্ষাই—গৃধ্রই তাঁহার দূরদর্শন শক্তি। গৃধ্র—গৃধ্যতে অভিকাজ্ক্ষতে=গৃধিনী, শকুনি, দূরদর্শন। গৃধ্রের মাংসাহারে অভিকাজ্ক্ষা ও দূরদর্শন চিরপ্রসিদ্ধ। অভিকাজ্ক্ষা দৃঢ় হইলেই তাহা জটায়ু হয়। জটায়ু জটা জটতি পরস্পর সংলগ্না ভবতি। জটাং যাতি প্রাপ্নোতি ইতি যা+কুঃ সংহতমায়ুর্যস্য। তাঁহার সেই দূরদর্শনের ফলে পূর্ব্ব সাধনার সময় প্রথম অনুভূতির কথা স্মরণ হইল যে, সাধনার প্রথম অবস্থাতে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর তাহার পরেই জ্যোতিদর্শন হয়। আবার শব্দ শুনিতে পাইলেই জ্যোতি অদৃশ্য হয়। সুতরাং স্থির করিলেন এই রব বা শব্দই জ্যোতির অদৃশ্য হইবার কারণ—যেন তাহা দ্বারাই জ্যোতি হৃত হইয়াছে। প্রথমে ক্ষীণশব্দ রূপ বৈশ্রবণ শ্রুত হওয়াতে তাহা অগ্রজ, পরে উচ্চশব্দ রূপ নাদ বা রব শ্রুত হওয়াতে তাহারা বিশ্রবার পুত্র। তাই যেন জটায়ু মুখেই বলা হইল "পুত্র বিশ্রবসঃ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ"। এখন এই রাব বা রাবণ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। সাধনার প্রথম অবস্থায় এই রাবও শুনিতে পাওয়া যায়না, তাহা কিরূপ সাধনে হয় তাহাই দেখাইবার জন্য কবন্ধের দৃষ্টান্ত দেখান হইল। কবন্ধের স্বরূপ কি?

এই কবন্ধরূপ অবস্থাতেই রাম আবার যোগ সাধনের গোড়া পত্তন করিলেন। কবন্ধং—কস্য প্রাণবায়ো বন্ধঃ আশ্রয়ঃ। কবন্ধঃ পুংক্লী—

কেন প্রাণবায়ুনা পুনর্বধ্যতে সম্বধ্যতে মস্তকহীনস্যাপি দৈবেন প্রাণাবেশাৎ জীবতো নরস্যেব ক্রিয়াকারিত্বশক্তিত্বাত্তথাত্বম্। প্রবহবায়ুনো পচীয়মানত্বাৎ তথাত্বং তস্য চ লোকমুখনাশকত্বং প্রসিদ্ধং। উদরং ইতি মেদিনী। ক্রিয়া যুক্তাপমূর্দ্ধকলেবরম্ ইত্যমরঃ। ক মুখং বধ্যতে রুধ্যতেঽস্মাৎ। ক+বন্ধ+ঘঞ্। অর্থাৎ প্রবহমাণ বায়ু অভ্যন্তরে উপচয়ন করিয়া রুদ্ধ করিলে লোকের মুখ নাশ হয়। তাহা হইলে প্রবহমাণ বায়ু নিশ্বাস দ্বারা সংগ্রহ করিয়া মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া তাহাকে উদরে রুদ্ধ করা অবস্থার নাম কবন্ধ। যোগে প্রাণায়াম করিয়া উদরে বা অভ্যন্তরে বায়ু রুদ্ধ করাই যোগসাধনার প্রথম প্রক্রিয়া। যখন এই কবন্ধ অবস্থা স্থিত হইয়া কুম্ভক হয় তখন দেহের নিম্ন কটি প্রদেশ হইতে একটা শক্তিসম্পন্ন তেজ মেরুদণ্ড বাহিয়া, দেহ কম্পন করতঃ উর্দ্ধমুখে উত্থিত হইয়া, গ্রীবা প্রদেশকে বিশেষরূপে কম্পন করিয়া, জ্যোতির্ময় আকার ধারণ করে। তারপর সেই গ্রীবাকে স্থির করিতে পারিলে বা উহা স্থির হইলে, সেই ক্ষণস্থায়ী জ্যোতির অন্তর্ধানের পরেই হৃদয়দেশে স্বতঃপ্রকাশ জ্যোতির আবির্ভাব হয়। এই ভাবেই যোগীর যোগসাধনের সোপান আরোহণে ক্রমঅনুভূতি হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কবন্ধ রাক্ষস বা গুহা, যেমন বাহির হইতে সমস্ত বায়ু আকর্ষণ করিয়া তাহার মুখ দ্বারা ভিতরে লইতেছিল, তেমনি যোগীকেও প্রবহ বায়ু উপচয়ন করিয়া অভ্যন্তরে লইতে হয়। সেই গুহার নীচের গহ্বরে অগ্নিসংযোগে, যেমন সেই কবন্ধরূপ গুহার দেহ কম্পিত করতঃ তাহার উপরের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া, সেই মুখ বা ছিদ্র দিয়া, দীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, যেন তাহার গ্রীবার ন্যায়ই দৃষ্ট হইতেছিল—তাহাই ঐ সাধক যোগীর গ্রীবাদেশে দৃষ্ট জ্যোতি। তাহার পর

সেই দীপ্ত দিব্যদেহ কবন্ধ বলিল 'সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা কর, সেই তোমার সীতা অন্বেষণের সহায় হইবে'।

যোগাচরণে এই গ্রীবা বা গলার সাহায্যেই প্রাণায়াম করিতে হয়। কটি হইতে শির পর্য্যন্ত বিস্তৃত মেরুদণ্ডকে সোজা করিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া কুম্ভক করিলে, এই গ্রীবাও বহুক্ষণ সোজা ভাবে থাকাতে তাহাতে একটা ক্লেশদায়ক আড়ষ্টতা অনুভূত হওয়ায় বিশেষ অস্বচ্ছন্দতা আসাতে, যোগির কুম্ভক ভঙ্গ হয়। তাই এই গ্রীবা স্বরা শুভদায়ক তখনই হয়, যখন তাহার এই আড়ষ্টতাজনিত ক্লেশ তিরোহিত হয়। ইহাই সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা। আর এই গ্রীবার জ্যোতিই যেন ক্রমে অধোগমন করিয়া স্বতঃপ্রকাশ সীতারূপ আত্মহৃদিজ্যোতিতে পরিণত হয়। এই গ্রীবার জ্যোতি প্রথমে অগ্নিশিখার ন্যায় পীত বা হিরণ্য বর্ণেই প্রতিভাত হয়। তাই সীতারূপ জ্যোতি হইতে বিচ্ছুরিত হিরণ্যবর্ণ আভাই যেন মানবী সীতার কৌষেয় (পীত) বস্ত্ররূপে গ্রীবারূপ সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আর গলার অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার হইতেই সেই জ্যোতি আবির্ভূত হওয়াতে যেন ভিন্ন অঞ্জন বর্ণ রাবণ ক্রোড়স্থ সীতার ন্যায়ই প্রতিভাত হইতেছিল। রাবণের রূপও ভিন্ন অঞ্জনবর্ণ এইরূপ সুগ্রীব বলিয়াছিল তারপর সেই জ্যোতির অন্তর্ধানের পর সমস্ত অন্ধকার হয়, আর তখন অভ্যন্তর হইতে উত্থিত সেই নাদ বা রাব শ্রুত হওয়াতে যেন বোধ হয় সেই ভিন্ন অঞ্জন বর্ণরূপ অন্ধকারই সেই রাব করিতেছে, আর যেন সেই রাবই জ্যোতি হরণ করিয়াছে। সেই রাব ক্রমেই ভীষণ হয় আর মন তাহাতেই আকৃষ্ট হয়। এই রাবই সাধকের অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হয়, কেননা সহজে এই নাদশ্রুতি রোধ করিতে পারা যায়না। আর এই নাদশ্রুতিরোধ না হইলে সীতারূপ জ্যোতি

দর্শনও সুদূরপরাহত হয়। তখন মনের কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ হয়। যদি মনের কর্ণ সেই শব্দ শুনিয়া তাহাতেই সমভাবে আকৃষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হয় না। ইহা সকলেই বাহ্যিক ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কোন শব্দে বা সঙ্গীতে মন লয় হইলে সেই শ্রোতার নয়নে বাহ্যবস্তু প্রতিভাত হয় না। সুতরাং শব্দকে লয় করিতে, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহ অভ্যাস করিতে হয়। তাই রাবণ অতি দুর্জ্জয়। সুগ্রীব রামকে বলিয়াছিল সে রাবণ-ক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়াছিল ও সীতা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কৌষেয় উত্তরীয় যাহা সীতার দেহ আবরণ করিয়াছিল, তাহা সে দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই মসীবর্ণ পুরুষ যে রাবণ তাহা সুগ্রীব কি করিয়া জানিতে পারিল? সে তাহার রব বা শব্দ না করিলে সে যে রবেরই প্রতীক্ তাহা জানা যাইতে পারে না। গ্রীবা হইতে যে মুহূর্ত্তে জ্যোতি অদৃশ্য হয়, তখনই গ্রীবা হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ধকার হইয়া, রব বা নাদ যেন সেই অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার হইতেই উত্থিত হইয়া শ্রুত হয়, যেন সেই অন্ধকারই রব করিতেছে, তাই সেই রবের রূপ মসীবর্ণ। সুগ্রীব বলিল "আমিই সীতা অন্বেষণ করিয়া দিব। অর্থাৎ রাম যদি যোগাসনে বসিয়া নিজ গ্রীবাকেই আশ্রয় করতঃ তাহাকেই স্থ করিয়া তাহাতে কোন অস্বচ্ছন্দতা অনুভব না করিয়া, কুম্ভক সাধন দ্বারা দীর্ঘ অভ্যাস করিতে পারেন, তাহা হইলে রাবণের সন্ধান করিতে পারিবেন। গ্রীবা হইতেই রবরূপী রাবণের উৎপত্তি স্থানের নির্ণয় হইতে পারে। গ্রীবাই রবের উৎপত্তি বিষয়ে অবগত হয়। তাহা কিরূপে হয়? যে রব বা শব্দ বাহির হইতে কর্ণদ্বারা শোনা যায়—যেমন একটী প্রাণীর রব, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হয়? বাহিরে প্রবাহিত বায়ু নিশ্বাস

দ্বারা অভ্যন্তরে লইয়া যাইলে তাহা যেন কিঞ্চিৎকালের জন্য তথাতে রুদ্ধ হয়, আবার তাহাই যখন আস্তে আস্তে বাহিরে আসিতে থাকে, তখন মনে বাক্যউচ্চারণের ইচ্ছা হইলে, গ্রীবাস্থিত কণ্ঠনালীসন্নিবিষ্ট দুইটী পর্দ্দাতে (Vocal Cord) আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে পরিণত হওয়ার পর, মুখদ্বার দ্বারা বাহিরে আসিলেই সেই শব্দ শ্রুত হয়। মুখ বন্ধ করিলে, সেই পথে বায়ু আর না আসাতে শব্দও সে পথে নির্গত হয়না, কিন্তু নাসিকা দ্বারা সেই বায়ু নির্গত হইবার সময় সেই শব্দ হুঁ হুঁ হুঁ রবে শ্রুত হয়। মুখ হইতে যখন শব্দ উচ্চারিত হয় তখন উপরের চোয়ালদ্বয় অর্থাৎ হনু বিস্ফারিত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং শব্দ নানারূপে প্রকাশ করিতে হইলে জিহ্বাকে সেই হনুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মুখাভ্যন্তরস্থিত তালুতে বার বার সংলগ্ন করিতে হয়। এই হনুর সাহায্যেই শব্দ নির্গত হয় ও বিভিন্নরূপ শব্দও উচ্চারিত হয়। তাই হনুমান, অন্য হনুবিহীন বানরের ন্যায়, শুধু কিল্ কিল্ করিত না, বিভিন্নরূপে শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিত; সেইজন্যই বাল্মীকি রামের মুখে বলাইয়াছেন হনুমানের শব্দবিন্যাস ও উচ্চারণ অনেকটা সুস্পষ্ট ও বোধ্য। ভিতর হইতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা যেন কর্ণেই শ্রুত হয়, সেজন্য তাহার উৎপত্তি স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় হয় না। শব্দের নির্গমন এই গ্রীবা ও মুখ দ্বারাই হয়। সুতরাং গ্রীবা ও মুখদ্বারেররক্ষী হনুমানই এই শব্দের উৎপত্তি স্থান বিষয়ে অভিজ্ঞ। গ্রীবাস্থিত কণ্ঠনালীর পর্দ্দায় আঘাতিত হইয়া বায়ু দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হইলেও তাহা কোন পথে বহির্গত হয় তাহা গ্রীবা জানেনা। হনুর পথেই তাহা বাহির হয়। আবার হনুও জানে গ্রীবা হইতেই শব্দ আসিতেছে। হনু, শব্দের নির্গমন পথের বিপরীত দিকে অনুসরণে গ্রীবাতে যাইয়া যেন গ্রীবার নিকটই অবগত হয়

শব্দ কোন পথে আসিতেছিল। তাই সুগ্রীব হনুমানকে দক্ষিণ দিকে যাইয়া রাবণের বাসস্থান অন্বেষণ করিতে নির্দ্দেশ করিল। আমাদের মস্তকই আমাদের দেহের উত্তর ও পদের দিকেই দক্ষিণ। মন্ত্রেও আছে "উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী" ইত্যাদি। এখানে শিখরে অর্থে শির। গ্রীবা জানে যে, শব্দ নীচের দিক হইতেই আসিতেছে—অর্থাৎ মনুষ্যদেহে শব্দ, দেহের নীচের দিকে বক্ষাভ্যন্তর হইতেই উত্থিত হইয়া পরে উপরের দিকে গলা দিয়া পরে মুখ দিয়া বাহির হয়। তাই সুগ্রীব হনুমানকে নীচের দিকেই দেখাইয়া বলিল এই নীচের দিকে যাইলেই রব বা রাবণের উৎপত্তি বা বাসস্থানের সন্ধান পাইবে। এখন হনু যদি মুখদ্বার হয় আর সুগ্রীব যদি গলা হয় তাহা হইলে মুখ কি করিয়া গলায় যাইতে পারে? কিন্তু বর্ণিত আছে হনুমান বায়ুর নন্দন, তাই সে পিতার ন্যায়ই বায়ু আকারে অতি বিস্তৃত বিরাট দেহ ধারণ করিয়াই, তবে এক লম্ফে শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়াছিল। ক্ষুদ্র মার্জ্জার (বিড়াল) এক লম্ফে যতটুকু দূর যায় তাহা অপেক্ষা তাহারই জাতীয় অতি বৃহৎ ব্যাঘ্র বা সিংহ তাহা অপেক্ষা লম্ফ প্রদানে অনেক অধিকদূর অতিক্রম করে। হনুমান বায়ুর নন্দন, সুতরাং বায়ুরই জাতীয়। সুতরাং এই হনুমানকে বায়ু জাতিতে পরিণত হইতে হইলে, তাহাকে তাহার আকারও পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বায়ু আকারে পরিণত হইতে হইবে। তাহা কিরূপ অবস্থায় সম্ভব আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব, ভগবান্ তিব্বতীবাবা বলিতেন "নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক নিঃশ্বাসের গতি লক্ষ্য রাখিয়া মনকে তাহাতেই একাগ্র করিতে অভ্যাস করিবে।" অর্থাৎ হনুযুক্ত মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুগ্রহণ করিয়া সেই নিশ্বসিত

বায়ু কোন পথে অভ্যন্তরে যায় তাহারই অনুসরণ করিয়া মনকে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া অন্তর্দর্শন করাইতে হইবে। নাসারন্ধ্রদ্বয় দুই পার্শ্বের হনুর মধ্যেই স্থাপিত। নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি করিতে করিতে ক্রমে তাহাকে হনুর সহিত একসঙ্গে মিলিত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। তারপর সেই হনুসহিত নাসিকাগ্রভাগও ক্রমে অদৃশ্য হয়, এবং সেই বায়ুর গতির সহিতই হনুযুক্ত মন যেন হনুমান হইয়া ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাই হনুমানের বানরদেহ, অদৃশ্য হইয়া তাহার পিতার বায়ুর দেহের আকারে পরিণত হইয়াছিল। তারপর সেই বায়ু সেই গ্রীবাস্থিত কণ্ঠনালী বাহিয়া কণ্ঠস্থিত পর্দ্দাদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া, (যেন হনুমান মাহেন্দ্র পর্ব্বতে একটু দাঁড়াইয়া) বক্ষঃস্থিত নালী বা নল দ্বারা বক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুই দিকের আধার স্বরূপ দুই ফুসফুসাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পর্ব্বত অর্থে—'থাক্' বা বিশ্রামের স্থান। ফুস্‌ফুসের রংও কালবর্ণ। সুতরাং তখন মন আর আশ্রয় লইবার স্থান পায়না। মনের চক্ষু, সেই হনু ও নাসিকাগ্রভাগের অন্তর্ধানের পরে, আর কিছু দেখিতে না পাইয়া দৃষ্ট পদার্থের অভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া অক্রিয় হয়। মন তখন কোন দৃশ্যমান পদার্থের অভাবে যেন চক্ষুহীন হইয়া অন্ধকার রূপ সমুদ্রে পড়ে, কিন্তু ঐ বায়ুর অনুভূতিতে নিবদ্ধ থাকাতে, সেই বায়ুর সহিতই কণ্ঠনালী ও তাহারই বিস্তৃতিরূপ (continuation) বক্ষাভ্যন্তরস্থিত নালীরূপ সেতুদ্বারা অভ্যন্তরে পৌছিয়াই, চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির অভাবে কর্ণের শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হয়; আর তখনই যেন অভ্যন্তর হইতে উত্থিত শব্দ মনের কর্ণে শ্রুত হয়—যেন সেই বায়ুই রবরূপে বা রাবণরূপে উঠে। সেই অভ্যন্তর ভাগই লঙ্কা—যেখানে এই রব লীন হইয়া থাকে, আবার সেখান হইতেই উত্থিত

হয়। (লীয়তে অত্র ইতি লং)। যেন সেই অন্ধকাররাশিরূপ সমুদ্রমধ্যস্থ লঙ্কা নামক দ্বীপেই রব বা রাবণের বাস। সমুদ্রের রূপও নীলবর্ণ। তারপর সেই হনুযুক্ত মন সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে দৃঢ় ইচ্ছা করে—কিছু দৃষ্টি করিতে। তখন ক্ষণিকের জন্য হিরণাবর্ণ বা পীতবর্ণ আভাযুক্ত জ্যোতি, যেন কৌষেয় বা পীতবর্ণ পরিহিতা সীতার ন্যায় একবার মনের চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। যোগে অভ্যস্ত সাধকের এইরূপেই ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি হয়। এস্থানে রামই এই সাধক। অর্থাৎ রাম ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ অভ্যাসদ্বারাই প্রথমে পীতবর্ণ হিরণ্যাভজ্যোতি দর্শন করিয়া পরে আরও অভ্যাস দ্বারা সেই জ্যোতিকেই শুভ্রজ্যোতিরূপে (সীতারূপে) দেখিয়াছিলেন। সাধন পথ হইতে পদস্খলিত রাম, আবার নিজ পৌরুষবলেই যোগাচরণ করিয়া একবার ক্ষণিকের তরে যেন তাঁহার হনুযুক্ত মনদ্বারা সেই পীতাভজ্যোতি দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তাই হনুমানই যেন তাহার পূর্ব্বদৃষ্ট পীতবস্ত্র পরিহিতা সীতাকে, তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধানেই চিনিতে পারিল। হনুমান রাবণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল এবং তথা হইতে পুনরায় পলায়ন করিল। অর্থাৎ রামের হনুযুক্ত মন আবার তাহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হইয়া রব শুনিল, রাবণকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, তাহার (রবের বা রাবণের) উৎপত্তি স্থান জানিয়া, আবার তাঁহার হনুযুক্ত নাসাগ্রভাগে ফিরিয়া আসিল। রামের মন প্রথমে নাসাগ্রসহ হনুতেই একাগ্র হইয়া হনুর বায়ুরূপে পরিণত হইলে, সেই বায়ুর সহিতই কণ্ঠনালী রূপ নলের সাহায্যে অন্ধকাররূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, উভয়ের লীন হইবার একস্থানরূপ লঙ্কা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া, যেন জাগ্রত হইয়াই আবার সেই হনুযুক্ত নাসিকাগ্রভাগই দেখিতে পাইল।

রামের মনই যেন হনুমান অর্থাৎ হনুযুক্ত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আবার সেই হনুতেই ফিরিয়া আসিল। ইহাই হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতা ও রাবণকে দর্শন করিয়া রামকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত করণের তাৎপর্য্য। সাধনপথস্খলিত রাম তাঁহার পৌরুষরূপ লক্ষ্মণ কর্তৃক পুনঃ প্ররোচিত হইয়া আবার যোগাভ্যাস দ্বারা সীতা লাভ করিবেন এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যোগাসনে বসিয়া, মনকে হনু সহিত নাসাগ্রভাগে একাগ্রদৃষ্টি করতঃ, গ্রীবা সোজা করিয়া, নিশ্বসিত প্রাণবায়ু অনুসরণ করিয়া, তাহাকে (মনকে) তাহার প্রিয়স্থান শির হইতে চ্যুত করিয়া, যেন মুখহীন কবন্ধের মত হইয়া, নলরূপ কণ্ঠনালীর সাহায্যে সমুদ্রপারে লঙ্কায় যাইয়া, রাবণ ও সীতার লীন হইবার স্থান দেখিয়া, পুনরায় সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া, যেন রাম সীতার অনুসন্ধানে সফলকাম হইলেন। ইহাই সমস্ত বর্ণনার তাৎপর্য্য। যখন রাম বুঝিতে পারিলেন এই রবই জ্যোতি-দর্শনের ঘোর অন্তরায়, তখন মনকে এই রব হইতে মুক্ত করিবার জন্য অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, আর সেই নানারূপ রবের সহিত তাহার মনকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

এখন রামের এই সাধনাতে বালীবধের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? সুতরাং বালীর স্বরূপ কি? বালী পুং বালঃ কেশ উৎপত্তিস্থানত্বেন বিদ্যতে যস্য। বাল+ইনি

"অমোঘ রেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ।
বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ॥"

ইন্দ্রের অমোঘ রেতঃ বা বীজ কেশে পড়িয়া বালীর জন্ম হইয়াছিল। বালাঃ কেশাঃ সন্তি অস্য। বাল বিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহাতে বাল বা কেশ

আছে অর্থাৎ মস্তক। বালীর পত্নী তারা। তারা—রূপ্যতে রূপার মত, মুক্তা। আমাদের চক্ষুর মধ্যে যে তারা আছে তাহাও মুক্তার ন্যায় গোল ও উজ্জ্বল, এবং তাহাই রূপ প্রদর্শন করে। তাহাই তাহার নাম নয়নতারা। এই চক্ষুও তাহার তারা সহিত মস্তকেই সন্নিবদ্ধ, তাই তারা বালীর পত্নী। বালী রামশরে পতিত হইলে তাহার চক্ষুতারা অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল, তাই বালীর পত্নী তারাই যেন পতিত স্বামীর জন্য রোদন করিতেছিল। এই বালীর বাসস্থান কিষ্কিন্ধ্যার গুহাতে। কিষ্কিন্ধ্যা শব্দের অর্থ কি? কিষ্কিন্ধ্য পুং—কিং কিং দধাতি ধা+কঃ। পূর্ব্বস্য কিমো মলোপঃ ষত্বঞ্চ নিপাতনাৎ=পর্ব্বতগুহা। যে পর্ব্বতের গুহাভ্যন্তরে কিং কিং বা কিল্ কিল্ বা কিচ্ কিচ্ শব্দ হয়, সেই শব্দ ধারণ করে যাহা, তাহাই কিষ্কিন্ধ্যা। বানরেরা কিল্ কিল্ বা কিচ্ কিচ্ শব্দ করে। "ততঃ কিল কিলং চক্রুঃ লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ। কিচ্ শব্দের চ কএর সহিত সংযুক্ত হইলে ক্ষি হয়। সুতরাং সেই পর্ব্বত গুহা বানরের কিচ্ কিচ্ শব্দে পূর্ণ জন্য তাহার নাম কিষ্কিন্ধ্যা। কিষ্কিন্ধ্যায় বালী বাস করিয়া কিচ্ কিচ্ শব্দ করে। আর তাহারই নিকটে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব বাস করে। সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত কিরূপ? ঋষ্য—ঋষি সমূহঃ মূকো যত্র। ঋষ্য শব্দে মৃগও হয়। মৃগ যেখানে মূক হয়। ইহা গ্রীবার পশ্চাদ্দিকস্থ মেরুদণ্ডের উর্দ্ধভাগ ঘাড়। ইহার অস্থি যেন প্রস্তরই।* মূক-মব্যতেঃ বধ্যতে, সৌ-বাক্যরহিতঃ বোবা। ঋষিরা মূক বা বাক্যরহিত হইয়াই গ্রীবার আশ্রয় করিয়া যোগাসনে বসিয়া যোগ সাধন করে। পক্ষান্তরে গ্রীবা বা গলা এই ঘাড়েরই সম্মুখভাগ। গলাতেই শব্দ হয়, ঋষিরা গলাবন্ধ করিয়াই বাক্যরহিত হয়। আবার গলারূপ সুগ্রীব বানরও বালীর ভয়ে শব্দরহিত হইয়াই এখানে লুকাইয়া

* হিন্দুস্থানে ঘাড়কে ঋষিয়া বলে।

থাকিত। সে এই স্থানে থাকাবশতঃ বালী তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিত না। মাথা গলাতে নামিয়া আসিতে পারে না। এই গলা হইতেই শব্দ উত্থিত হয়। এই শব্দই সুগ্রীবের পত্নী রুমা। রু ধাতুর অর্থ শব্দ রব। রু ধাতু হইতেই রব নিষ্পন্ন। রু ধাতু হইতে রোদন। রাম সীতারূপ জ্যোতিহারা হইয়া রোদন করিতেছিলেন—যেন তাঁহার গলারূপ সুগ্রীব সেই রোদন শব্দরূপ রুমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল—যেন মদনোন্মত্ত সুগ্রীব রূপ গলা শিথিল হইয়াছিল। যখন লক্ষ্মণরূপ পৌরুষ তাঁহার মনে বল সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল, তখন রাম রোদন বন্ধ করিয়া শিথিল গলা সোজাকরতঃ যোগাসীন হইলেন। তাই যেন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে ভয় দেখাইয়া তাহাকে রুমার আলিঙ্গনচ্যুত করিয়া, তাহার কামোন্মত্ত অবশ শিথিল দেহকে সোজা করতঃ আবার সুগ্রীবকে সীতা অন্বেষণ রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। আবার ঋষ্যমূক কিরূপ পর্ব্বত তাহার বর্ণনা।

"উদারো ব্রহ্মণাচৈব পূর্ব্বকালেঽভিনির্ম্মিতঃ।
শয়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্দ্ধনি ॥
য স্বপ্নে লভতে বিত্তং তৎ প্রবুদ্ধোঽধিগচ্ছতি।
যস্তেনং বিষমাচারঃ পাপকর্ম্মাধিরোহতি।
তত্রৈব প্রহরন্ত্যেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ ॥"

উদার বা ধার্ম্মিক পুরুষ সেই পর্ব্বত শিখরে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধনলাভ করে, জাগরিত হইয়া সেই ধন নিশ্চয় পাইয়া থাকেন। যদি কোন পাপানুষ্ঠানরত পাপকর্ম্মা পুরুষ তথায় আরোহণ করে, তবে সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ যদি কোন উদার সমদম সংযমাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত লোক এই ঘাড়রূপ ঋষ্যমূক পর্ব্বতকে সোজা করিয়া মনস্থিরকরতঃ শ্বাস বন্ধ করিয়া কুম্ভক করে

তাহা হইলে ধ্যান দ্বারা যে ফল লাভ করে, জাগ্রত হইয়াও তাহাতে তাহার প্রতীতি থাকে। কিন্তু পাপাচারী ব্যক্তি অশুদ্ধ চিত্তে সেই যোগ সাধন করিতে গেলে শ্বাস-কষ্টে অতিশয় কষ্ট পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বত ঋষিদের যোগ সাধনের প্রধান ও প্রথম আশ্রয়। আর এই ঋষ্যমূকে স্থিত গ্রীবাই যখন সুগ্রীবা হয়, তখন তাহারই সাহায্যে যোগাচরণ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। তাই এই পর্ব্বত যেন ব্রহ্মা কর্তৃক নির্ম্মিত। ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান সহায়ই এই ঋষ্যমূক। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রস্তরে আবৃত বৃহৎ গুহা আছে।

> "রাম তস্য তু শৈলস্য মহতী শোভতে গুহা।
> শিলা পিধানা কাকুৎস্থ দুঃখঞ্চাস্যাঃ প্রবেশনম্॥
> তস্যা গুহায়াঃ প্রাগ্ দ্বারে মহাঞ্শীতোদকো হ্রদঃ।...
> তস্যাং বসতি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ॥"

সেই গুহার প্রাগ্ দ্বারে মহান্ জলের হ্রদ আছে, সেখানে বানরগণসহ সুগ্রীব বাস করেন। মনুষ্যের গলার উপরিভাগে একখানা পাথরের ন্যায় বিস্তৃত অস্থি আছে এবং তাহার অভ্যন্তর দিয়া বিস্তৃত ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া মস্তক হইতে স্নায়ুসমষ্টি ও শিরাধমনি নির্গত হইয়াছে। এই ঋষ্যমূক গিরি পর্ব্বত, পম্পার অন্তভাগে শোভিত এবং তথাতে (সেই পর্ব্বতে) সুগ্রীব চারিটী বানরের সহিত বাস করে।

> ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পা-পর্য্যন্ত শোভিতে।
> নিবসত্যাত্মবান্‌বীর চতুর্ভিঃ সহবানরৈঃ।

পম্পার অন্তদেশে শোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে "দক্ষঃ প্রগলভো দ্যুতিমান মহাবলপরাক্রমঃ......সুগ্রীবো নাম বানরঃ" বাস করেন। ঋষ্যমূক পর্ব্বত যদি ঘাড় হয় তাহা হইলে পম্পা কি হয়?

"ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ।
অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্।
রাম সঞ্জাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্॥

সেই পম্পা পুষ্করিণী কঙ্করশূন্যা, সমতীর্থা অর্থাৎ চারিদিকে সমান তীর্থবিশিষ্টা অর্থাৎ গোলাকার, পতনসম্ভাবনারহিতা, বালুকা পরিবৃতা, শৈবালশূন্যা এবং কমল ও উৎপলসমূহে শোভিতা। আর এই পম্পার জলে সুগ্রীবাদি বানরেরা তৃষ্ণা নিবারণ করে। পম্পা =স্ত্রীং পাতি রক্ষতি মহর্য্যাদীন্ স্বীয় সলিলদানাদিভিঃ। অর্থাৎ যাহা জল দান করিয়া পালন বা রক্ষণ করে তাহাই পম্পা। ইতিপূর্ব্বে একবার ইহাকে হ্রদ বলা হইয়াছে, এখানে বলা হইল ইহা পুষ্করিণী—সুতরাং ইহা নদী নহে। ঋষ্যমূক ঘাড়, সুগ্রীব গলার অভ্যন্তর, তাহা হইলে পম্পা কি মুখের অভ্যন্তর হইল না? মুখের অভ্যন্তর সমতীর্থা গোলাকার, কোন পদার্থ তাহাতে থাকিলে তাহা পড়ে না, তাই পতনসম্ভাবনাশূন্যা; মসৃণ তাই কঙ্করশূন্যা; চর্ব্বিত খাদ্য বালুকাকারে পরিণত হইয়া এই মুখের অভ্যন্তরেই থাকে তাই বালুকাপরিবৃতা; ইহার অভ্যন্তরের বর্ণ পদ্মের বর্ণের মতই; স্থানে স্থানে নীল শিরা থাকাতে তাহা নীলোৎপল বা নীলপদ্মদ্বারা শোভিত; আর এই মুখনিঃসৃত রসেই বা লালাতে শুষ্ককণ্ঠ সরস করা হয় বা ভিজান হয়। গলা শুকিয়ে গেলে জলাভাবে বারে বারে এই মুখের লালাই গিলিয়া 'ঢোক' গিলিয়া গলা ভিজাইতে হয়। পক্ষান্তরে যোগাসীন যোগীর গলা শুষ্ক হইলে এই মুখের রসেই গলা ভিজায়। এই গলার বা গ্রীবার চারিটী দ্বার চারিটী নালীর শেষে আছে। অর্থাৎ ৪টী নালী বা নল এই গলার সহিত মিলিত আছে। দুই কর্ণের অভ্যন্তর দিয়া নালী কর্ণপটহের

একপার্শ্ব দিয়া ছিদ্রের ন্যায় গলার উপর স্থানে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে যাহাকে ইংরেজীতে Eustachian tube বলে। নাসারন্ধ্র, বাহিরে দুইটী হইলেও তাহারা গলার অভ্যন্তরে এক নালী হইয়াই তাহার সহিত মিলিয়াছে। মুখের অন্তভাগও নালীর আকারেই গলার সহিত মিলিয়াছে। মুখ ব্যাদান করিলেই তাহার অন্তভাগে গলা দেখিতে পাওয়া যায়। মুখও হনুসংযুক্ত। এই চারিটী নল বা নালীই সুগ্রীবরূপ গলার অপরিত্যজ্য চিরসহচর চারি বানর। তাহাদের নাম (১) হনুমান, (মুখের উপরে হনু আছে তাই হনুমান) (২) মৈন্দ; মিদ ধাতু হইতে মৈন্দ, যেমন ইদি হইতে ইন্দ্র। মিদ-স্নিহি। স্নেহ নাসিকা হইতে সর্ব্বদাই নির্গত হয়—যেমন নাকের সিক্নি স্নেহ বা তৈলের ন্যায় পদার্থ, তাই মৈন্দ অর্থে নাসিকারন্ধ্র। (৩) দ্বিবিদ—যাহা দুইরূপে বিদ হয় বা জ্ঞাত হয়। দুই কর্ণরন্ধ্র দ্বারা শব্দ জ্ঞাত হওয়া যায়। তাই দ্বিবিদ অর্থে কর্ণ। (৩) আর দীর্ঘ রোম বিশিষ্ট ভল্লুক জাম্বুবান্ ঋক্ষ। জম্বু অর্থে জাম ফল, জাম্বুবান্ যাহার রোমরাজি জম্বুফলের বর্ণের মত। এই জম্বুবর্ণের রোম নাসিকা, কর্ণ, মুখরন্ধ্রের ও গ্রীবার আবরণরূপে তাহাদের রক্ষক তাই সে অমাত্য। মন্ত্রী যেমন রাজা ও সৈন্যগণকে পরামর্শ দিয়া রক্ষণ করে তেমনি এই জম্বুবর্ণের রোমরাজি নাসিকা, কর্ণ, মুখ ও গ্রীবার প্রহরীস্বরূপ তাহাদের অমাত্য। এই রোম থাকাতে কাণে, মুখে, নাকে কোন কীট পোকা প্রবেশ করিতে পারে না। গুম্ফ বা মোচ রূপে মুখের দ্বার রক্ষা করে, আর শ্মশ্রু বা দাড়ীরূপে ইহা গলার তাপ রক্ষা করে। গলা মাথার নীচে, তাই বালী সুগ্রীবকে ঋষ্যমূকে আসিয়া তাড়না করিতে পারে না।

বালী দুন্দুভি দৈত্যের ঘোর রবে উত্যক্ত হইয়া তাহাকে তাড়না

করিয়া দুন্দুভির গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। কাণে উচ্চশব্দ প্রবেশ করিলে মস্তকও বিব্রত হয়। তখন গলা আড়ষ্ট করিয়া গলার অভ্যন্তরের উপরিভাগে যে কর্ণরন্ধ্রের অপর খোলামুখ আছে তাহা বন্ধ করিলেই সেই শব্দ বন্ধ হয়। সেই নালীদ্বয় মস্তকস্থ অস্থির মধ্যের ছিদ্র দিয়াই গলায় মিলিত হইয়াছে। কর্ণপটহই দুন্দুভি বা ভেরি। যেমন ভেরির চর্ম্মে আঘাত করিলে দুম্ দুম্ শব্দ হয় (তাই তাহার নাম দুন্দুভি) তেমনি কর্ণপটহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া এই দুম্ দুম্ শব্দ হয়। তাই সুগ্রীব গুহামধ্যস্থ বালীর প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়াছিল। বালী সেই দুম্ দুম্ শব্দ শুনিতে শুনিতে সেই গুহারূপ নলাভ্যন্তরেই প্রবেশ করিয়াছিল। এই ছিদ্রমুখ বন্ধ হইলে চিকিৎসকেরা যন্ত্রসাহায্যে কর্ণাভ্যন্তরে বাতাস প্রবেশ করাইয়া সেই ভিতরের দিকের ছিদ্রমুখ, ক্লেদশূন্য করিয়া দেন, তখন আবার কর্ণে শব্দ শ্রুত হয়। রাবণ ত্রিভুবন বিজয় করিয়া বালীর নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। বালী তখন চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ মৃদু পদশব্দ করিয়া বালীর নিকট যাইতেছিল। বালী, তাহা একবারমাত্র শুনিতে পাইয়া রাবণকে কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা শেষ হইলে, তাহাকে কক্ষচ্যুত করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিল। এখানে চতুঃসমুদ্রের কথা উল্লেখ আছে। ভারতের তিনদিকে সমুদ্র আর একটা সমুদ্র আসিল কোথা হইতে? বালী যদি মস্তক হয় তাহা হইলেই ইহার সমাধান হয়। অর্থাৎ মস্তক সন্ধ্যাকালে নিদ্রাভিভূত হইয়া চতুপ্রহর রাত্রি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া প্রাতে জাগরিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিল! এই নিদ্রাবেশ হইলে সামান্য শব্দ গ্রাহ্যই হয় না, তাই রাবণের মৃদুপদক্ষেপশব্দ বালীরূপ মস্তক গ্রাহ্যই না করিয়া, তাহাতে তাহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত না ঘটাতেই, যেন

সে তাহাকে কক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আবার প্রাতঃকালে মস্তক জাগরিত হইলেই, তাহা কর্ণাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শব্দ শুনিতে পায়—তাই যেন মস্তকরূপ বালী রবরূপ রাবণের সহিত মিত্রতা করিল।

এখন এই বালী রামের সাধনার পক্ষে কিরূপ অন্তরায় হইতে পারে, যে তাহাকে বধ করিবার, রামের প্রয়োজন হইল। যোগাভ্যাসে আসীন সাধক মনস্থির করিবার সময় একটা ধারাবাহিক ঝিল্লীরবের ন্যায় কিং কিং কিল্ কিল্ কিচ্ কিচ্ শব্দ যেন মস্তকের মধ্যেই হইতেছে, এইরূপ শুনিতে পায়। ইহা বাহ্যকারণ হইতে আগত শব্দ হইতে বিভিন্ন। ইহার কোন দৃশ্যমান বা অনুভূয়মান কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শব্দ হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই গ্রীবাতে মন সংশ্লিষ্ট হয়। এই শব্দ যেন মস্তকের মধ্যেই কোন নিহিত কারণ হইতে উদ্ভূত হয় বলিয়া বোধ হয়। আর সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মন মস্তকেই আবদ্ধ থাকে। মন সাধারণতঃ মস্তকে স্থিত ইন্দ্রিয়গণের নিকটস্থই থাকে। সুতরাং সেই মস্তক হইতে তাহাকে গ্রীবাতে নিবদ্ধ করিতে হইলে বহু আয়াস করিতে হয়। সেই মস্তক হইতে মন গ্রীবাতে আকর্ষিত হইলেই, সেই মস্তকে শ্রুত শব্দের সহিত যেন মস্তকটাই অন্তর্হিত হয়—যেন মস্তকটাই বধ হয়। তারপর গলাতে মন নিবদ্ধ হইলে তাহা যেন গলার সহিত মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহাই বালীবধের তাৎপর্য্য। সেই মস্তকে কিং কিং শব্দকারী কারণই বালী, আর তাহা ঐ মস্তকে থাকাতে কেশযুক্ত মস্তকই বালীর প্রতীক্। এখন সম্ভবতঃ বোধগম্য হইল কেন বাল্মীকি এই সমস্ত বানরের উক্তরূপ অর্থবোধক নাম করিয়া আবার তাহাদের বাসস্থানেরও যথাযোগ্য নামকরণ করিয়াছেন। যোগসাধনে কখন কোথায় কিরূপ অনুভূতি হয়, তাহাই যোগসিদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকি,

নিজ অনুভূতিই, রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন—যেন রাম তাঁহার উপলক্ষ্য। রামের দ্বারাই তাঁহার আচরিত সাধন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। নতুবা বানরের নামকরণের কি প্রয়োজন ছিল? নাসিকাগ্রভাগ হইতে মনকে হৃদয়স্থানে নিবিষ্ট করিতে যে সাধনা ও অধ্যবসায়ও অভ্যাস করিতে হয়, তাহার পথ শতযোজনের ন্যায়ই দুর্লঙ্ঘ্য।

কুমার ব্রহ্মচারী রামের মনে যখন কামনার বীজ মাত্র অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক উপদেশের ও শিক্ষার ফলে, অল্পায়াসেই তাহা অঙ্কুরেই শান্ত হইয়া, তাঁহার (রামের) মনঃসংযম শীঘ্রই হইতে পারিয়াছিল। তাই রাজর্ষি জনকের উপদেশে ধনুর্ভঙ্গ করিয়া হৃদিস্থিত আত্মজ্যোতির দর্শনরূপ উপলব্ধিও অল্প সময়ে সিদ্ধ হইয়াছিল। বালক ব্রহ্মচারী, যাহার মন কামনাক্লিষ্ট হয় নাই, কিরূপে কত শীঘ্র উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে সাধনাপথে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বাল্মীকি রামের দৃষ্টান্তে দেখাইলেন। এযুগেও তাহা শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব ও যুবক বিবেকানন্দ স্বামীর জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর ষোড়শ বর্ষেই উন্নতির সর্ব্বোপরি সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা যাইতে পারে তিনি পূর্ব্বজন্মজন্মান্তরে অনেক সাধনা দ্বারা প্রায় সমস্ত সোপান আরোহণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা সামান্য ছিল, তাহাই এই জন্মে শেষ করিলেন। রামও সেইরূপ পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণুরূপে সাধনা দ্বারা তাঁহার (বিষ্ণুর) নির্গুণ সত্তায় উপনীত হইয়াছিলেন যাহা সিদ্ধাশ্রমের বিবরণে কথিত হইয়াছে। তাই তিনি এজন্মে এত শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহার সময় মাত্র দশ দিন ছিল। বিশ্বামিত্র দশ দিনের জন্য রামকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসন্তান উপনীত হইয়া গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর দশ বা

দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হন। তারপর আচার্য্য যাহাকে অধিকারীর উপযুক্ত মনে করেন অর্থাৎ যে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া আত্মোপকর্ষ সাধনই শ্রেয়ঃ মনে করে, তাহাকেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। এই গায়ত্রীমন্ত্রেই আত্মদর্শনের বা ব্রহ্মোপলব্ধির বীজ নিহিত আছে। এই মন্ত্র যাহারা সম্যক্ প্রণিধান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ সাধনা করিতে পারে, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের সমীপস্থ হয়। তাই এই অনুষ্ঠানের নাম উপনয়ন। উপ-সমীপে-নয়ন—নীধাতু হইতে—লইয়া যাওয়া। এই গায়ত্রীমন্ত্রই যেন তাহাদিগের পরিচালক হইয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মের সমীপে লইয়া যাইবে। এই গায়ত্রীমন্ত্রের প্রণিধান করিতে হইলে আমাদের সেই মন্ত্রটীর অর্থ সম্যক্ বুঝিতে হইবে। অন্যথা তাহা, প্রত্যহ নিয়মিত কর গুণিয়া টিয়া পাখীর মত, উচ্চারণ করিলে কি কিছু কার্য্য তাহাতে সিদ্ধ হয়? মন্ত্রটী এখন আব্রাহ্মণ সকলেরই কণ্ঠস্থ, এবং তাহার নানারূপ অর্থও হইয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে একটু আলোচনা করিলে এখানে অসঙ্গত হইবে না। "ওঁ ভূর্ভুর্বস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" ইহা ২৪ অক্ষরযুক্ত গায়ত্রীছন্দের ঋগ্‌বেদীয় অনেক মন্ত্রের সূর্য্যের স্তুতির একটী মন্ত্র। সেই মূলমন্ত্রে ওঁ বা ভূর্ভুর্ব, স্ব ছিল না। কেননা ঋগ্‌বেদের সময়ে ওঁএর কোন উল্লেখ নাই। ইহা উপনিষদের ঋষির কল্পনা। ভূ ভুর্ব স্ব এই তিনটীকে ব্যাহৃতি বলা হয়। আচার্য্য শঙ্কর এই ব্যাহৃতি শব্দের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই কেননা তাহা উপলব্ধির বিষয়। ব্যাহৃতি=বি+আ+হৃ। আ—সমন্তাৎ চারিদিক হইতে বি-সম্যক প্রকারে হৃ-আহরণ, ইহাই ব্যাহৃতি শব্দে বুঝায়। এই তিনটী শব্দই এক একটী ব্যাহৃতি।

ইহারা যে ব্যাহৃতি তাহার তো কোন লক্ষণই ইহাতে বোঝা যায় না। সুতরাং তাহা উপলব্ধির বিষয়। মন্ত্রজাপক প্রথমেই বলিল ওঁ, তখন তাহার এই ওঁএর সম্বন্ধে প্রণিধান হওয়া প্রয়োজন। এই ওঁ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সেই ওঁএর প্রতিপাদ্য আত্মা বা ব্রহ্মই তাহার প্রাপ্য লক্ষ্য স্থির করিয়া, 'পৈতে' হস্তে ধারণ করতঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, পরের শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া তাহাও যথাযথ প্রণিধান করিতে হইবে। পৈতে হস্তে করিবার কি প্রয়োজন? পৈতে অর্থ কি? পৈ=শোষে। পায়তি ধান্যমাতপেন। এই পৈতে যাহা আমার দেহ বেষ্টন করিয়া আছে তাহা, আমার দেহের মলের ও অবিশুদ্ধতার বন্ধনরূপ রজ্জু; এই রজ্জুর সাহায্যেই আমি তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব। রৌদ্র যেমন ধান্য শুষ্ক করে তেমনি এই পৈতেও আমার দেহের মলিনতা রূপ আর্দ্রতা শুষ্ক করুক। এখন মন্ত্রজাপক আমি, উচ্চারণ করিলাম ভূঃ। তখন আমার মনকে চারিদিক হইতে অন্য বিষয় চিন্তা হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই 'ভূ'তেই নিবদ্ধ করিয়া সেই 'ভূ'র বিরাটত্ব উপলব্ধি করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিলাম—তাই ইহা ব্যাহৃতি। তারপর মনকে ভূ হইতে উপরে ভুবে শূন্যে লইলাম, তখন মন, 'ভূ'স্থিত দৃশ্যমান পদার্থ হইতে ক্রমে নির্লিপ্ত হইয়া শূন্যে যাইয়া যেন শূন্যই দেখিল। তারপর যখন তাহারও উর্দ্ধে উত্থিত হইল তখন মহাশূন্যে যাইয়া নিবদ্ধ হইল—সেই জগৎ প্রকাশক সবিতাতে। তারপর সেই জগৎ প্রকাশক সবিতুরও যে শ্রেষ্ঠ ভর্গ—যাহা আবার সেই সবিতাকেও প্রসব করিয়াছে তাহাকেই আমি ধ্যান করিতেছি—ধীমহি, আর সেই ধ্যান করিবার যে আমাদের ধীশক্তি তাহারই

প্রচোদন হউক—প্রকাশিত হউর্ক, প্রজ্জ্বলিত হউক। ক্রমে ভূ ও ভুবের দৃশ্য বস্তু হইতে নির্লিপ্ত মন 'স্ব'তে সবিতা বা সূর্য্যে লিপ্ত হইল। তারপর সেই সূর্য্য বা আদিত্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, যাহার ভাতিতে সেই আদিত্যও বিভাসিত হইয়াছে সেই ভর্গও প্রাপ্য হয়। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তখনই আবার ওঁ বলিয়া মন্ত্র শেষ হয়। অর্থাৎ সেই ওঁ প্রণিধান হইয়াছে। তাই মন্ত্রের শেষেও ওঁ। সুতরাং এই মন্ত্রের মূল্য কত! যে জাপক এই মন্ত্র যথাযথ প্রণিধান করিয়া ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া জপ করিতে পারে, তাহার আর অন্য কি সাধনার বা উপদেশের প্রয়োজন? তাই উপযুক্ত আচার্য্য দ্বারাই উপনীত হইবার বিধি সেই পূর্ব্বকালে ঋষিদের যুগে ছিল। যে ব্রাহ্মণসন্তান প্রকৃতই এই সদাচারের সহিত দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে এই মন্ত্রোক্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেন, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করিয়া "তত্বমসি" বলিতেন। কেননা তিনি তখন গুরুকে বলিতে সক্ষম হইতেন "অহং ব্রহ্মোঽস্মি।" তাই কঠোপনিষদের ঋষি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উঠ, জাগ্রত হও, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া প্রবুদ্ধ হও।

বাল্মীকি আবাল ব্রহ্মচারী; তাই তিনি দেখাইলেন অনাসক্ত বাল ব্রহ্মচারী কত শীঘ্র আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে পারে। রামের সেই দশ দিনের সাধনাও কি কঠোর না ছিল! যেন তাহা দশবৎসর ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায়। সেই সিদ্ধিই তিনি রামের ধনুর্ভঙ্গে দেখাইলেন। পরে তাঁহার মনে হইল শুধু কি আবাল ব্রহ্মচারীরাই এই আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, গার্হস্থ্যাশ্রমী বিশুদ্ধাত্মা পুরুষেরা তাহা লাভ করিতে পারেন না? কেবলই কি ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য এবং

তাঁহার ন্যায় আবাল ব্রহ্মচারীরাই ইহার যোগ্য অধিকারী ? পক্ষান্তরে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, ভৃগু আদি বৈদিক ঋষিরা পুত্র কলত্র সহ গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়াও তো, এই ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবার আধুনিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই তিব্বতী বাবা আচার্য্য শঙ্কর ও বিবেকানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যেমন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সেই পদলাভ করিয়াছেন, তেমনি বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, সোহহংস্বামী রামকৃষ্ণ দেবও গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়াও উত্তরকালে নির্ব্বাণ পদ বা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন। তাই তিনি বিবাহিত রামের বৈচিত্র্যময় জীবনীতে দেখাইলেন গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্ম্মচারী ব্যক্তিরাও, সাধনা দ্বারা সে পদলাভে অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপভাবে তাহা আচরণ করিলে, কিরূপ সাধনা দ্বারা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, কিরূপ আচরণে পদস্খলনের সম্ভাবনা, 'আবার সেই পদস্খলিত অবস্থা হইতে নিজ পৌরুষ বলে কিরূপ সাধনা দ্বারা ক্রমে সাধন সোপানের অত্যুচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়া, পরিণামে কিরূপে ব্রহ্মপদও লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও রামের এই বিচিত্র আচরণ ও সাধনা দ্বারা দেখাইলেন। রাম বিশ্বামিত্রের পরিচালনে দশ ইন্দ্রিয় সংযম মাত্রই করিতে পারিয়াছিলেন। যে চতুর্দ্দশকরণ সহযোগে আত্মা, জাগরণ অবস্থায় ক্রিয়া করে, তার বাকি চারিটি অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারও চিত্তরূপ চারিটী করণ, তখনও তিনি সম্পূর্ণ স্ববশে আনিতে পারেন নাই, কেননা সীতারূপ জ্যোতি দর্শনের পরও তিনি পরশুরামের নিকট নিজের দর্প ও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর পিতৃ সত্য পালনরূপ অহঙ্কারও তাঁহার ছিল। সুতরাং এই চতুর্দ্দশ করণ ও লব্ধ সীতারূপ জ্যোতির সহিত তিনি বনে গমন করিলেন। তাই

তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস। অন্য সংখ্যা না বলায় এই নির্দ্দিষ্ট চতুর্দ্দশ সংখ্যাতে, ইহাই বুঝায়।

ব্রহ্মচারী ২৫ বৎসর বয়সে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আরও পঁচিশ বৎসর তদোচিত ধর্ম্মপালন করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে। তখন সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে বিরত হওয়া বশতঃ, মনের আকর্ষণকারী বৃত্তিগুলির অভাবে, তাহার মন যেন কেবল বা একাকী হয়। তখন মন বাহ্যিক অবলম্বন ও আশ্রয়বিহীন হইয়া তাহার স্বগৃহরূপ আশ্রয় আত্মাকেই অবলম্বন করে সে যেন এত দিন প্রবাসে থাকিয়া নানারূপ সুখ, দুঃখ শোক তাপ উপভোগ করিয়া, তাহাতে বিরক্ত হইয়া স্ব-আবাসে নিজগৃহেই আসিতে উন্মুখ হয়। এই বিরক্তি, বিবেকসম্পন্ন বিচার দ্বারা হয়। যতদিন এই সংসারে 'আমার' বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে ততদিন একটা না একটা কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেই হইবে। রাম বানপ্রস্থ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সমস্ত 'আমার' পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সেই 'আমার' পদার্থ তাঁহার ভার্য্যা সীতা, যাঁহাকে তিনি আমরণ রক্ষা করিবার ও প্রীত রাখিবার জন্য অগ্নি সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহার বানপ্রস্থাবস্থাতেও থাকিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি এই আশ্রমেও নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। আবার সীতার প্রতি যে প্রধান কর্ত্তব্য তাঁহাকে রক্ষা করা, তাহাতেও তিনি তাঁহার দৃঢ়তা দেখান নাই—যখন বিরাধ রাক্ষস স্কন্ধে বাহিত হইয়া পরিত্যক্তা অসহায়া রোরুদ্যমানা সীতাকে তাঁহার নয়ন পথেই বিদ্যমানা দেখিতে পাইতেছিলেন। অগস্ত্যাশ্রমে যাইয়া তাঁহার (অগস্ত্যের) নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লাভ করিয়া তথাতেই থাকিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াও, আবার

মুনিদিগকে যে রাক্ষসবধের আশ্বাস দিয়াছিলেন—সেই প্রতিশ্রুতির স্মরণ ও প্রতিজ্ঞা পালনের অহঙ্কার, তাহার মনে উদয় হওয়াতে, তাঁহার বুদ্ধিও বিচলিত হইয়া তাঁহার অহঙ্কারকে বশীভূত করিতে না পারাতেই তিনি দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। বুদ্ধির রশ্মি (রাশ) ঢিলা হইলেই অহঙ্কার উগ্র হইয়া মনকে দূষিত করে, আর সেই দূষিত মন, ইন্দ্রিয়দিগকে দূষণীয় কার্য্যে চালিত করে। মনে কোনও পাপকার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলেই মন দূষিত বা অশুদ্ধ হয়, আর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই কার্য্য সাধন করাইলেই সেই পাপ কার্য্যটী কৃত হইয়াই ইন্দ্রিয় ও মন, উভয়েই তাহার ফলভোগ করে। সীতা বলিয়াছিলেন রাম জিতেন্দ্রিয়। অর্থাৎ তিনি দশ ইন্দ্রিয়ই জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং চতুর্দ্দশকরণের অন্য করণ চতুষ্টয় অপরাজিতই ছিল। তাহারাই যখন প্রখর ও দূষণীয় হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসরূপে তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিতে উপক্রম করিয়াছিল তখন তিনি সেই অগস্ত্যঋষির নিকট সদ্যঃপ্রাপ্ত উপদেশানুযায়ী সাধনাতে রত হওয়াতে সাময়িক অটলতা রক্ষা করিলেন। কিন্তু অভ্যাসের অভাবে যখন সেই উপদেশের লক্ষ্যবস্তু, তাঁহার মন হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন সেই পূর্ব্ব পরাজিত বা দমিত কামনারাশি যাহা এতদিন যেন সুপ্তই ছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে জাগরিত হইয়া কামরূপী মারীচরূপে, তাহাকে প্রলোভনের জালে জড়িত করিল। রাম তাঁহার ভার্য্যার অনুরোধে সেই অহিংসাকারী শত্রুভয়হীন, প্রফুল্ল মনে ক্রীড়ারত, নিরীহ মৃগটী বধ করতঃ তাহার চর্ম্মাসনে উপবেশন করিবার সীতার একটী তুচ্ছ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া, তাঁহার প্রীতিসাধনরূপ কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। বানপ্রস্থে তো বটেই, গার্হস্থ্যাশ্রমেও 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ইহাই

সকল ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন। এই অধর্ম্মই রামের পদস্খলনের হেতু হইল, ইহা গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধ আবার বানপ্রস্থেরও বিরুদ্ধ। সুতরাং সেই গার্হস্থ্যবিরোধী অধর্ম্মের ফলে তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গিনী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতাও অপহৃতা হইলেন, আর বানপ্রস্থীর অবলম্বন আত্মদর্শনের সহায় আত্মজ্যোতিরূপ সীতাও অদৃশ্যা হইলেন। তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্মও পালন করেন নাই, বানপ্রস্থীর ধর্ম্মও পালন করেন নাই। বাল্মীকি একাধারে একদিকে মনুষ্য রামের মনুষ্যোচিত অনুচিত কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল এবং অন্যদিকে সাধক রামের সাধকোচিত অনুচিত কর্ম্মা-কর্ম্মের ফলাফলও দেখাইলেন। তারপর পতিত মনুষ্যকে ও পদস্খলিত সাধককে, বুদ্ধির উদয়ে পুনরায় স্বীয় পৌরুষ বলে বহু আয়াস-সাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া ও যত্নাভ্যাসে সাধনা পুনরুদ্দীপিত করিয়া কিরূপে দুইপ্রকার হৃতপদার্থেরই অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাও এই বর্ণনায় বাল্মীকি দেখাইলেন। যাঁহারা কখনও যোগাচরণ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই রহস্যান্বিত বর্ণনার রহস্য উদ্ধার, আমাদের এই ব্যাখ্যার সাহায্যে করিতে, বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। সাধারণ পাঠকের ইহা বোধগম্য না হইলেও অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরও যদি ইহা কিছু মনঃপূত হয়, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব। সাধারণ পাঠকের নিকট ইহা বিরক্তিকর প্রহেলিকা মনে হইলেও কোন না কোন পাঠকের পক্ষে সামান্য প্রীতিকরও হইতে পারে, ইহা কি আশা করা অন্যায় হয়? ইহার পর আমরা লঙ্কাযুদ্ধে বিভিন্ন নামধারী রাক্ষসদের সহিত কবিসুলভ অতি বর্ণনা দ্বারা রঞ্জিত যুদ্ধ বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া আবশ্যক কয়েকটী যুদ্ধেরই আলোচনা করিব।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

রামলক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন

রাম, বানরবাহিনীসহ লঙ্কা অবরোধ করিলে ও বানরেরা লঙ্কাপুরীতে নানারূপ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, ইন্দ্রজিত রাক্ষস সৈন্যসহ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর রাত্রির অন্ধকারেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের নিকট পরাজিত হইয়া ক্রোধে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইল এবং অদৃশ্য হইয়া নিশিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। তৎপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নাগময় শরদ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

"অদৃশ্যো নিশিতান্ বাণন্ মুমোচাশনিসন্নিভান্।
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব ঘোরৈ র্নাগমায়ৈ শরৈঃ॥
বিভেদ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বগাত্রেষু রাঘবৌ।
মায়য়া সংবৃতস্তত্র মোহয়ন্ রাঘবৌ যুধি॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং কূটযোধী নিশাচরঃ।
ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রাম লক্ষ্মণৌ॥"

সেই কূটযোধী নিশাচর মায়া দ্বারা অদৃশ্য থাকিয়া অশনিসদৃশ নিশিত বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং রাম ও লক্ষ্মণের সর্ব্ব শরীর নাগময় শর দ্বারা ভেদ করিয়া মোহিত করতঃ শর দ্বারা বন্ধন করিল। প্রকাশমান থাকিয়া যখন পারিল না, তখন মায়া দ্বারা অদৃশ্য হইয়া, সেই রাজসুতদ্বয়কে বন্ধন করিল। যুদ্ধকালে ইন্দ্রজিৎ কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ

করিতেছে তাহা দেখিতে পাইলেন না। বানরেরাও অন্ধকারে আবৃত তাহাকে দেখিতে পাইল না।

"অন্ধকারে ন দদৃশুর্ম্মেঘৈঃ সূর্য্যমিবাবৃতম্।"
নিরন্তর শরীরৌ তু তাবুভৌ রাম লক্ষ্মণৌ।
ক্রুদ্ধেনেন্দ্রজিতা বীরো পন্নগৈ শ্বরতাঙ্গতৈঃ॥"

সেই ভ্রাতৃযুগল ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ নিক্ষিপ্ত শররূপী সর্পসমূহ দ্বারা এরূপ বিদ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদের দেহের কোন স্থান অক্ষত রহিল না। তাঁহারা মর্ম্মস্থানে পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইলেন। লক্ষ্মণ রামকে বীরশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া জীবনে হতাশ হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ সুগ্রীবাদিসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বানরগণ কেহ ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু বিভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইল। সুগ্রীব অত্যন্ত শোকে অধীর হইলে, বিভীষণ তখন মন্ত্রপূত জলদ্বারা সুগ্রীবের নয়ন যুগল মার্জ্জনা করিয়া তাহার মুখ প্রোঞ্ছন করিলেন এবং বলিলেন "যে পর্য্যন্ত রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞালাভ না করেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে রক্ষা কর। পরে বিভীষণ আর্দ্র হস্তদ্বারা সেই ভ্রাতৃযুগলের নয়ন পরিমার্জ্জন করিলেন। তখন সুগ্রীব বিভীষণকে কহিল "আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাবণ বা ইন্দ্রজিতের বাসনা কখনও পূর্ণ হইবেনা। কারণ গরুড় আসিলেই রামচন্দ্র সংজ্ঞা লাভ করিবেন।" তখন সুষেণ কহিল "হনুমান একাকী যাইয়া চন্দ্র ও দ্রোণ নামক গিরির উপরিভাগে 'সঞ্জীবকরণী' ও 'বিশল্যকরণী' নামে যে দুই পরম ঔষধি আছে তাহাই আনয়ন করুক।" তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎমালাশোভিত মেঘসমূহের আবির্ভাব হইল এবং প্রবল বাত্যা উঠিল। পরে বানরগণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিনতানন্দন গরুড়কে দেখিত পাইল।

"এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্ম্মেঘাশ্চাপি সবিদ্যুতঃ।...
ততো মুহূর্ত্তা-দ্‌গরুড়ং বৈনতেয়ং মহাবলম্‌।
বানরা দদৃশুঃ সর্ব্বে জ্বলন্তমিব পাবকম্‌॥"

যে শরভূত মহাবল নাগসমূহদ্বারা রামলক্ষ্মণ বদ্ধ হইয়াছিলেন, বিনতা-নন্দনকে সমাগত দেখিয়া তাহারা সকলেই দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তৎপরে গরুড় তাঁহাদের গাত্রস্পর্শ করিয়া, হস্তদ্বারা তাঁহাদের মুখচন্দ্র মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। বিনতানন্দন কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তাঁহাদের দেহ ক্ষতহীন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শোভাশালী হইল। তখন রামচন্দ্র গরুড়কে বলিলেন "আপনার প্রসাদেই আমরা জীবন লাভ করিয়াছি। আপনি কে? তখন গরুড় কহিলেন "আমি আপনার সখা বহিশ্চর প্রাণ, আমার নাম গরুড়। আপনাদের সাহায্যার্থেই আমি আসিয়াছি। এই তীক্ষ্ণ দন্ত, তীক্ষ্ণবিষ কদ্রুনন্দন নাগগণ, শররূপ হইয়া আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। এই কথা বলিয়া গরুড় অন্তর্হিত হইল।

এই বর্ণনাটী একপক্ষে অতি সহজবোধগম্য। কেন না বিষ্ণু অবতার রাম কদ্রুনন্দন সর্পগণ কর্ত্তৃক বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বিষ্ণুর বাহন ও সখা বিনতানন্দন গরুড়, তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কদ্রুনন্দন ও বিনতানন্দনগণের মধ্যে তাহাদের পরস্পরের মাতার কারণে শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া আছে এইরূপ পুরাণে কথিত আছে। কিন্তু মানব রামের জন্য স্বর্গ হইতে গরুড় আসিল আর তাহায় চিরশত্রু সর্পগণ যাহারা মায়াদ্বারা শররূপে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিল, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল এইরূপ আজগুবি গল্প কি শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস্য হয়? ইহা সেই সংস্কারবদ্ধ একদেশদর্শী মনুষ্যদেরই শ্রবণসুখকর হইয়া থাকে।

সুতরাং ইহাতে কি সত্য নিহিত আছে তাহা বাল্মীকির রচনাভঙ্গী হইতেই আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে। প্রথমে নাগশব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ কি তাহাই দ্রষ্টব্য। নাগং=নগে পর্ব্বতে ভবং। নাগঃ=পর্ব্বতে ভবঃ—নগ+অন্। যদ্বা দহত্যস্মাৎ বিষাগ্নিনেতি—দহ+দহর্গোলোপো দশ্চনঃ উণাংগঃ। অন্তলোপঃ। দস্য নঃ। বাহুলকাৎ নকারস্য না=পন্নগঃ, হস্তী, ক্রূরচারী, মেঘ। পুনশ্চ ন গচ্ছতি ইতি ন+গ=অগ। ন+অগঃ=নাগ ইতি। এই নাগ শব্দের অর্থ সর্প করিতে যাইয়া মূল দহ শব্দের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যয়রূপ কৌশল প্রয়োগে দহ (যাহা বিষ দ্বারা দহন করে) হইতে সর্প অর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সোজা ব্যুৎপত্তি অর্থ করিলে—নগে পর্ব্বতে উদ্ভব মেঘই বুঝায়। মেঘ, পর্ব্বত হইতেই উদ্ভব হইয়া প্রথম পর্ব্বত গাত্রেই সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, বাতাসে উড়িয়া আকাশে ভাসমান অবস্থায় চলাচল করে, তাই ন+অগ অর্থাৎ গতিহীন নহে। সুতরাং এস্থলে নাগ অর্থে মেঘ, এবং ইহার অর্থ হইলেই বাল্মীকির বর্ণনার যথার্থ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়।

ইন্দ্রজিৎ রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধ করিতেছিল ইহার উল্লেখ আছে।

"যুদ্ধতামেব তেষান্তু তদা বানর রাক্ষসাম্।
রবিরস্তং গতো রাত্রিঃ প্রবৃত্তা প্রাণহারিণী॥"

যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি আগত হইল। সুতরাং তাহার অদৃশ্য হইতে, মায়ার প্রয়োজন হয় না। সে অন্ধকারে রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াই শর নিক্ষেপ করিতেছিল, অথচ তাঁহারা তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলেন না কেন? তাহার গাত্রবর্ণ, রাবণের ন্যায়ই এবং সমস্ত আদিম মনুষ্যজাতি যাহারা বিষুবরেখার (Equator) নিকটবর্ত্তী অতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করে তাহাদেরই ন্যায় জাতিসুলভ, কালবর্ণ ছিল।

সুতরাং তাহা অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ভেদরহিত অবস্থাতে থাকাতে, তাহাকে সেই অন্ধকার রাশি হইতে পৃথকভাবে দেখা যাইতেছিল না। পক্ষান্তরে লক্ষ্মণের আর্য্যজাতি সুলভ গৌর বর্ণ ও রামের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, সেই অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহাদের পরিহিত শুক্ল বল্কল ও অন্য বর্ণের চর্ম্মের সহিত, কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইতেছিল। তার উপর এই আদিম জাতির মধ্যে তখন দীপ আদি আলোপ্রকাশক বস্তু উদ্ভাবিত না হওয়াতে, তাহারা নিশাচর প্রাণীর ন্যায় অন্ধকারেও অনেক কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। (রাক্ষসদিগকেও নিশাচর বলা হইয়াছে) তাই রামলক্ষ্মণ ও বানরগণ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও নিশাচর বিভীষণ নিশাচর ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইতেছিল।* পক্ষান্তরে আর্য্যজাতিসম্ভূত আর্য্যাবর্ত্তবাসী রাম দীপান্বিত উজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া, রাত্রির অন্ধকারে, আলোকের অভাব অনুভব করিতে না পারিয়া অন্ধকারের মূল্য জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পান নাই। তাই ইন্দ্রজিতের অবিশ্রাম শরবর্ষণে আহত হইয়া তাঁহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছিল। সেই সমস্ত বাণ দিবাভাগে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের ফলা রবিকরোজ্জল প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতে করিতে আসিবার সময় দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহা যেন মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়ই দেখা যাইতেছিল না। তাই যেন সেই বাণগুলি

---

* বিন্ধ্যাচলের যে অন্ধকারময় সুরঙ্গাভ্যন্তরে বানরেরা পথহারা হইয়া অনেকদিন আবদ্ধ ছিল, সেই সুরঙ্গ দ্বারাই রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর হইতে জনস্থানে যাইত। সুতরাং তাহারা অন্ধকারে গতিবিধি করিতে পারিত। বিন্ধ্যাচলের অপর পার্শ্বে সমুদ্রতীরের নিকটবর্ত্তী হওয়াবশতঃ লঙ্কাদ্বীপ যে মাদ্রাজ উপকূলে গোদাবরীর সঙ্গম স্থানের নিকটই ছিল ইহাই প্রমাণ হয়।

মেঘময় বা নাগময় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। আর এইরূপ না হইলে বলিতে হইবে ইন্দ্রজিৎ প্রত্যেক বাণের ফলায় এক একটা সাপ বাঁধিয়া তাহা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং সেই সকল সর্প রাম লক্ষ্মণের সমস্তদেহ আবৃত করিয়া তাহাদিগকে যেন পাশের দ্বারা বা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না, কেননা যখন একটী সর্পভুক্ বৃহৎ পক্ষী সেখানে আসিল, তখন তাহারা পলাইয়া গেল। সেই সমস্ত নিশিত শর রামের সর্ব্বগাত্র ভেদ করিয়াছিল। যদি শরের সহিত সর্প রজ্জুদ্বারা বদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সে সর্পগুলি সেই বন্ধন মোচন করিয়া পলাইতে পারিত না, কেননা সেই শরগুলিকে দেহ হইতে না উঠাইলে তাহা সম্ভব হয় না। অবশ্য পাইথনের (Python) এর মত বৃহৎসর্প দ্বারা একার্য্য সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ধনু হইতে সেইরূপ বৃহৎ সর্পবদ্ধ শর তন্মুহূর্ত্তেই সর্পভরে ভূমিতে পতিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং নাগ এখানে মেঘ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ-ফেরৎ ব্যক্তিরা বলিতে পারেন আদিম ইণ্ডিয়ান জাতির ন্যায়, এই লঙ্কা ও ভারতের দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম জাতিরা বৃহৎ রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া এইরূপে দূরস্থ প্রাণীকে বন্ধন করিতে জানিত, যাহার চিত্র অনেকেই ছায়াচিত্রে দেখিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি বলিতেছেন অসংখ্য নিশিতবাণ ইন্দ্রজিৎ নিক্ষেপ করিয়াছিল। আর তাহা হইলে সেইজাতীয় বিভীষণ তাহা উন্মুক্ত করিতে পারিত। সুগ্রীব সুষেণকে রামের শুশ্রূষা করিতে বলিল। উভয়েই বানর, সুতরাং তাহারা কথা না বলিয়াই পরস্পর ইঙ্গিত করিয়াছিল। সুষেণ দুইটা ঔষধের কথা বলিয়াছিল। সে তাহাদের স্বভাবজ বুদ্ধিবশতঃ (Instinct) গাছের রসের উপকারিতা জানে। সুষেণ = করমর্দ্দক।

সে কোন গাছের পত্র মর্দ্দন করিয়া হনুমানকে, পরপারস্থ সেই পাহাড় হইতে তাহাই আনিতে ইঙ্গিত করিয়াছিল। সুগ্রীব বিভীষণকে বলিল রামলক্ষ্মণ মরে নাই। পশুপক্ষীরা এই মৃত্যুর অবস্থা জানে। আমি একটী কুকুরীকে দেখিয়াছি, সে মোটর গাড়ীতে চাপা পড়াতে তাহার মৃত শাবকের নিকট যাইয়া জিহ্বা দ্বারা তাহাকে লেহন করিতেছিল। যখন দেখিল সে আর নিঃশ্বাস লইলনা, তখন যেন বিষণ্ণ বদনে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়া গেল। সুগ্রীব গরুড় আসিবার কথা যখন বলিতেছিল, তখনই বিদ্যুৎমালা শোভিত মেঘের আবির্ভাব হইতেছিল। মেঘ হইলেই ঝটিকাও আসে। তাই মেঘ দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল ঝড় উঠিবে, আর সেই ঝড়ের হাওয়ায় রামলক্ষ্মণ জ্ঞান লাভ করিবেন। হইলও তাই। মেঘের সঙ্গে সঙ্গেই গরুড়ও আসিল। বিভীষণ সেই রাক্ষস জাতির মধ্যে বিচক্ষণ ছিল। সে রামের পরাক্রম, তাঁহার শরক্ষেপের ক্ষমতা এবং সভ্য আর্য্যাবর্ত্তবাসী মনুষ্যদের উন্নত অস্ত্রশিক্ষার সম্বন্ধে শূর্পণখা ও অকম্পনের নিকট বিস্তারিত শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, রাবণ যতই পরাক্রমশালী হউক না কেন, এই সভ্য মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না। যখন রাবণকে তাহার হিতার্থে যুদ্ধ না করিতে উপদেশ দিল, তখন রাবণ তাহাকে তিরস্কার করাতে সে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রামের শরণাগত হইল। এখন রামের এই মূর্চ্ছিত অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখে জল সিঞ্চন করিল। এ কার্য্য বানর দ্বারা হয় না। বানর অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জল পান করিতে পারে না, তাহারা অঙ্গুলি ভিজাইয়া তাহাই চুষিয়া জলপান করে, আর মূর্চ্ছা হইলে যে মুখে চোখে জল দিতে হয় তাহাও তাহারা জানিতনা, তবে বাতাস আসিলে

যে মূর্চ্ছা ভাঙ্গে, তাহা তাহারা জানিত, তাই বলিয়াছিল

"গরুড়াধিষ্ঠিতাবেতা বুভৌ রাঘব লক্ষ্মণৌ।
ত্যক্ত্বা মোহং বধিষ্যেতে সগণং রাবণং রণে॥"

গরুড় আসিলেই উভয়েই সংজ্ঞালাভ করিবেন। সুতরাং গরুড়ের অর্থ কি তাহাই দেখা প্রয়োজন। গরুড় পুং গরুদ্ভ্যাং পক্ষাভ্যাং উয়তে উড্ডয়তে। গরুৎ+ডী+উ=গরুত্মান্, পক্ষীমাত্রম্। গরুৎ—গৃণাতি শব্দায়তে বায়ুবেগ বশাৎ=পক্ষ। অর্থাৎ যে সকল প্রাণী পক্ষ দ্বারা উড়িতে পারে, তাহারাই গরুৎ বিশিষ্ট (গরুত্মান্) গরুড়। তারপর গরুড়ও আসিল আর বাতাসও উঠিল; আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পাইয়া তাঁহাদের মূর্চ্ছা অপনোদনে তাঁহারা সংজ্ঞালাভ করিলেন। মূর্চ্ছা হইলে মুখে জলসিঞ্চনের পর সাধারণতঃ পাখার বাতাস করা হয়। আদিম মনুষ্যজাতির মধ্যে তখনও এই পাখার উদ্ভাবন হয় নাই, অন্যথা বিভীষণ তাহা ব্যবহার করিত। কিন্তু বানরজাতি পাখা দ্বারা বাতাস সঞ্চালন না জানিলেও, পাখীর পক্ষদ্বারা যে বায়ু সঞ্চালন হয়, তাহা তাহাদের স্বভাবজ বুদ্ধিবলে জানিতে পারিয়াছিল। হয় তো এরূপ একটি ঘটনা সুগ্রীবের জীবনে ঘটিয়াছিল—কখনও কোন বৃক্ষ হইতে পতিত মৃতপ্রায় আত্মীয় বানরকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, সে তাহার নিকট তাহার মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় বৃহৎ মাংসাশী শকুনি সেই মৃতপ্রাণীটী দেখিয়া, নিকটস্থ জীবিত প্রাণীর ভয়ে, নীচে নামিতে না পারিয়া, তাহার বৃহৎ পক্ষ সঞ্চালন করতঃ মণ্ডলাকারে সেই শবের উপরে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল; সে তাহার উপরিস্থ সেই বিস্তৃতপক্ষ পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনে উৎপন্ন বায়ু নিজ গাত্রে লাগাতে উপরের দিকে চাহিয়া তাহার গাত্রস্পর্শিত বায়ুর কারণ বুঝিতে পারিল, আর তাহার গায়ে সেই বায়ুর

স্পর্শেই, সে যে শোকে মুগ্ধ হইয়াছিল সেই মোহ হইতেই যেন জাগরিত হইল, আবার তাহার পরেই সেই মৃতকল্প বানরটীও চেতনা লাভ করিল। সুতরাং তাহার বুদ্ধিতে আসিল যে সেই পক্ষীর বিস্তৃত পক্ষ সঞ্চালনে উৎপন্ন বায়ু দ্বারাই, সে নিজে যেমন তাহার মুগ্ধাবস্থা হইতে জাগ্রত হইল, তেমনই এই মৃতকল্প বানরটীও সেই পক্ষ সঞ্চালিত বায়ু দ্বারাই জাগ্রত হইয়া উঠিল। সে ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিল যে পক্ষী পক্ষ কুঞ্চিত করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিলে কোন বাতাস হয় না। তাই বানর সুগ্রীব, তাহার অনুকরণশীল বুদ্ধির সাহায্যে, নিকটস্থ কোন বৃক্ষ হইতে অথবা ভূতলে পতিত কোন মৃতপক্ষী আনিয়া, তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়া রামের দেহের উপর তাহা ঘুরাইতে লাগিল, আর তাহা দ্বারা যে বায়ু উৎপন্ন হইল তাহারই সাহায্যে রামলক্ষ্মণের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তাই বর্ণিত হইয়াছে গরুড়ও আসিল আর আকাশে মেঘ হইয়া ঝটিকা প্রবাহিত হইল। গরুড় বলিয়াছিল সে রামের বহিশ্চর প্রাণ। বহিশ্চর প্রাণ অর্থে বাহিরে প্রবাহিত বায়ু, যাহা নিঃশ্বাসের সহিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষা করে ও তদ্দারা সমস্ত দেহের ক্রিয়া করায়। আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র মতে এই বায়ুই সমস্ত শরীরাভ্যন্তরে সমভাবে প্রবাহিত থাকে আর তাহাই অন্তস্থ প্রাণবায়ু। সদ্যঃপ্রসূত শিশু যখন মাতৃজঠরের প্রবল আকুঞ্চনের বেগে মূর্চ্ছিত, মৃতকল্প অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ধাত্রী বা চিকিৎসক তাহার মুখে ফুঁ দিয়া বায়ু প্রবেশ করায়, আর তাহাতেই অনেক মৃতকল্প শিশু যেন পুনর্জ্জীবিত হয়। তাই এই বহিশ্চর প্রাণই বাহির হইতে প্রবিষ্ট বায়ু। সেই পক্ষ সঞ্চালিত বায়ু রামের মুখ ও নাসিকা দ্বারা, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গেই সংজ্ঞা হইলে, তিনি

দেখিলেন সেই পক্ষীর পক্ষ তাঁহার মুখের নিকট সঞ্চালিত হইতেছে। তখন বুঝিলেন এই পক্ষীই আমার প্রাণদান করিয়াছে। তাই বলিলেন ইহাই আমার বহিশ্চর প্রাণ, অন্যথা পক্ষীর মুখে এ ভাষণ অস্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত আমরা মনুষ্য রামের ইতিহাসে যাহা স্বাভাবিক ঘটনা হইতে পারে এবং রাক্ষসরূপী মনুষ্য রাবণের পুত্র রাক্ষসরূপী ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা রাক্ষসরূপী বিভীষণের মনুষ্যরূপে তাহাদের কার্য্যকলাপ কিরূপ হইতে পারে তাহাই দেখাইলাম।

অতঃপর এই ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের অন্য কি রূপ আছে এবং তাহা সাধক রামের সাধনায় কি ব্যাঘাত ও সাহায্য সজ্ঘটন করিয়াছিল, তাহাই উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ সংক্ষেপে ইন্দ্রজিৎ ও বিভীষণের বিষয় আলোচনা করিব, কেননা তাহা অন্যত্র আরও যথাযথ স্থানে করার প্রয়োজন হইবে। তাহারা কামরূপী রাক্ষস নামে বর্ণিত হইয়াছ। রাবণ, বিশ্রবার পুত্র হওয়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে রব বা শব্দ। সুতরাং বিভীষণও সেই একই শব্দরূপী মাতাপিতা হইতে উদ্ভূত সন্তান হওয়াতে, সেও রব বা শব্দ ইহাই প্রতিপন্ন হওয়া উচিত। বিভীষণ কিরূপ শব্দের প্রতীক্? বি-শূন্য ভীষণতা যাহাতে—যে শব্দের ভীষণতা নাই তাহাই বিভীষণ শব্দ অর্থাৎ মৃদুমধ্যমশব্দ। যেমন দেহ-শূন্য = বিদেহ, কলশূন্য = বিকল ইত্যাদি। রাম সাধনাবলে যখন শব্দরূপ রাবণকে জয় করিতে মনন করিয়াছেন, তখন সেই শব্দেরই প্রতীক্ বিভীষণের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইল কেন? এখন আমরা যোগসাধন প্রণালীর একটু আভাস দিব। সাধক সাধনোদ্দেশে যোগাসনে বসিলে প্রথমে বাহির হইতে আগত নানারূপশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করা বশতঃ, তাহা শ্রবণ করে। শব্দশ্রবণ স্বতঃই হয়। কেননা কর্ণরন্ধ্র খোলা থাকিলেই শব্দ প্রবেশ

করিবে। শব্দশ্রবণ সর্ব্বদাই হয়, কিন্তু যখন মন সেই শব্দে আকর্ষিত হইয়া তাহা গ্রহণ করে, তখনই তাহা মনন করা হয় বা শব্দের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যদি মনকে অন্য বস্তুতে লিপ্ত করা যায়, তখন সেই শব্দ কিসের বা তাহা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা উপলব্ধি হয় না। এইরূপ হইতে হইতে সেই শব্দ শ্রবণ বন্ধ হয়। তখন আর একটী মৃদুশব্দ শ্রুত হয়, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারা যায় তাহা বাহির হইতে আগত শব্দ নহে। এই শব্দ ভীষণ নহে যেন ভীষণ ও মৃদুর মধ্যম অবস্থা—ইহাই বিভীষণ। এই শব্দে সময়ে সময়ে মন এত লীন হয় যে তাহা একরূপ অভ্যাসের মত পরিণত হয়। তখন এই অভ্যাসই যেন মিত্ররূপে আঁকড়ে ধরে। যখন কোন জ্ঞাত কারণ হইতে এই শব্দের উৎপত্তি স্থির করিতে পারা যায় না, তখন ইহা যেন অজ্ঞাত দেশ হইতে শূন্যপথেই আসে বোধ হয়, কেননা কর্ণপথে ইহা আসেনা। তাই সমুদ্রের পারস্থিত রাম, তাহার অপর পারস্থিত অজ্ঞাত স্থান রাবণের বসতি হইতেই এই মধ্যমরূপশব্দ বিভীষণাকারে শূন্যপথে আসিল দেখিয়া, তাহাকে রাবরূপী রাবণেরই জ্ঞাতি চর, অতএব রাবণ অপেক্ষা হীনরব এইরূপ মনে করিয়া সন্দেহচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই শব্দকে যখন কিছুতেই সহজে লয় করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকেই রাবণের অগ্রদূত মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে রাবণরূপ রবকে জানিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া যেন তাহার সহিত মিত্রতাই করিলেন অর্থাৎ তাহাতেই তন্ময় হইলেন। কিন্তু এই মধ্যম শব্দে মন লিপ্ত থাকিলে, ক্রমে তাহা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিলে, সাধকের অজ্ঞাতে তন্দ্রাবেশ বা মোহ আসিয়া পড়ে। সাধক নিজের সাধ্য ও কাম্যপদ ভুলিয়া সেই মোহে অভিভূত হয়। এই মোহের

তুলনা নিদ্রার সহিত হয়। যেমন বাহিরের শব্দ শুনিতে শুনিতে তাহা যখন ক্রমে মৃদু হইয়া একটা ঝিল্লীরবের মৃদুঝঙ্কাররূপে শ্রুত হয়, তখন তাহার বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাবেশ হয়। এই যোগের মহাবিঘ্নরূপ মোহই হইল সাধকের মোহ বন্ধন। যে সাধকের সর্ব্বদাই মোহের আবেশ হয়, সে কখনও যোগে সিদ্ধ হইয়া আত্ম দর্শন করিতে পারেনা। সেই মধ্যমরূপ মৃদু বিভীষণ শব্দ ক্রমে মৃদুতর হইয়া যে ঝিল্লীরব রূপ ক্ষীণ শব্দে পরিণত হয় তাহাই ইন্দ্রজিৎ। সেই এক একটী নিশিতবাণ আর তাহারই সহিত জড়িত একটু একটু মোহের অন্ধকার মেঘরূপে বা নাগরূপে ধারাবাহিক ভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে একত্র হইয়া যেন একটী বৃহৎ অন্ধকার রূপে পরিণত হইয়া, পরিপূর্ণ মোহরূপে মনকে অভিভূত করে, যেমন নিদ্রার পূর্ব্বে একটী শব্দ শুনিতে শুনিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া নিদ্রার আবির্ভাব হয়। মন তখন সমস্ত বৃত্তি হইতে চ্যুত হওয়ায় যেন সেই সমস্ত বৃত্তির স্থানগুলি অন্ধকার হয়। সেই বৃত্তিগুলি যেন প্রজ্জ্বলিত দীপরূপে মনকে আকর্ষণ করিতেছিল, আর সেই দীপগুলি অদৃশ্য হইয়াই যেন সেই স্থান অন্ধকারে পরিণত হইল, আর মন তখন সেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই নাগ বা মোহ-মেঘের অংশসমন্বিত এক একটী ঝিল্লীরব যেন এক একটী তন্তু, আর সেই সমস্ত তন্তু একত্র হইয়াই একটী রজ্জু বা পাশরূপে পরিণত হইয়া সাধক রামকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল। ইহাই সাধক রামের নাগপাশে বন্ধন। এই মোহ, মনেরই হয়। মন, পক্ষীর মতই উড়িয়া সর্ব্বস্থানে যায়। তাহার পক্ষ বন্ধ হইলেই সে নিশ্চল হয়। যেন সেই অন্ধকার গুহাতে পড়িয়াই পক্ষবদ্ধ হওয়াতে সে নিশ্চল হইয়াছিল। তারপর যেমন তাহার গরুৎ বা পক্ষ সঞ্চালন হওয়াতে সে গরুৎমান বা গরুড়

হইল, অমনি সেই অন্ধকার গুহা হইতে উড়িয়া বাহিরে আসিয়া তাহার প্রিয়বৃত্তি-গুলিতে আকর্ষিত হইয়া—যেন জাগরিত হইয়াই এই বিশ্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হইল। মোহাবস্থায় রামের গ্রীবা শিথিল হইয়া বক্র হইয়াছিল, মোহঅন্তে তাহা পুনরায় সোজা হইল। তাই সুগ্রীব বলিয়াছিল গরুড় আসিলেই রাম সংজ্ঞালাভ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার মন ফিরিয়া আসাতেই তাঁহার গ্রীবাও সোজা হইল। রাম তাঁহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিজের রামরূপ ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি একটী দীর্ঘনিশ্বাসের পর স্বস্থ হয়। সেই দীর্ঘনিশ্বাসই বহিস্থ প্রাণ বা বায়ু। এই মোহ আবার মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হয়, তখন মনও ঈষৎ জাগরিত হয়, তখনই সেই মৃদুশব্দ শ্রুত হয়। তাই যেন বিভীষণ রামের চোখ ও মুখে জলসিঞ্চন করিয়াছিল। যেমন আলস্যভরে তন্দ্রাপ্রাপ্তি হইলে লোকে দুই কর মর্দ্দন করিয়া সেই তন্দ্রা দূর করে, তেমনই রামের মোহও একটু একটু অন্তর্হিত হইবার সময়, তিনি করমর্দ্দন করিয়াই তাহাকে (মোহকে) দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাই সুষেণ কর্ত্তৃক ঔষধ আনয়নের নির্দ্দেশ এবং তাহাতেই যে রাম আরোগ্য হইবেন তাহাই বলিবার উদ্দেশ্য। সাধক জাগ্রত হইয়া তাহার মোহ অবস্থার কথা স্মরণ রাখে এবং পুনরায় যাহাতে সেই মোহ না আসে, তাহার চেষ্টা করে। অনেক ভ্রান্তযোগী ইহাকেই সমাধি অবস্থা বলিয়া মনে করে এবং তাঁহাদের শিষ্যরাও প্রচার করে তাহাদের গুরু হরদমই সমাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রকৃত সাধক জানেন ইহা সাধনার কি ভয়ঙ্কর অহিতকর বাধা।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কুম্ভকর্ণ বধ

রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সেই সংবাদ দিলে, রাবণ অত্যন্ত উল্লসিত হইল। তাহার পরেই যখন তাঁহাদিগকে চেতনা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বানরেরা রাক্ষসদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন রাবণ সংবাদ পাইল তাঁহারা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। তখন অন্য অন্য অনেক পরাক্রমশালী রাক্ষসদিগকে ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে পাঠাইলে তাহারা নিহত হইলে, তাহার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের কথা তাহার স্মরণ হইল, কেননা আর কাহাকেও যুদ্ধ করিবার মত উপযুক্ত সে লঙ্কায় দেখিতে পাইলনা। তখন রাক্ষসদিগকে বলিল "নিদ্রাতুর কুম্ভকর্ণকে জাগাও, পিতামহের আদেশ অনুসারে সে ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিন মাত্র জাগরিত হয়, কিন্তু সম্প্রতি নয় দিবস মাত্র ঘুমাইয়াছে। অতএব তাহাকে যত্নপূর্ব্বক জাগানই কর্ত্তব্য। আমি রাম কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আমার কোন শোক থাকিবেনা।" নব সপ্ত দশাষ্টৌচ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ। মন্ত্রংকৃত্বা প্রসুপ্তোঽয় মিতস্তু নবমে ঽনি।" বহু আয়াসে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে রণস্থলে উপস্থিত হইল। তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই অদ্ভুত প্রাণীটী কে? তখন বিভীষণ বলিল "ইনি বিশ্রবাপুত্র প্রতাপশালী

কুম্ভকর্ণ। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন এ অন্যূন ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিন মাত্র জাগিবে এবং এই বীর সেইদিন ক্ষুধিত হইয়া বহু আহার করিবে। "শয়িতা হ্যেষ ষণ্মাসমেকাহং জাগরিষ্যতি"। বহু আয়াসে রাম কুম্ভকর্ণকে বধ করিলেন। এই কুম্ভকর্ণের সরস বর্ণনা রামায়ণে আছে। তাহা বিষ্ণু অবতার রামের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে এই অনুমান হয়, একটী বিশাল দেহ, বিকৃতাকার রাক্ষস জাতীয় মনুষ্য যাহার কর্ণদ্বয় কুম্ভের ন্যায় ছিল, যে বেশীর ভাগ সময় নিদ্রিত থাকিত, তাহাকেই বহুকষ্টে জাগ্রত করিয়া যুদ্ধার্থে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার উল্লেখেরও প্রয়োজন অবশ্য আছে। সে ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিন জাগ্রত হইয়া ভূরিভোজনের পর, আবার ছয়মাস নিদ্রিত থাকে। বৎসরে মাত্র দুইদিন ছয়মাস পূর্ণ হইলে জাগরিত হয়। ইহার নিশ্চয় কোনও গূঢ় অর্থ আছে। আমরা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পঞ্জিকা তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ৩১শে ভাদ্র ১৭ই বা ১৬ই সেপ্টেম্বর সূর্য্যের অস্ত কুম্ভরাশিতে শেষ হয় এবং পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে অন্য রাশিতে উদয় হয়। আবার ৩১শে ফাল্গুন ১৬ই।১৭ই মার্চ্চ সূর্য্যের উদয় কুম্ভরাশিতেই শেষ হয়। এই দুইটী দিন বিষুব সংক্রমণের দিন। এই দুই দিন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঠিক এক সময়ে হয়। অর্থাৎ দিন ও রাত্রি সমান হয়, ইংরাজীতে ইহাকে Equinox বলে। ২১শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে মার্চ্চ সূর্য্য ৬টার সময় উদিত হয় ও ৬টার সময় অস্ত যায়। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে রাম ও রাবণের লঙ্কায় যুদ্ধ এই সময়েই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কেননা রাবণ বলিয়াছিল কুম্ভকর্ণ ছয়মাস

নিদ্রার পর একদিন জাগরিত হইয়া আহারাদি করিয়া, আজ নয় দিন ঘুমাইতেছে। তাই বোধ হয় বাল্মীকি এই কুম্ভরাশির দৃষ্টান্তেই লঙ্কা যুদ্ধের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। রাম বসন্তকালে কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া বানরদিগকে শিক্ষা দিতে ও তাহাদের হাবভাব বোধগম্য করিতে প্রায় চারিমাস অতিবাহিত করেন। তৎপরে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে সীতা অন্বেষণ সম্ভব না হওয়াতে, কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বত গুহায় বর্ষার দুইমাস যাপন করিয়া শরৎকালের আগমনের প্রথমেই আশ্বিন মাসে হনুমান প্রভৃতি বানরদিগকে সীতা অন্বেষণে প্রেরণ করেন। তাহারাও যখন বিন্ধ্যাচলের অপর পার্শ্বস্থিত সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সুগ্রীব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা বানরের ভাষণে বাল্মীকি বলিয়াছেন। তারপর বানরেরা সীতার অনুসন্ধান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতেও, তাহাদের অন্ততঃ একমাস লাগিয়াছে। বানর-সেনা সংগ্রহ করিতেও কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তৎপরে বানরদের সহিত পদব্রজে সমুদ্রতীরে পৌছিতেও অন্ততঃ একমাস সময় অতিবাহিত হইয়াছে। অবশ্য বানরেরা দ্রুতগামী হইলেও তাহারা যে পথ এক মাসে অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহাতে পদব্রজ-গামী রামের পক্ষে এক মাসের বেশী লাগিবারই সম্ভব। সমুদ্রতীরে বন হইতে বাঁশ উৎপাটন করিয়া তাহাতে অনেক ভেলা বাঁধিয়া প্রস্তুত করিতে ও তাহা সমুদ্র-বক্ষে ভাসাইতেও অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুগ্রীবের আদেশে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর কোটি কোটি বানর না আসিলেও, অন্ততঃ সহস্র বানরও সংগ্রহ করিতে সময় লাগিয়াছিল। বংশ ভেলা, লতা দ্বারা রাম লক্ষ্মণকেই স্বহস্তে বন্ধন করিতে হইয়াছিল, কেননা বানর দ্বারা সম্ভব হয় না। সমস্ত ভেলা সমুদ্রতীরে নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা

সমুদ্র-বক্ষে লইয়া পরপর যোজন করিয়া তাহা লঙ্কাতীরে সংলগ্ন করিতে পাঁচদিন সময় লাগিয়াছিল। এইরূপ হিসাব করিলে বোধ হয় যে এই যুদ্ধ পরবর্ত্তী বিষুব সংক্রমণের দিন অর্থাৎ ৩১শে ফাল্গুনের পর বসন্তকালে আরম্ভ হইয়াছিল। বাল্মীকিও কখন বিনা উদ্দেশ্যে কোন সময়ের উল্লেখ করেন নাই। যুদ্ধের সময়টা কুম্ভরাশির সাহায্যেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। চাই সে শরৎকালেই হউক বা বসন্তকালেই হউক। আবার বানরেরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষাদির পুষ্পভার দেখিয়া বলিয়াছিল বসন্তকাল সমাগতপ্রায়। সম্ভবতঃ এই কুম্ভরাশিতে সূর্য্যের অস্তকে ভিত্তি করিয়া, বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিতেরা শরৎকালে দুর্গোৎসবের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের মতে এই দুর্গাপূজা অসময়ে রাম, রাবণ বধে অসমর্থ হইয়া করিয়াছিলেন। তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ কাব্যে নানারূপ সরস বর্ণনায় ও অলঙ্কারে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে কোথাও এই শক্তি-পূজার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সেই তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এই শ্লোক দুইটীতে যে নিবদ্ধ হয় নাই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। "তত পুষ্পাতিভারাগ্রান্ লতাশত-সমাবৃতান্। দ্রুমান্ বাসন্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ॥ তে বসন্ত মনুপ্রাপ্তং প্রতিপদ্যপরস্পরম্। নষ্ট সন্দেশকালার্থা নিপেতুর্ধরণীতলে।" বসন্তকালীন ফলবান বৃক্ষসকল পুষ্পভরে অবনত দেখিয়া, বসন্তকাল উপস্থিত প্রায় দেখিয়া বানরগণ সুগ্রীবের আদিষ্ট নিয়মিত সময় অতীত হইল বুঝিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। "বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যা ব্যবস্থিতাঃ। প্রস্থিতাঃ সোঽপিচাতীতংকিমতঃ কার্য্যমুত্তরম্"॥ এক মাসের মধ্যে ফিরিতে হইবে এইরূপ সময় অবধারণ করিয়া সুগ্রীব যে আশ্বিন মাসে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাও গত হইল।

এখন এই কুম্ভকর্ণ বধে রাম, সাধনার পথে কিরূপ অগ্রসর হইলেন তাহাই দেখান হইয়াছে। যোগাচারী সাধক প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকারন্ধ্র বন্ধ করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রুদ্ধ করতঃ মনকে তত্তদ্বিষয়ক বৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিয়া, তাহাকে একাকী করিবার প্রয়াস পায়। আমার গুরুদেব তিব্বতী বাবা প্রথম শিক্ষার্থীকে এইরূপ সরল প্রণালীতেই অভ্যাস করিতে উপদেশ দিতেন। এইরূপে কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে একটা ঘোর শব্দ শ্রুত হয় ঠিক যেরূপ কল হইতে জল লইয়া কুম্ভ বা কলসী পূর্ণ করিবার সময় হয়। এই শব্দ তখন অন্য সমস্ত শব্দকে যেন গ্রাসই করে। কর্ণ হইতে অঙ্গুলি অপসৃত হইলে এই শব্দ শোনা যায় না বটে, তখন আবার বাহির হইতে শব্দ আসিয়া মনকে লিপ্ত করে। তখন উভয় বিপদের মধ্যে পড়িয়া সাধকের উপায় কি থাকে! তখন মনকে কর্ণ হইতে আকর্ষণ করিয়া ভ্রূমধ্যে যে জ্যোতি চক্ষু বন্ধের পরই ক্ষণিক দৃষ্ট হয় তাহাতেই লিপ্ত করিতে হয়। এই জ্যোতিতে মন দৃঢ় আকৃষ্ট হইলে তখন আর সেই কুম্ভকর্ণরূপ শব্দ শ্রুত হয় না। আবার এই কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়া যে কুম্ভপূরণের ন্যায় শব্দ উত্থিত হয় তাহা শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও একটা মৃদু মধ্যম শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। তখন বোধ হয় যেন ঐ ঘোর শব্দই মধ্যে মধ্যে মৃদু মধ্যমরূপে পরিণত হইতেছে। সমস্ত শব্দই প্রথমে উচ্চরূপে শ্রুত হইলেও তাহা শেষের দিকে মৃদু মধ্যম হইয়া আসে অর্থাৎ যাহাকে শব্দের রেশ বলে, ইহা সেই উচ্চ শব্দের ক্ষণিক বিরামেই হয়। আবার তাহার পর উচ্চ শব্দ হইলেই তাহা আর শ্রুত হয় না। কুম্ভে জল পড়িবার সময় জল যখন একটু আস্তে আস্তে পড়ে তখন শব্দও

মৃত্যুমধ্যম হয়। কুম্ভকর্ণ বিভীষণের ভ্রাতা উভয়েই শব্দের প্রতীক। তাই রাম কুম্ভকর্ণকেও দেখিলেন আবার বিভীষণকেও দেখিলেন। বিভীষণরূপ শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই অবগতি হইয়াছিল, এখন কুম্ভকর্ণরূপ শব্দ শুনিতে শুনিতেই যখন বিভীষণ রূপ মৃত্যুমধ্যম শব্দও শুনিলেন তখন তাহারা উভয়েই শব্দের প্রতীক। তাই রামের নিকট বিভীষণ কুম্ভকর্ণের পরিচয় দিল—যে সেও বিশ্রবার পুত্র ও তাহারই সহোদর। দশানন রাবণ সর্ব্বদাই জাগ্রত, কেননা সর্ব্বসময়েই দশদিকের শব্দ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শ্রুত হয়। কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে যে কুম্ভ পূরণের ন্যায় শব্দ হয়, তাহা কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলেই হয়। তাই সে ঘোর শব্দ যেন নিদ্রিতই থাকে, তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা উত্যক্ত করিয়া যেন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উত্যক্ত করিয়া কুম্ভকর্ণের জাগরণের ন্যায়ই উত্থিত করা হয়।

রাম ইতিপূর্ব্বে যে যোগাচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ণরন্ধ্র অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ না করিয়াই যোগাসনে বসিয়া মনকে নিরুদ্ধ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই অভ্যাসের স্মৃতি অবলম্বনেই তিনি পুনরায় সাধনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত হইল। তিনি সেই মৃদু শব্দ হইতে তাঁহার মনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেন না, আর সেই ইন্দ্রজিৎরূপ মৃদুশব্দ শুনিতে শুনিতেই তাঁহার মোহাবেশ হওয়াতে তিনি বিফল মনোরথ হইলেন। মোহভঙ্গে যখন তিনি বুঝিলেন এরূপ প্রযত্ন তাঁহার বিফল হইল, তখন পুনরায় পৌরুষ সহকারে যেন লক্ষ্মণের প্ররোচনাতেই বলীয়ান হইয়া, যোগের প্রথম প্রণালী হইতে যেন বর্ণপরিচয়ের ন্যায়ই প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ সেই কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধকরণরূপ প্রথম প্রক্রিয়া হইতেই যেন গোড়াপত্তন করিয়াই

আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, কাণ বন্ধ করিলেই শব্দের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন, কেননা কর্ণরন্ধ্র খোলা থাকিলেই শব্দ শ্রবণ হয়। কিন্তু হইল তাহার বিপরীত। কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিতে উত্থিত হইল সেই ঘোর কুম্ভকর্ণরূপ শব্দ। তাই কুম্ভকর্ণ বিশ্বগ্রাসী। রাম পৌরুষ বলে সেই কুম্ভকর্ণরূপ শব্দকে লয় করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার মন এখন অনেকটা শব্দজয়ের দিকে অগ্রসর হইল। ইহাই যোগীর কুম্ভকর্ণ বধ।